সামরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র

শেখ হাসিনা



আমেরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার জাতীয় সংসদ, বিভিন্ন জনসভা-সমাবেশ এবং সাংবাদিক সম্মেলনের ভাষণ ও বক্তব্য

প্রকাশক
মিলন নাথ
অনুপম প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪
দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

প্রচ্ছদ
কাইয়ূম চৌধুরী

ফটোগ্রাফ
পাভেল রহমান

কম্পোজ
কেয়া কম্পিউটার্স
৪৭ বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০

মুদ্রণে
এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৭ শ্যামাপ্রসাদ চৌধুরী লেন
ঢাকা ১১০০

মূল্য
১০০.০০ টাকা

SAMARIKTANTRA BANAM GANATANTRA (A collection of speaches) By Sheikh Hasina Published by Anupam Prokashani 38/4 Banglabazar Dhaka 1100 Phone 244243 Price Foriegn US$ 5.00

ISBN 984-404-042-9

উৎসর্গ

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬৬, ১৯৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭৫-এর ১৫ অগাস্ট হত্যাকাণ্ড এবং ৩ নভেম্বর জেলখানার হত্যাকাণ্ডসহ এ পর্যন্ত দীর্ঘ গণআন্দোলনের শহীদদের স্মৃতির প্রতি।

ভূমিকা

'সামরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র' বইটিতে ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৯৩ সালের ২০ আগস্ট পর্যন্ত শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদ, বিভিন্ন সভা-সমিতি, সাংবাদিক সম্মেলন, আলোচনাচক্র প্রভৃতিতে এবং নানা অনুষ্ঠান উপলক্ষে যেসব বক্তৃতা-ভাষণ দেন তার কয়েকটি সঙ্কলিত হয়েছে। শেখ হাসিনা বাংলাদেশের অন্যতম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের প্রধান এবং দেশের ঐতিহ্যবাহী, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে আদ্যোপান্ত সম্পৃক্ত, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বের গৌরবধন্য রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী। স্বভাবতই তাঁর বক্তৃতা-ভাষণের একটা বিশেষ মূল্য আছে। শুধু তাঁর দলের কর্মীদের কাছে নয়, দেশের সব মানুষের কাছে।

শেখ হাসিনার বক্তৃতা-ভাষণ ও বাণীতে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত ঘটেছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীসমাজের উন্নয়ন, ধর্মীয় সহনশীলতা, গোলাম আজমের বিচার ও রাজাকার আল-বদরসহ সকল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী সন্ত্রাসী শক্তিসমূহের কার্যকরভাবে মোকাবেলা করার অত্যাবশ্যকতা, সংসদীয় গণতন্ত্রের নীতিমালা আন্তরিকভাবে মেনে চলার গুরুত্ব এবং '৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের সময় তিন জোটের রূপরেখায় যে সব সিদ্ধান্তের প্রতিফলন ঘটেছিল, বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার কর্তৃক তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনসহ তাদের অন্যান্য ক্রটিবিচ্যুতির কথা গ্রন্থভুক্ত বক্তৃতা-ভাষণে যুক্তি তথ্য এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে তীক্ষ্ণভাবে উঠে এসেছে। এখানে আবেগ আছে, ঐতিহাসিক দিক থেকেই রাজনৈতিক বক্তৃতা-ভাষণে আবেগের একটা সুস্পষ্ট স্থান আছে, তবে গ্রন্থভুক্ত বক্তৃতা-ভাষণগুলি আবেগসর্বস্ব নয়, এবং অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তি ও মননে ঋদ্ধ রাজনৈতিক প্রজ্ঞার স্বাক্ষরবাহী। যেটুকু আবেগ আছে তার উৎস স্বৈরতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্রের হাতে দেশের শোষিত-বঞ্চিত মানুষের জন্য গভীর ভালোবাসা, যে স্বৈরতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্র কখনো নগ্নভাবে দেশের উপর চেপে বসে, কখনো সুকৌশলে সামনে এসে দাঁড়ায় মেকি গণতন্ত্রের মুখোশ পরে, মিথ্যার জয়ঢাক বাজিয়ে। এই বক্তৃতা-ভাষণগুলির মধ্য দিয়ে পাঠক একটা যুগের ছবি এবং সেই সূত্রে ইতিহাসেরও উপাদান পাবেন।

সবাই শেখ হাসিনার বক্তব্য, নানা বিষয়ে তাঁর মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর দিক-নির্দেশনার সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন, সেটা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু তাঁর মতামত নিঃসন্দেহে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার দাবি রাখে, তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানের জন্যই। শেখ হাসিনার বক্তৃতা-ভাষণের বর্তমান নির্বাচিত সঙ্কলন প্রকাশের উদ্যোগ যাঁরা নিয়েছেন আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই এবং আশা করি এই গ্রন্থ রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিসহ সমাজের বিভিন্ন অঙ্গনের নবীন-প্রবীণ অনেক মানুষের মনোযোগ লাভ করবে।

২৮ জানুয়ারি, ১৯৯৪
ঝরোকা, সড়ক নং-২৮,
গুলশান, ঢাকা।

কবীর চৌধুরী

পূর্বকথা

আমার জীবনের লক্ষ্য হল বাংলার শোষিত বঞ্চিত দরিদ্র মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা করব এবং স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেব। ১৯৮০ সাল থেকে দেশে-বিদেশে অসংখ্য জনসভা করেছি এবং বক্তব্য রেখেছি। ১৯৮৬ সালে সংসদে এবং ১৯৯১ থেকে সংসদে বিরোধী দলের নেতা হিসেবে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বক্তব্য দিয়েছি। বিরোধী দলে থেকেও সরকারকে বাধ্য করেছি সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে।

১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট থেকে দেশে যে হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু, সেই রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা বদলের ধারার সূচনা করেছি। সুতরাং দেশ ও জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আমি বক্তব্য রাখার চেষ্টা করেছি। দীর্ঘ ১৫ বছরের স্বৈর সামরিক শাসন এবং গত তিন বছরের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থা দেশকে আজ এমন এক অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে যে, দেশে বৃহত্তর দরিদ্র মানুষের সংখ্যা আজ বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা ও বাংলার মানুষের স্বাধীন সত্ত্বাকে রক্ষা করা। বিশ্বে বাঙালি যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে।

আমার গত ১৪ বছরের রাজনৈতিক বক্তব্যগুলিতে আমি বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই কথা বলেছি, সমাজ, দেশ ও জাতির অগ্রগতির কথাই বলে এসেছি। ক্ষমতায় না গিয়েও সরকারকে দিয়ে কিছু কাজ করাতে বাধ্য করেছি।

অনেক আন্দোলন হয়েছে, অনেক রক্ত ঝরেছে, অনেক মূল্যবান জীবন হারিয়েছে— আর কেন বিভেদ-বৈষম্য? মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও চেতনার অনুসারী আমরা কেন পারব না এই সমাজ ও দেশকে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল ধারায় নিয়ে যেতে? বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে কেন মানবেতর জীবন-যাপন করতে হবে? দেশ থেকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা, সন্ত্রাস ও অনাচার দূর করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। সমগ্র বিশ্বে নিজ নিজ দেশে আজ সবাই জনশক্তিকে জাতীয় উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত করে সমৃদ্ধময় দেশ এবং স্বস্তি ও আনন্দময় জীবন গড়ে তুলছে। আমরাই-বা কেন পারব না? আমাদেরও মেধা ও শ্রমশীল জনশক্তি রয়েছে। আমাদেরও মানবিক মূল্যবোধ রয়েছে। আমার আহ্বান থাকল, আমরা যারা রাজনীতি করি, যারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত, যারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ চান— আসুন সবাই ঐক্যবদ্ধ হই। এই গ্রন্থের পাঠক-পাঠিকার প্রতিও আমার সেই আন্তরিক আহ্বান রইল।

'সামরিকতন্ত্র বনাম গণতন্ত্র' গ্রন্থে প্রধানত ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৯৩ সালের ভাষণ পর্যন্ত সবগুলি নয়, বাছাইকৃত বক্তৃতা রয়েছে। অনেক উল্লেখযোগ্য বক্তৃতা হয়তো থাকবে না। ভবিষ্যতে এ ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট থাকব। এ গ্রন্থের ভূমিকা লেখার জন্য শ্রদ্ধেয় কবীর চৌধুরীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এ গ্রন্থের প্রকাশককেও আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

৩০ জানুয়ারি, ১৯৯৪ — শেখ হাসিনা



অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোন

আপনারা সবাই জানেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাংলাদেশের তৎকালীন জনপ্রিয় গণতান্ত্রিক সরকারের কাছ থেকে বিদেশি শক্তির সহযোগিতায় এক জঘন্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে কিছুসংখ্যক বহিষ্কৃত সামরিক অফিসার এবং তাদের অনুচরগণ ক্ষমতা দখল করে। ....তারা কেবল আমার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমার পরিবারের সকলকে, এমনকি মহিলাও শিশুদের হত্যা করেই ক্ষান্ত হয় নি তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের অতন্ত্র প্রহরী আমার পিতার চারজন সহকর্মী—সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামানকেও জেলাখানার মধ্যে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের ভিতর দিয়ে একটি সত্য অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায় যে, হত্যাকারীদের লক্ষ্য সবসময়ই বাঙালি জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দানকারীদের প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। হত্যাকাণ্ডের পরপরই শুরু হয় বাংলাদেশবিরোধী শক্তিগুলোর পুনর্বহাল এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদবিরোধী কার্যকলাপের সূচনা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস........সমগ্র ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বাংলাদেশের তৎকালীন নির্বাচিত সরকার থেকে ক্ষমতা দখল করাই ছিল না, বরং বাংলাদেশের চারটি মূলনীতি—জাতীযতাবাদ, গণতন্দ্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে জাতীয় জীবন থেকে বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে সুপরিকল্পিতভাবে বিদেশি প্রভুদের দ্বারা স্থিরকৃত আদর্শসমূহ, যা বাংলাদেশের জনগণের নিকট কখনও গ্রহণযোগ্য নয়, তা প্রতিষ্ঠিত করাও এই ষড়যন্ত্রের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আজও এই ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যের এতটুকুও পরিবর্তন হয়নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রশাসনযন্ত্রের বিভিন্ন শাখায় বাংলাদেশবিরোধী ব্যক্তিদের ক্রমাগত পুনর্বহাল এই ষড়যন্ত্রের অংশবিশেষ।

সময় আর বেশি দূরে নয়, যখন এই সকল জাতীয়তাবাদবিরোধী শক্তিসমূহকে তাদের কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। কোনো ক্ষমতাসীন সরকার নয় বরং জনগণই এদের বিচার করবে। খুনী ও তাদের দোসরদের উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া কেবল সময়ের ব্যাপার মাত্র। আমার পিতা সারাজীবন বাংলার সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। এই জনগণই ছিল তাঁর শক্তির উৎস। সুতরাং তাঁর মৃত্যুর পর বাংলাদেশের ইতিহাসে তাঁর স্থান এই জনগণই স্থির করবে........

আজকের সংগ্রাম কেবলমাত্র আওয়ামী লীগ এবং জাতীয়তাবাদবিরোধী

শক্তিগুলোর মধ্যে নয়—এই সংগ্রাম বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী শক্তিসমূহের সহিত বাঙালি জাতীয়তাবাদবিরোধী অশুভ শক্তিসমূহের। আমি সকল শক্তির মোকাবিলা করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন— শোষণহীন সোনার বাংলা' কায়েমের মাধ্যমেই আমরা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহকর্মীদের স্মৃতির প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে পারব। মুক্তির সঠিক পথ বঙ্গবন্ধু নির্দেশ করে গেছেন। আসুন, আমরা সততা, একনিষ্ঠতা ও আদর্শের প্রতি বিশ্বাস রেখে বয়ে নিয়ে আসি বাংলার মানষের জন্য অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি।.....

(সাপ্তাহিক "বাংলার ডাক" লণ্ডন, ৪র্থ বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা, ১৯শে মে, ১৫শ সংখ্যা, ২৬শে মে এবং ১৬শ সংখ্যা, ৯ই জুন, ১৯৭৯)

১৯৭৯ সালের ৮ মে সুইডেনস্থ বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মেলনে প্রেরীত বাণী শেখ রেহানা পাঠ করেন।

দেশকে বাঁচান, মানুষকে বাঁচান

প্রবাসী ভাই ও বোনেরা,

বাংলার মাটি থেকে হাজর হাজার মাইল দুরে আজ ব্যথিত হৃদয় নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি। আপনারা যাঁরা কষ্ট স্বীকার করে সমবেত হয়েছেন তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যাবাদ জানাচ্ছি। যে সমস্ত কর্মী ভাই ও বোনেরা প্রবাসে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়েও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের জানাই সংগ্রামী অভিনন্দন। ধন্যবাদ জানাই স্যার টমাস উইলিয়ামস্সহ ব্রিটিশ এম পি'দের যাঁরা তাঁদের মূল্যবান সময় থেকে কিছুটা আমাদের জন্য ব্যয় করেছেন এবং কষ্ট স্বীকার করে এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

আমি সালাম জানাই সে-সব শহীদদের প্রতি, যাঁরা ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির মর্যাদা রক্ষার জন্য জীবন দিয়ে গেছেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাস্ট বাংলার মাটিতে যে কলঙ্কিত অমানুষিক হত্যাকাণ্ড ঘটে আপনারা তা' সব জানেন। আমরা দুটো বোন সে সময় বিদেশের মাটিতে ছিলাম, তাই ঘাতকের আঘাত থেকে বেঁচে যাই। এ বাঁচা আমাদের জন্য কোনো সুখের বাঁচা নয়। আমরা অনেক বেশি শান্তি পেতাম যদি সকলের সঙ্গে একই সাথে মরতে পারতাম।

ঘাতকের নির্মম বুলেটের আঘাতে আমরা হারিয়েছি আমাদের স্নেহময় মাতা-পিতাকে, অতি আদরের ছোট ভাই কামাল, জামাল ও রাসেলকে। খুনীরা নব-পরিণীতা বউ দু'টোকেও রেহাই দেয়নি। তাদের হাত তখনও ছিলো মেহেদি রাঙানো, বুকে ছিল ভভিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন। রেহাই দেয়নি আমার বাবার একমাত্র ছোট ভাই শেখ নাসেরকে। সবার শেষে সব থেকে অত্যাচার করে হত্যা করেছে রাসেল সোনাকে- - কিন্তু কেন? ও প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিল। দশ বৎসরের ছোট্ট শিশুকেও কি নিষ্ঠুর হত্যাকারীরা ভয় পেয়েছিল? আমি আপনাদের কাছে তথা বিশ্ববাসীর কাছে জানতে চাই— কেন. কেন আমার রাসেল সোনাকে এ ভাবে তারা হত্যা করল? জীবন দেবার ক্ষমতা যাদের নেই, জীবন নেবার ক্ষমতা তারা কোথায় পেল?

সেই একই সময়ে এরা হত্যা করে যুবনেতা শেখ মনি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে। তাঁদের শিশুপুত্রদ্বয় আজো খুঁজে বেড়ায় হারানো মা-বাবাকে। বিশ্ববাসীকে আমি জিজ্ঞাসা করি, তারা কি পারে দুটো শিশুর কান্না থামাতে? পারে কি তাদের মা-বাবাকে ফিরিয়ে দিতে?

খুনীদের রক্তের নেশা কি মিটেছিল এতগুলি জীবন নিয়ে? না, মেটেনি—তারা ঐ দিনের একই সময় গুলি চালায় কৃষক নেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায়। ঘাতকরা তাঁর চার বছরের নাতি সুকান্ত, দশ বছরের ছেলে আরিফ, তের বছরের মেয়ে

বেবী, ভাইয়ের ছেলে পঁয়ত্রিশ বছরের যুবক শহীদ সেরনিয়াবাত, বাড়ির অন্যান্য মেহমান ও কাজের লোকসহ আরো কতগুলি জীবন নিল। গুলির আগাতে পঙ্গু হয়ে আছে তাঁর যুবতী কন্যা—যার চোখে প্রশ্ন, আমি কি অন্যায় করেছি? কি আমার ভবিষ্যৎ?

কারবালার ঘটনারই যেন পুনরাবৃত্তি ঘটেছে বাংলার মাটিতে। তবু সেখানে শিশু ও নারী হত্যা করা হয় নাই। এজিদের মতো নিষ্ঠুর লোকও নারী ও শিশুদের আশ্রয় দিয়েছিল। আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে, এরা শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয় নাই—একদিকে পশুর মতো হত্যাকাণ্ড চালিয়ে অন্যাদিকে মৃতের গা থেকে খুলে নিয়েছে ঘড়ি ও গহনা ইত্যাদি, সঙ্গে সঙ্গে চালিয়েছে লুঠতরাজ। এরাই আবার বড় বড় বুলি কপচায়।

আপনারা জানেন, একজন মুসলমানের লাশের প্রতি অন্য একজন মুসলমানের কি কর্তব্য। ইসলাম ধর্মেই আছে যদি কোনো মুসলমানের বেওয়ারিশ লাশও পাওয়া যায় তাকে কাফন-দাফন করা কর্তব্য। ১৫ই অগাস্টের হত্যাকারীরা যাদেরকে হত্যা করেছে তাদের কাফন-দাফনটুকু পর্যন্ত করাতে দেয় নাই। ইসলাম ধর্মের প্রতি তারা কত বড় অবমাননা করেছে, ধর্মকে অপমান করেছে। এরাই আবার বড় গলায় নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দেয়, ইসলামের রক্ষাকর্তা সাজে। আপনারই বিচার করুন, এর থেকে বড় ধোঁকাবাজি আর কি হতে পারে। খুনীরা যখন আমাদের বাসায় গুলি চালাতে থাকে তখন কর্নেল জামিল আমার বাবার ফোন পেয়ে ছুটে চলে আসেন সাহায্যের জন্যে; তাঁকে রাস্তার উপরই হত্যা করা হয়। সাধারণ মিলিটারি নিয়মটুকুও রক্ষা হয় না।

জেলখানার নারকীয় ঘটনার কথা আপনারা শুনেছেন। চারজন জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী ও কামরুজ্জামানকে ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বার ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। সভ্য জগতে এই জঘন্য ঘটনার নজির খুঁজে পাওয়া ভার। তাঁরা ছিলেন আমার বাবার ঘনিষ্ঠ সহযোগী, স্বাধীনতা সংগ্রামের অতন্দ্র প্রহরী। তাঁরা ১৫ই অগাস্টের ঘটনাকে মেনে নিতে পারেন নাই, খুনী মুশতাকের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেন। মিনিস্টার হবার পরিবর্তে জেলে যাওয়াই শ্রেয় মনে করেন, খুনীদের সঙ্গে সহযোগিতা না করে মৃত্যুকেই বরণ করে নেন। বেঁচে থাকতেও তাঁরা আমার বাবার সঙ্গে ছিলিন, মৃত্যুর মধ্যে দিয়েও একাত্মতা প্রমাণ করে গেছেন।

ভাই ও বোনেরা আমার,

আমার বাবা ভালবেসেছিলেন দেশকে তথা দেশের মানুষকে, দেশের গরিব সাধারণ মানুষকে; তাদের ভালবাসাও ছিল তাঁর প্রতি অপরিসীম। বাংলার গরিব-দুঃখী মানুষের দুঃখ-দর্দশাই তাঁকে ঘর ছেড়ে সংগ্রামের পথে টেনে আনে। তিনি চেয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে বাঙালি জাতি স্বতন্ত্রতা পাক। দুইশত বৎসরের গোলামির জিঞ্জির থেকে মুক্ত হয়েও আমরা ছিলাম পারাধীন, পাঞ্জাবি মাসকের হাতে দীর্ঘ ২২ বছর নিষ্পেষিত হতে হয়েছে। তারা বারবার আঘাত হেনেছে আমাদের জাতীয় সত্তার উপর, আমাদের

ভাষার উপর, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির উপর। কোনো আত্মসচেতন ব্যক্তি নিজ সত্তার মৃত্যু হচ্ছে দেখে চুপ তাকতে পারে না। আমার বাবাও পারেন নাই। একদিকে বাংলার সাধারণ মানুষের দুঃখ-দর্দশা, অন্য দিকে সমগ্র জাতির অবমাননা তাঁর ভেতরে ধীরে ধীরে স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনা জুগিয়েছে। বাংলার মনুষের কাছে তিনি ছিলেন আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তিনি চেয়েছিলেন বাংলার গরিব দুঃখী মানুষের মুখে তুলে দিতে দু'মুঠো অন্ন, তাদের আদুল গা বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দিতে। তিনি চেয়েছিলেন অশিক্ষার অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়ে শিক্ষার আলোকে পৌঁছে দিতে। শোষকের হাত থেকে শোষিতের মুক্তি— তাই তো বাংলার মানুষ তাঁকে ভালবেসে ডেকেছে "বঙ্গবন্ধু"।

বঙ্গবন্ধু চেয়িছিলেন পৃথিবীর মানচিত্রে থাকবে বাংলা নামে একটি দেশ, বাঙালি একটি জাতি। তঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি, ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতা। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি এই স্বাধীনতা। বাংলার মানুষ তাঁর ডাকে জীবন দিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ জন্ম নিয়েছে। বাঙালিরা তাঁকে ডেকেছে জাতির পিতা। আপনারা জানেন, স্বাধীনতা সংগ্রাম চলার সময় থেকেই সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় দালাল এবং প্রতিক্রিয়াশীল চক্র স্বাধীনতাবিরোধী কাজে সক্রিয় ছিল।

১৫ই অগাস্টর হত্যাকান্ড কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই স্বাধীনতাবিরোধী চক্রই আজ পিতৃহত্যার কলঙ্ক সমগ্র বাঙালি জাতির কপালে লেপন করেছে। জাতির জন্য এটা অত্যন্ত অসম্মান হবে, যদি এই হত্যার প্রতিশোধ না নিতে পারে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এবং আপনারাও আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, সেই জাতি এবং জাতির পিতার উপর বর্তায়। বাংলাদেশ স্বাধীন দেশ—পরাধীনতার কলঙ্ক বাঙালি জাতির ললাট থেকে মুছে গেছে—তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও মুল্যবোধের ভিত্তিতে সুখী সুন্দর জীবন রচনার সম্ভাবনা রয়েছে। জাতির পিতা এই ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের নির্যাস হিসাবে ঘোষণা করলেন চারটি রাষ্ট্রীয় মুলনীতিঃ (১) জাতীয়তাবাদ (২) গণতন্ত্র (৩) সমাজতন্ত্র (৪) ধর্মনিরপেক্ষতা—এই চার স্তম্ভকে কেন্দ্র করে তিনি দেশ গড়ার কাজে মনোনিবেশ করলেন।

আমি আগেই বলেছি, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিগুলো পূর্ব থেকেই সক্রিয় ছিল। জাতীয়তাবাদবিরোধী অগণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শক্তিগুলো তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বিনষ্ট করার জন্য দেশে ও বিদেশে বসে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থনৈথিতক অবস্থার অবনতি ঘটাতে ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন করার চেষ্ট করতে থাকে। যে আন্তর্জাতিক শক্তি ১৯৭১ সালে বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধকে অনুমোদন করে নাই, তারা এতে মদদ যোগায়।

আন্তর্জাতিকভাবে অর্থনৈতিক অবরোধ ও অপপ্রচার শত্রুপক্ষকে আরো সাহায্য করে। এমন এক পরিস্থিতিতে জাতীয় পর্যায়ে স্বাধীনতা, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে একতাবদ্ধ করা ছাড়া বাংলার মানুষকে আশু বিপর্যয় থেকে রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। এ সত্য উপলব্ধি করেই বঙ্গবন্ধু একটি জাতীয় দল গঠন

করেন। তিনি সমগ্র প্রগতিশীল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন সেই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে। এটা ছিল একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন। জাতির জনক হিসেবে বাংলার আট কোটি মানুষের যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয় তা পালন করতে অবশ্যই তাঁর সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর অনেকেই অনেকভাবে তাঁকে স্বৈরাচারী ও একনায়কতন্ত্রী বলে অভিহিত করতে চাচ্ছেন। তাদের মনে রাখা উচিত বিরোধী দলের নেতা হিসাবে তৎকালীন পুর্ব পাকিস্তানে "বঙ্গবন্ধু"ই বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের শক্তির প্রাণকেন্দ্র হিসাবে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

১৯৭১-এর মার্চ মাসে তাঁরই আহ্বানে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সামরিক সরকার সম্পূর্ণভাবে বিকল হয়ে পড়ে। পাঠশালা হতে আরম্ভ করে হাইকোর্ট পর্যন্ত সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি সর্মচারী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে প্রমাণ করেন যে, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন বঙ্গবন্ধু। বিরোধী দলের নেতা হিসাবে পরোক্ষভাবে সরকার পরিচালনার এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। দীর্ঘ একমাস বিশ্ববাসীর কাছে মুজিব ও বাঙালি এক অভিন্ন বিপ্লবী শক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়েছিল।

এর আগে ১৯৫৮ থেকে ১৯৭১ সালের ভিতর পাকিস্তানের শাসকচক্র শেখ মুজিবের সঙ্গে আপোস করে ক্ষমতায় থাকার চেষ্টা চালিয়ে যায়। ইচ্ছা করলে অনেক নেতার মতো বেশ কয়েক বারেই তিনি ষড়যন্ত্র ও আপোসের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে পারতেন। বারবার তাঁকে কারাবরণ করতে হতো না। বাংলার মানুষের স্বাধিকার সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার প্রশ্নে তিনি ছিলেন সকল লোভ ও লালাসার উর্ধ্বে। অফুরন্ত ভালবাসা, সুদৃঢ় চিত্ত ও একাগ্রতা তাঁকে কোনদিনই বাংলার সাধারণ মানুষের স্বার্থবিরোধী কোন ব্যাপারেই আপোষমুখী করে নাই। ১৯৪৯ হতে শেখ মুজিব পর্যায়ক্রমে আন্দোলন ও জনগণের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেই বঙ্গবন্ধু ও জাতির জনক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

অতএব স্বাধীনতা অর্জনের পর একদলীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করাবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণই থাকতে পারে না, বরং বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বাঙালি জাতির সম্পর্ক ছিল এক ঐতিহাসিক দায়িত্বসূত্রে গাঁথা। বিপ্লবের পর বিপ্লবী নেতা সকল দেশেই এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেন। যারা ইচ্ছাকৃভাবে বাংলার বিপ্লবী ইতিহাসকে বিকৃত করতে চায় তারাই শুধু বঙ্গবন্ধুকে স্বেচ্ছাচারী একনায়কতন্ত্রী বলে অভিযোগ করে। যিনি স্বাধীনতা অর্জন করেছেন, স্বাধীনতা সুসংহত ও শক্তিশালী করার দায়িত্বও তাঁরই উপর ন্যস্ত ছিল। এ কারণেই তিনি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রথমে গণঐক্যজোট ও পরে কৃষকশ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন করেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিবিপ্লবী শক্তি আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার সহযোগিতায় তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

বিশ্বের অন্যতম স্বাধীনচেতা নেতা বঙ্গবন্ধু। তিনি আর আমাদের মাঝে নেই, তাঁর নির্দেশিত পথই হচ্ছে বাংলার গরিব-দুঃখী মানুষের একমাত্র মুক্তির পথ।

ভাই ও বোনেরা আমার,

বিদেশি শক্তির সহযোগিতায় বিভিন্ন পর্যায়ে আজ যারা ক্ষমতা দখল করে আছে, তারা যতই গণতন্ত্রের লেবাস পরতে চেষ্টা করুন না কেন, সাধারণ মানুষকে আর ধোঁকা দিতে পারবে না। যে আদর্শের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছিল, যে-কোনো প্রকারেই ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সে আদর্শকে তারা একের পর এক জলাঞ্জলি দিচ্ছে। একদিকে স্বাধীনতাবিরোধী ব্যক্তিদের দেশে ফিরিয়ে এনে পুনর্বহাল করছে, অপর দিকে স্বাধীনতাসংগ্রামী ও মুক্তিযোদ্ধাদের নানাপ্রকার হয়রানি ও হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করছে না। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দেশের কাজে না লাগিয়ে বিদেশের হাতে তুলে দিচ্ছে, দেশের সার্বভৌমত্বকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। গত পাঁচ বছর ধরে স্বৈরাচারী ক্ষমতা দখলকারীরা বাংলার গরিব কৃষক, মজুর ও মেহনতি মানুষকে ক্রমাগত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। সরকারি সাহায্যের আওতায় থেকে ধনীক শ্রেণী আরো ধনী হচ্ছে। আমি আপনাদের কাছে আকুল আবেদন জানাই, এই স্বৈরাচারী ক্ষমতা দকলকারীকে হটিয়ে দেশকে বাঁচান, দেশের দীন-দুঃখী মানুষকে বাঁচান।

একমাত্র বঙ্গবন্ধু-নির্দেশিত পথই মুক্তির পথ— যে-পথে যেতে হলে প্রথমেই হত্যাকারীদের বিচার করতেই হবে। আপনারা শুনে অবাক হবেন যে, বর্তমান ক্ষমতা দখলকারীরা, এইসব হত্যাকারীরা, যারা নিজেরাই নিজেদের হত্যাকারী বলে স্বীকার করেছে, তাদের বিভিন্ন দুতাবাসে চাকুরি দিয়েছে, বিভিন্নভাবে তাদের সাহায্য দিচ্ছে ও তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে যাচ্ছে। এ থেকে একটি কথাই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, দেশের বর্তমান ক্ষমতা দখলকারীরা প্রত্যক্ষভাবে এই হত্যাকাণ্ডের সহিত জড়িত। তাই তারা আজো খুনীদের বিচার করছে না।

আমি বাংলার আপামর জনসাধারণের কাছে, বিশ্বামানবতার কাছে বিচার চাই— কেন আমরা বাবা-মা'র স্নেহ বঞ্চিত, কেন আজ আমি ভাইহারা, দেশকারা? আমি আপনাদের কাছে বিচার চাই, বিচার চাই বিশ্ববাসীর কাছে—এক খুনের বিচার হয়, তবে এ হত্যাকাণ্ডের বিচার কেন হচ্ছে না? হত্যাকারীরা আজ প্রকাশ্য দিবালোক দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই হত্যাকারীরা কেবলমাত্র যে হুমকিস্বরূপ তা নয় সমগ্র বিশ্বের গণতন্ত্রকামী ও দেশপ্রেমিকদের প্রতিও হুমকিস্বরূপ। আমি স্যার টমাস উইলিয়ামস, যিনি ততাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত মমলায় বাদীপক্ষের প্রধান কৌসুলি ছিলেন, তাঁকে অনুরোধ করাবো ১৫ অগাস্ট ও ৩রা নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তদন্ত করতে। আমি চাই খুনীদের বিচার জনগণের আদালতে কারা হোক।

এই বিচারের ব্যবস্থা করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন এই ষড়যন্ত্রের প্রকৃত তথ্য ও খুনীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা। এ ব্যাপারে আমি আপনাদের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা কামনা করে আজকের মতো শেষ করছি। খোদা হাফেজ, জয় বাংলা

১৯৮০ সালের ১৬ অগাস্ট যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের উদ্যোগে লন্ডনের ইয়র্ক হলে ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্টের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণ

আসুন, আবার আমরা এক হই

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর শেখ হাসিনা গণসংবর্ধনা সমাবেশে কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে জনগণের কাছে তাঁহার পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার বিচার দাবি করিয়া বলেন, আপনাদের কাছে আমি বিচার চাই। দেশের বর্তমান দুর্বিসহ অবস্থার জন্য যাহারা দায়ী জনগণের নিকট তাহাদেরও বিচার দাবি করিয়া তিনি বলেন, খুনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসিয়াছে যে সরকার সে সরকার জনগণের কোনো কল্যাণ করিতে পারে না। তিনি জনগণকে লইয়া সোনার বাংলার স্বপ্ন রূপায়ণের লক্ষ্যে সংগ্রাম সূচনার অঙ্গীকার দিয়া বলেন, সেইদিন ৭৫-এর হত্যার বিচার হইবে, যেদিন বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়িত হইবে, যেদিন শোষণমুক্ত সমাজ ও শোষণহীন গণতন্ত্র কায়েম হইবে। তিনি সমস্ত ভেদাভেদ ভুলিয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানাইয়া বলেন, আসুন আবার আমরা এক হই, জয় আমাদের অনিবার্য।

শেরেবাংলা নগরে সুপ্রশস্ত মানিক মিয়া এভিনিউতে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় বৈদ্যুতিক আলোহীন অন্ধকার পরিবেশ, ঝড়-বৃষ্টির দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যেও দূরদূরান্তর হইতে আগত অজস্র শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। দলীয় নেত্রীর আবেগমথিত কান্নার সময় তাঁহার বক্তৃতার আহ্বানের জবাবে অর্ধ ঘণ্টাকালের এই সমাবেশে শ্রোতারা মুহুর্মুহু শ্লোগান দিতেছিলেন। বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়াইয়া শেখ হাসিনা বারবার অঝোর কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়েন। তিনি বলেন, ৭৫-এর হত্যাকাণ্ডের জন্য সরকারের কাছে নয়, আপনাদের কাছে আমি বিচার চাই। দল ও জনগণের ডাকে স্বামী-পুত্রকে রাখিয়া দেশে আসিবার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, এই ঢাকা শহরে আমার কেহই নাই। বাংলার দুঃখী মানুষের জন্য পিতার জীবনদানের কথা স্মরণ করিয়া তিনি বলেন, এই সংগ্রামে আমিও জীবনদান করিতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, আমি নেতা নই, সাধারণ মেয়ে, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ প্রতিষ্ঠার একজন কর্মী। আপনাদের কাছে থাকিয়া বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য আপনাদের লইয়া আমি নিরলস সংগ্রাম চালাইয়া যাইব।

৫২-র ভাষা আন্দোলন হইতে শুরু করিয়া অদ্যাবধি বিভিন্ন সংগ্রামের শহীদানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া শেখ হাসিনা বলেন, বঙ্গবন্ধু বাঁচিয়া থাকিলে গত ৬ বৎসরে শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষ্যে অমরা অনেক দূর আগাইয়া যাইতাম। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার সময় দ্রব্যমূল্য কি ছিল, আজ দ্রব্যমূল কোথায় পৌছিয়াছে তাহা বিচার করিবার ভার তিনি জনগণের উপর ছাড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, কৃষক আজ কৃষিপণ্যের দাম পায় না, শ্রমিক তাহাদের ন্যায্য মজুরি পায় না, জনগণের জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির ফলে পথে-ঘাটে মানুষ খুন হইতেছে।

---

১৭ মে, ১৯৮১ সালে শেরেবাংলা নগরে সংবর্ধনা সভায়

(দৈনিক ইত্তেফাকের সৌজন্যে)

সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে

আজ জাতির এমন এক ক্রান্তিলগ্নে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি যখন দেশে অর্থনৈতিক, সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে। এর মূলে কি সেটা আপনাদের উপলব্ধি করতে হবে।

বিপর্যয়ের শুরু

স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন এ দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কর্মসূচী দিলেন সেই মুহূর্তে তাঁকে হত্যা করে জনগণের নির্বাচিত সরকারকে ষড়যন্তের মাধ্যমে উৎখাত করে দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়। আর সেই থেকেই ষড়যন্ত্র ও হত্যার মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়া এই দেশে চালু হয়। আজকে দেশে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের ফলে যে অস্থিতিশীলতা দেখা দিয়েছে এর জন্য পর্যায়ক্রমে আসা সামরিক শাসনই দায়ী। সামরিক শাসন জারির পর থেকেই এই দেশে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে।

বঙ্গবন্ধুকে যখন হত্যা করা হয়েছিল তখন বলা হয়েছিল জিনিসপ্রত্রের দাম কমানোর জন্য তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও যুদ্ধ-বিধ্বাস্ত এই দেশকে গড়ে তুলে একটি স্থিতিশীলতার মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন। চালের দাম কমিয়ে সাড়ে তিন টাকায় নামিয়ে এনে দিয়েছিলেন। আজ তাই প্রশ্ন এখন কেন চাল টাকা ৮ থেকে ১০ টাকায় কিনতে হচ্ছে? তেল, নুন, মরিচ, পেঁয়াজসহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কি আগের চেয়ে কমেছে, না বেড়েছে? '৭৫ সালে এগুলোর দাম কি ছিল, আজকের দাম কি হয়েছে তা দেখুন।

আজকে দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এমন এক পর্যায়ে এসে ঠেকেছে যে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর আমলে যেখানে এই সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৭ ভাগ, আজকে সেটা ৬৫ ভাগে দাঁড়িয়েছে। বঙ্গবন্ধু সমস্ত কলকারখানা রাষ্ট্রীয়করণ করে এদেশের মানুষকে সে-কলকারখানার মালিক বানিয়েছিলেন। আজকে সেসব ব্যাক্তিমালিকানায় ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে। শ্রমিকদের চাকুরির নিরাপত্তা নেই, নির্বিবাদে শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে। ব্যাংক, বীমা আজকে ব্যাক্তিমালিকানায় ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে। সব থেকে ন্যাক্কারজনক ঘটনা হল যে রাষ্ট্রীয়করণকৃত ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে প্রাইভেট ব্যাংক করা হচ্ছে। এমনকি একথাও শোনা যাচ্ছে যে, কোনো কোনো ব্যাংককে ব্যাক্তিমালিকানায় ফেরত দেয় হয়েছে, অথচ সেই ব্যাংকের ঋণের টাকায় শেয়ার কেনা হচ্ছে। যাঁরা শেয়ার কিনছেন, তাঁদেরকেও একটু হুঁশিয়ার করে দিতে চাই আমরা।

যে-সব ব্যাংক কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়েছে তাদেরকে এখনো চাকুরিতে

পুনর্বহাল করা হয়নি। অথচ শোনা যাচ্ছে ব্যক্তিমালিকানায় যে সমস্ত ব্যাংক ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে সেখানে আরো অনেক কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হবে। আজকে ৯৫০ জন পুলিশ অফিসার, আনসার বাহিনীসহ অনেক কর্মচারীকে কেন ছাঁটাই করা হল, সেটা তারা এখনও জানে না। এদের বেশির ভাগই মুক্তিযোদ্ধা।

আজকে সর্বস্তরে একই অবস্থা বিরাজ করেছে। আইনজীবীরা তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে, শিক্ষকরা তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে রাস্তায় নেমেছে। বঙ্গবন্ধু আমলে কুদরুত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি দেয়া হয়েছিল। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বায়ত্তশাসন দেয়া হয়েছিল, আজ সেই স্বায়ত্তশাসন খর্ব করা হয়েছে। সর্বস্তরের মানুষ দাবিদাওয়া নিয়ে পথে নেমেছে। আমাদের ১৫ দলের ঘোষণায় আমরা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তাদের দাবিদাওয়াকে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

আজকে কৃষকের কৃষি উপকরণের দাম বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বন্যার ফলে যেখানে কৃষকের ফসল বারবার নষ্ট হচ্ছে সেখানে ঋণের বোঝায় কৃষক পরিবারের দুরাবস্থার সীমা নেই। তারা দেউলিয়া হয়ে ভূমিহীন হচ্ছে। আমরা দাবি করেছি বন্যাদুর্গত এলাকায় কৃষি ঋণ মওকুফ করতে এবং সাধারণভাবে সুদ মওকুফ করে সহজ কিস্তিতে কৃষি ঋণ দিতে। সংগ্রামী ভাইয়েরা, বন্যায় সারা দেশ ভাসে আর বন্যার টাকা নিয়ে, ত্রাণ তহবিলের টাকা দিয়ে জনদল গঠন করা হয়েছে।

হত্যা ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা বদল

সর্বস্তরের মানুষের দুর্ভোগের একটাই কারণ। সেটা হল হত্যা ও ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা বদলের পালা। ষড়যন্ত্র ও হত্যার মাধ্যমে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে যেভাবে ক্ষমতা বদল হচ্ছে তারই জন্য আজকে মানুষের এই দুর্ভোগ। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক অবনতির জন্য সামরিক শাসনই দায়ী। যখনই অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা হয়েছে, তখনই সেনাবাহিনীর মুষ্টিমেয় উচ্চাভিলাষীরা সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে দল গঠন করেছে। সামরিক সরকার থেকেই দল গঠন করে রাজনীতিতে অবতরণ করেন এঁরা, নির্বাচনের নামে প্রাহসন খেলেন। আর এই প্রহসনমূলক নির্বচন দিয়ে জনগণের রায় প্রতিফলিত হয় না। প্রতিফলিত হয় সামরিক সরকার ও ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছা, তাদের নীল-নক্সা অনুযীয় ফলাফল ঘোষিত হয়। কিন্তু নির্বাচন হলেও ক্ষমতাবদল নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যালটের মাধ্যমে হচ না। ক্ষমতা বদল হয় বুলেটের মাধ্যমে। আপানারা বারবার তা দেখেছেন। আর এর জন্যই জাতিকে এই দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

জেনারেল এরশাদ সাহেব জনদল গঠন করেছেন। তিনি জনসভা করে বেড়াচ্ছেন। গত ১১ই অক্টোবর তিনি এখানে সভা করে গেছেন; অথচ আপনাদের মনে আছে '৮২ সালে এরশাদ সাহেব যখন ক্ষমতায় এসেছিলেন তখন তিনি অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সমস্ত প্রতিশ্রুতি তিনি ভঙ্গ করেছেন। তিনি বলেছেন, নির্দলীয় নিরপেক্ষ

সরকার গণতন্ত্র দেয়ার জন্য এসেছেন। গত এগারো তারিখের জনসভায় আপনি বললেন, আপনি সরকারি কর্মচারী। আপনি সি. এম. এল. এ. হিসেবে জনসভায় ভাষণ দিতে পারেন না। রাষ্ট্রপতি হিসেবে পারেন? আপনাকে কি জনগণ ভোট দিয়ে রাষ্ট্রপতি করেছে? একজন সৈনিক হিসেবে আপনি প্রধান সামরিক প্রশাসক। আর প্রধান সামরিক প্রশাসকের ক্ষমতা অপব্যাবহার করে আপনি স্বঘোষিত রাষ্ট্রপতি। এখন অঘোষিত জনদলীয় প্রধান। আপনার কাছে প্রশ্ন, আপনি যে সভায় বক্তব্য দিলেন, আপনি কি সেনাবাহিনীর অনুমতি নিয়ে ঐ সভায় এসেছিলেন? আপনি কি জওয়ানদের অনুমতি নিয়েছিলেন? অফিসারদের অনুমতি নিয়েছিলেন? কার অনুমতি নিয়ে আপনি ঐ সভায় ভাষণ দিলেন? কোনো সামরিক কর্মকচারীর তো রাজনীতি করার অীধকার নেই? কিন্তু আপনাকে এই অধিকার কে দিল? এই প্রশ্ন আজকে বাংলার মানুষের।

সংগ্রাম সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে নয়

সংগ্রামী ভাইয়েরা, সামরিক বাহিনী আমাদের জাতীয় সম্পদ। এই সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আজকে তার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে। সামরিক রাজনীতিতে দূর্নীতি ঢুকিয়ে আজকে সামরিক বাহিনীর নৈতিক মনোবল ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। আপনারো জানেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতার সময়েই বঙ্গবন্ধু এই সেনাবাহিনী গঠন করেন। তিনি সেনাবাহিনীর গঠনসংক্রান্ত শাসনতান্ত্রিক বিধান শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ করেন এবং তাদের মর্যাদা জাতীয়ভাবে তুলে ধরেন। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধু এই দেশে সামরিক একাডেমি গড়ে তোলন। তবু আমরা জানি এই সামরিক বাহিনীতে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বহু কথা বলা হয়, মিথ্যা অপপ্রচার চালানো হয়। অথচ সামরিক বাহিনীতে যে হতাহত, যে বিশৃঙ্খলা তার জন্য কোনো রাজনৈতিক দল দায়ী নয়। তার জন্য সামরিক বাহিনীর উচ্চাভিলাষী অফিসাররাই দায়ী।

তাই আমরা বলতে চাই যে, সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম নয়। আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে ঐ উচ্চ ভিলাষী কিছু সামরিক ও বেসামরিক ব্যাক্তির বিরুদ্ধে যারা আমাদের জাতীয় সেনাবাহিনীকে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্ষমতা দখলের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহার করছে।

এরশাদ সাহেব এগারো তারিকে বলেছিলেন যে, তিনি ক্ষমতায় সামরিক বাহিনীর অংশীদারিত্ব চান। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, '৮২ সালে যখন ক্ষমতা নেন তখন তিনি এই কথা বলেছিলেন। এখানে আমার কিছু প্রশ্ন আছে। আমি মনে করি এই প্রশ্ন আপনাদেরও। আজকে এরশাদ সাহেব বলছেন সামরিক বাহিনীর অংশীদারিত্ব চাই। কিন্তু আগেই বলেছি, শাসনতন্ত্রে সেনাবাহিনীর কি অবস্থান সেটা নির্ধারণ করা আছে। এর পরেও এই প্রশ্ন কেন আসে?

আজকে প্রশ্ন করি সামরিক বাহিনী যে অংশীদারিত্ব চায় সেটার ভিত্তি কি হবে? সামরিক বাহিনী থেকে যদি সংসদে তাদের প্রতিনিধি পাঠাতে হয় তবে সেই প্রতিনিধি কিভাবে পাঠানো হবে? সেটা কি মনোনীত হবে, না নির্বাচিত হবে? নির্বাচিতই হোক

আর মনোনীতই হোক, এই নির্বাচন কিসের ভিত্তিতে হবে? আমাদের দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র রয়েছে। বহুদলীয় গণতন্ত্রে সামরিক বাহিনীতে যদি নির্বাচন হয় তাহলে আমি বলব ঐ সামরিক বাহিনীতে আমার দলের আদর্শ, আমরা দলের উদ্দেশ্য—শুধু আমার দল নয়, প্রতিটি রাজনৈতিক দলের আদর্শ, উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার সুযোগ দিতে হবে। তাহলে সামরিক বাহিনীর অবস্থা কি হবে আপনারাই বুঝতে পারছেন। বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সামরিক বাহিনী কি পজিশনে দাঁড়াতে পারে আপনারা জানেন। আর যদি মনোনীত হয় তাহলে সবার আগে পশ্ন, এ মনোনয়ন কোথা থেকে আসবে? কারণ সামরিক বাহিনী সুশৃঙ্খল সংগঠন। তাদের 'র‍্যাংক অ্যান্ড ফাইলে' নিয়ম, শৃঙ্খলা আছে।

এই প্রতিনিধি কাদের প্রতিনিধি? আমি যদি আমার জওয়ান ভাইদের জিজ্ঞেস করি এই প্রতিনিধি যদি শুধুমাত্র জেনারেলদের মধ্য থেকে আসে আপনারা কি তাতে সুখী থাকবেন? আমি যদি অফিসারদের জিজ্ঞেস করি যে, এই প্রতিনিধি কেবলমাত্র জেনারেলদের মধ্য থেকে আসলে অপনারা কি সুখী হবেন? আমি যদি জিজ্ঞাসা করি এই প্রতিনিধি শুধুমাত্র জোয়ান ও নন কমিশন্ড অফিসারদের মধ্য থেকে আসলে কি জেনারেল সাহেব বা অফিসাররা খুশি হবেন? তা হলে এই প্রতিনিধিত্ব কার মধ্যে দিয়ে আসবে? এটা কি নন কমিশন্ড অফিসারদের মধ্য থেকে, নাকি মেজরদের মধ্য থেকে, না কর্নেলদের মধ্য থেকে, না মেজর জেনারেল, না জেনারেলদের মধ্য থেকে আসবে? এই প্রতিনিধিত্ব কার মধ্য দিয়ে আসবে আর কারা তাদের প্রতিনিধিত্ব করবে?

তার পরেও প্রশ্ন থাকে। সংসদে যখন বসবেন আপনাদের পোশাক পরে আসতে হবে, তা না হলে আপনারা যে সামরিক বাহিনীর লোক তা আমরা চিনতে পারব না। সংসদে যদি আপনারা আসেন, তাহলে যেহেতু "ডিসিপ্লিন ফোর্স"— উচ্চপদস্থ কর্মচারী, দেখলেই আপনাদেরকে স্যালুট মারতে হয়। এই স্যালুট কে পাবে? সংসদের নিয়ম স্যালুট কেবলমাত্র স্পীকারই নিতে পারে। তাহলে আপনারা স্যালুট কাকে দেবেন? আপনারা কি আপনাদের অফিসারদের স্যালুট দেবেন, না স্পীকারকে দেবেন?

তার পরেও প্রশ্ন থাকে। আমাদের বাজেটের ৮০ ভাগ সামরিক বাহিনীর জন্য ব্যবহার করা হয়। যখন সংসদে বসবেন তখন প্রশ্ন তোলা হবে এই ৮০ ভাগ বাজেট যেটা আপনাদের জন্য ব্যবহার করা হয় সেটা কোন কোন খাতে আপনারা ব্যয় করছেন? কিভাবে ব্যায় করছেন? কি কি আপনারা কোথা থেকে কিনলেন? প্রশ্ন যদি পার্লমেন্টে আসে তার উত্তর আমাদেরকে দিতে হবে। আর তাই যদি দেন তাহলে এটা কি আপনাদের জন্য, একটি স্বাধীন দেশের জন্য স্বাধীন সার্বভৌম জাতির জন্য, ক্ষতিকর হবে না? এখানে কি "ন্যাশনাল সিক্রেসি" বের হয়ে যাবে না? এ ব্যাপারে কি আপনারা চিন্তাভাবনা করে দেখেছেন? আজকে আপনদের মাধ্যমে এরশাদ সাহেবের কাছে এই প্রশ্নগুলো করে গেলাম।

সামরিক বাহীনীকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য, ব্যবহারের জন্যই এসব বলা হচ্ছে। যে-

দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের সরকার-ব্যবস্থা থাকে সে-দেশে কোনো দিনই সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতায় অংশীদারিত্ব দেয়া যায় না। কেবলমাত্র যদি একটি দল থাকে তাহলে সামরিক বাহিনীকে অংশীদারিত্ব দেয়া যেতে পারে। বঙ্গবন্ধু ৪র্থ সংশোধনী এনে এই দেশের মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য দলমত নির্বিশেষে কৃষক, শ্রমিকসহ সর্বস্তরের পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ গঠন করা হয়েছিল। তখন সেনাবাহিনীতেও কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সদস্য করা হয়েছিল। একটিমাত্র প্ল্যাটফর্ম যদি হয় তাহলে সেনাবাহিনীকে অংশীদারিত্ব দেয়া যায়। এরশাদ সাহেবকে তাই প্রশ্ন রাখি আপনি কি করতে চান?

গণতন্ত্রে উত্তরণের বাধা

আজকে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথে বাধা আপনি। আপনি জনদলের মন্ত্রীদের নিয়েছেন। অথচ বলেছেন, আপনার সরকার সামরিক সরকার, নিরপেক্ষ সরকার। যদি নিরপেক্ষ সরকারই হবে তাহলে আমাদের পাঁচ দফা দাবি কেন মেনে নিতে পারছেন না? পাঁচ দফা শুধু আমাদের একার দাবি নয়। এই রক্তস্নাত পাঁচ দফা দাবি আজকে সর্বস্তরের। আমরা দীর্ঘদিন ধরে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে চলছি। আমরা পহেলা মার্চ হরতাল ডেকেছি, হরতাল সফল হয়েছে। সেলিম, দেলোয়ার ট্রাকের চাকায় জীবন দিয়ে সেই হরতাল সফল করেছে। আপনি উপজেলা নির্বাচন দিয়েছেন, বাংলার মানুষ তা প্রতিহত করেছে। বাংলার মানুষের প্রত্যাখ্যাত ঐ উপজেলা নির্বাচন পুনর্বার করার মতো ঘোষণা দেয়ার সাহস কোথায় পেলেন এরশাদ সাহেব, জানতে চাই। বাংলার মাটিতে সেই প্রত্যাখ্যাত নির্বাচন করার সাধ্য আপনার নেই।

২৭শে অগাস্ট হরতাল ডাকলাম। পাঁচ দফা দাবিতে বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেই হরতাল সফল করল। তার পরও আপনার টনক নড়ল না। আপনি হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে গেলেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর পূর্ণ দিবস হরতাল ডাকলাম। সেদিন সারা বাংলাদেশ বন্ধ ছিল। বাংলার মানুষ আপনাকে জানিয়ে দিল তারা সামরিক শাসন চায় না, তারা গণতন্ত্র চায়। কিন্তু তার পরও আপনি ভাড়া করে লোক এনে সমাবেশ করে ধমকের সুরে বললেন, সামরিক শাসনে নির্বাচন হবেই। আমরা নির্বাচন চাই অবাধ ও নিরপেক্ষ। সে নির্বাচন হবে নির্দলীয় সরকারের মাধ্যমে। নিরপেক্ষ সরকার কোনো দল বা প্রার্থীকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো সহযোগিতা করতে পারবে না। আগে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করতে হবে, তারপর নির্বাচন দিতে হবে।

আপনি বলেছেন, নির্বাচন করুন, সামরিক শাসন প্রত্যাহার করব। আমিও বলে দিচ্ছি এরশাদ সাহেব, আপনারা সামরিক শাসন প্রত্যাহার করুন, আমরাও নির্বাচন করব। আর সেই নির্বাচন হতে হবে নির্দলীয় সরকারের মাধ্যমে। সরকারের বসে দল গঠন করে নির্বাচন করলে সে নির্বাচন আমরা হতে দেব না। বাংলার মাটিতে সে নির্বাচন হবে না।

সংগ্রামী ভাইয়েরা, আজকে আপনারা এখানে এসেছেন, সমবেত হয়েছেন।

আপনাদের আগেই বলেছি, এই যে পার্লামেন্ট, সেখানে যাওয়ার অধিকার আমাদের নেই, সে অধিকার তারা কেড়ে নিয়েছে, তাই আপনাদেরকে ডেকেছি, এটাই আমাদের বৃহত্তম পার্লামেন্ট। আজ এই যে বাংলার মানুষ গ্রামগঞ্জ থেকে, বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে এখানে এসেছেন, আপনারা বলুন, আপনারা কি সামরিক শাসন চান? এরশাদ সাহেব, ক্যান্টনমেন্ট বেশি দূরে নয়, শুনে রাখুন, জনগণ সামরিক শাসন চায় না। এখনো সময়, আছে ৫ দফা দাবি মেনে নিয়ে নিরপেক্ষ ও নির্দলীয় সরকারের অধীনে সার্বভৌম সংসদের নির্বাচন দিয়ে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করে ব্যারাকে ফিরে যান। আমরা এতদিন প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু আর প্রতিবাদ নয়। আমরা এবার প্রতিরোধ করব।

সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলুন

আজ থেকে আপনাদের কাছে, বাংলার মানুষের কাছে আমার আবেদন, এই পাঁচ দফার জন্য আমার ভাই সেলিম, দেলোয়ার রক্ত দিয়েছে, তাজুল, তিতাস রক্ত দিয়েছে। জননেতা ময়েজউদ্দিন রক্ত দিয়েছেন। সেই দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আপনারা গ্রামে গ্রামে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তুলবেন। ২৭ তারিখ থেকে ১০ই নভেম্বর প্রতিরোধ পক্ষকে সফল করতে হবে। দাবি না মানলে ৮ই ডিসেম্বর ২৪ ঘণ্টা হরতাল পালন করবেন। ৯ই ডিসেম্বর থেকে আমরা ১৫ দল অসহযোগ আন্দোলন শুরু করব। বাংলার মানুষের কাছে, আপনাদের কাছে আমার আবেদন থাকল, অসহযোগ আন্দোলনে আপনারা সব ধরনের রাজস্ব খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেবেন। সামরিক সরকারের সমস্ত অনুষ্ঠান বর্জন করা হবে। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত তোঘলকি আদেশ প্রত্যাখ্যান করতে হবে, দেশের সর্বত্র গ্রামে গঞ্জে অফিস, আদালতে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষাঙ্গনে, হাটবাজারে এই উৎপীড়ক সরকারের বিরুদ্ধে আপনারা জনমত গড়ে তুলবেন।

সরকারি কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী, পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনীর কাছে আমার আবেদন থাকবে, আপনারা জাতির সম্পদ, জাতির ট্যাক্সের পয়সায় আপনাদের বেতন দেয়া হয়, স্বৈরাচারী সরকারের গোলামি আপনারা করবেন না। জাতির সেবা করাই আপনাদের কর্তব্য, জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবেন না। স্বৈরাচারের হুকুমে আপনারা গুলি চালাবেন না।

সারা দেশের প্রতিটি মসজিদ, মন্দির এবং গির্জায় প্রতিদিন এই খুনী সামরিক জান্তার স্বৈরাচারী দুঃশাসন থেকে জাতির মুক্তির জন্য বিশেষ মুনাজাত ও প্রার্থনা করার জন্য আমি আপনাদের আবেদন জানাচ্ছি। এই পঁয়ষট্টি হাজার গ্রামে, মহকুমা, জেলা, হাটবাজারে, গঞ্জে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, শহর, বন্দর রাজধানী কোথাও এই স্বৈরাচারী খুনী জান্তার কোনো পোস্টার, শ্লোগান, দেয়াল লিখন করতে দেবেন না। সরকারি উদ্যোগে আমাদের পোস্টার তুলে ফেলা হয়, দেয়াল লিখন মুছে ফেলা হয়।

সংগ্রামী ভাইয়েরা, এরশাদ সাহেব বলেছেন, তিনি নির্বাচনের জন্য ডিসিএমএলএ,

এসজেডএমএলএ, জেডএমএলএ তুলে দেবেন। আমি বলতে চাই, নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য এগুলোই শুধু আমাদের প্রতিবন্ধকতা নয়। এরশাদ সাহেব, আপনার উচ্চাভিলাষ আর আপনার প্রেসিডেন্ট হবার এই খায়েশ সব থেকে বড় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। আমাদের সেনাবাহিনী জাতীয় সম্পদ, তাদেরকে ব্যবহার করে আর জনগণের কাছে হেয় করবেন না। একটি স্বাধীন দেশে সেনাবাহিনী ও জনগণ পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। অথচ আজকে সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে জনগণের মুখোমুখি আপনারা দাঁড় করিয়েছেন। সেনাবাহিনীর ভাইদের কাছে অনুরোধ, আপনারা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করুন, এই দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আপনাদের ভেতর যারা গণ্ডগোল সৃষ্টি করছে, তারা যাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে তার জন্য সহযোগিতা করুন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করার জন্য আমদেরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করুন।

সংগ্রামী ভাইয়েরা, বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, যে জাতি রক্ত দিতে পারে সে জাতিকে কেউ কোনো দিন দাবিয়ে রাখতে পারে না। এরশাদ সাহেব, আজ বাংলার মানুষ দাবি আদায়ের জন্য রক্ত দিয়েছে। আপনার সাধ্য নেই আপনি এ জাতিকে দাবিয়ে রাখতে পারেন। যত রক্ত লাগুক আমরা দেবই দেব। কিন্তু পঁচাত্তরের পনেরই অগাস্ট জাতির জনককে হত্যা করে যে ক্ষমতা ঐ কান্টনমেন্টে কুক্ষিগত করা হয়েছে, সেই ক্ষমতা আমরা লড়াই করে জনগণের হাতে ফিরিয়ে দেব।

সংগ্রামী ভায়েরা আমার,

আজকে সেই লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপনাদেরকে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে, সেই সংগ্রামের ডাক দিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু।

১৪.১০.৮৩ সালে ১৫ দলের মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে মহা সমাবেশে সভানেত্রীর ভাষণ

আমরা সর্বপ্রকার শোষণের বিরোধী

মাননীয় সভাপতি,

আফ্রো-এশিয়ার সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ।

আজ আপনাদের মাঝে এসে নিজেকে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। আফ্রো-এশিয়ার নির্যাতিত শোষিত জনগণের সংগ্রামী নেতৃবৃন্দ এই সমাবেশে উপস্থিত আছেন দেখে আমি বিশেষ খুশি হয়েছি। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ, যে দেশের প্রতিষ্ঠাতা আমার বাবা শেখ মুজিবুর রহমান আফ্রো-এশিয়ার মুক্তিকামী জনগণের সংগ্রামী আদর্শ রক্ষায় আত্ম উৎসর্গ করেছেন, সেই দেশের একজন প্রতিনিধি হিসেবে আপনাদের সাথে মিলিত হতে পারা আমার জাতির জন্য এক স্মরণীয় মুহূর্ত।

বিশ্বব্যাপী সকল মানব জাতি যখন শান্তির পক্ষে ও পরমাণু অস্ত্রের বিপক্ষে সোচ্চার, আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার জাতিগুলো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে রক্তাক্ত সংগ্রামে লিপ্ত, মুক্তিকামী মানব সম্প্রদায়ের ওপর যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদ যখন হানা দিচ্ছে, সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে মুক্তিযুদ্ধের দেশ আলজেরিয়ায় আয়োজিত এই আফ্রো-এশিয়া সংহতি সম্মেলন নিশ্চয়ই অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে নয় যে, সাম্রাজ্যবাদের অগ্রযাত্রা রুখে দিয়েছেন এশিয়া-আফ্রিকার মহান জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ। অথবা শুধু এই কারণেও নয় যে, আফ্রো-এশিয়ার মুক্তিকামী চেতনা ও আদর্শ বিশ্বশান্তির অনুকূল গণ্য করে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন দিতে এগিয়ে আসছেন বিশ্বের সকল জাতির শান্তিকামী মানুষ। গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে, আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ও জাতিগুলোর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি ও বিকাশের মধ্যেই বিশ্বশান্তির গ্যারান্টি নিহিত। আর সেই বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে, আফ্রো-এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার জাতিগুলোর মুক্তি ও বিকাশের লক্ষ্যে অবদান রাখার জন্যই এই সংহতি সম্মেলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য।

আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার জাতিগুলো একদিকে যখন সাম্রাজ্যবাদের থাবা থেকে তাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ব্যস্ত, অন্যদিকে তখন সাম্রাজ্যবাদের পদানত ও শৃঙ্খলিত করে রাখা জাতিগুলো জাতীয় দল ও জাতীয় নেতাদের নেতৃত্বে মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত। আজ থেকে এক যুগ আগে আমার বাবা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে—যে স্বাধীনতা যুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্মদাতা ও বাঙালি জাতির জনক শেখ মুজিবের আহ্বানে আফ্রো-এশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতারা, ল্যাটিন আমেরিকার জাতীয়তাবাদী নেতারা ও বিশ্বের

সমাজতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দ ও এই মহান আলজেরিয়ার মহান নেতৃবৃন্দ সাড়া দিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন হিমালয়ের মতো।

আফ্রো-এশিয়া ও জোট নিরপেক্ষ সংস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক ব্লক বিশ্বব্যাপী যখন বাঙালি জাতির উত্থান ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পক্ষে বিশ্বব্যাপী সমর্থন ও জনমত গড়ে তুলেছিল এবং জাতিসংঘসহ অন্যান্য বিশ্বসংস্থায় বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অনুকূলে অবদান রাখছিল, তখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত ও সেন্টো সিয়েটোর সদস্য পাকিস্তানের পক্ষে আমেরিকা সেদিন বাংলাদেশের নৌ-উপকূলে বঙ্গ উপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠিয়ে ও বাংলাদেশে গণহত্যায় লিপ্ত সৈনিকদের হাতে বিপুল সমরাস্ত্রের ভাণ্ডার পৌছে দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঠেকাতে ও বাঙালি জাতির উত্থানকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু যে- নাম ছিল বাঙালির ঘরে ঘরে প্রাতঃস্মরণীয়, বাঙালি জাতি যাঁকে বঙ্গবন্ধু (ফ্রেন্ড অব বেঙ্গল) বলে ডাকত, সেই শেখ মুজিবের জাতীয়তাবাদী আদর্শে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ শক্তির সাম্রজ্যবাদ স্তব্ধ করে দিতে পারেনি, যেমন পারেনি এই আলজেরিয়াসহ আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার বীর জনগণের মুক্তিযুদ্ধকে। ২২ বছর আগে পর্যন্ত ১০ বছর ধরে এক মিলিয়ন আলজেরিয় মুক্তিযোদ্ধার রক্ত ঝরেছে এই আলজেরিয়াকে মুক্তিকামী বিশ্বের তীর্থভূমিতে রূপান্তরিত করার জন্য। এখন থেকে এক যুগ আগে এই আলজেরিয়া থেকে ৫৫০০ শত কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশের শ্যামল সবুজ প্রান্তরে আমার ৩০ লাখ বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা ভাইবোনের রক্ত ঝড়েছে বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদের নিগড়মুক্ত করতে। মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ত আলজেরিয়ার মরুভূমিতে ঝরুক অথবা শ্যামল বাংলাদেশে বা হোক সে এই সম্মেলন শহর থেকে অনেক দূরে দক্ষিণ আফ্রিকার দুর্গম কোনো জঙ্গলে আমাদের রক্তের পরিচয় এক। আমাদের সংগ্রাম ও আত্মদান এক। সংগ্রামী জনগণের ও মুক্তিযুদ্ধের শত্রুও এক। জনগণের বিজয় ও মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য প্রতিরোধ করতে না পারলে সাম্রাজ্যবাদ সে দেশে শত ভিন্ন রূপে ছড়িয়ে দেয় সন্ত্রাস, অন্তর্ঘাত, গুপ্তহত্যা এবং পরিশেষে এমনকি নগ্ন সামরিক হামলা।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়লাভের পর আফ্রো-এশিয়ার ও জোট নিরপেক্ষ সংস্থার নেতাদের সাথে মিলিত হতে ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বীর সেনানী শেখ মুজিবুর রহমান এগারো বছর আগে এই আলজেরিয়ায় এসেছিলেন। আফ্রো-এশিয়ার যে মহতী সম্মেলনে আজ এখন আমি বক্তৃতা করছি, এই মহতী সম্মেলনে বক্তৃতা করার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু আফ্রো-এশিয়ার নির্যাতিত জনগণের বিপ্লবী কণ্ঠস্বর প্যাট্রিস লুমুম্বাকে যেভাবে চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছে, সেভাবেই ১৯৭৫ সালে আফ্রো-এশিয়ার মুক্তিকামী জনগণের আর এক বীর সেনানী শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বরকেও চিরতরে স্বব্ধ করে দেয়া হয়েছে। ৩০ লক্ষ বাঙালি ভাইবোনের জীবনের বিনিময়ে বাংলাদেশ সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত হয়। অথচ মাত্র তিন বছর পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভাড়াটে সৈন্য দিয়ে গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে পুনরায় পদানত ও গ্রাস করে। তার পর থেকে বাংলাদেশে সাম্রাজ্যবাদের মদদে চলছে

সামরিক শাসন। সেই সাথে জনগণের ওপর সীমাহীন নির্যাতন ও নিষ্পেষণ। এই অবস্থার মধ্যেও জনগণ আমাদের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে সামরিক বাহিনীর গুলিতে ঢাকায় নিহত ছাত্রদের সব মিছিলে পুনরায় সামরিক শাসকেরা গুলিবর্ষণ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্রকে হত্যা করেছে। ছাত্র-জনতার উপর এই ধরনের গুলিবর্ষণ ও হত্যাকাণ্ড চলছেই। তবুও বাংলাদেশ জুড়ে চলছে সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র জনতা কৃষক শ্রমিক সকলের সম্মিলিত প্রতিরোধ মিছিল ও হরতাল। সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক সামরিক শাসকেরা বাংলাদেশে দিন দিন কঠোরতর জনপ্রতিরোধের সম্মুখীন হচ্ছে। কেননা তারা জনগণের সব মিল কারখানা ব্যাংক বীমা বিজাতীয়করণ ও বঙ্গবন্ধুর সকল প্রগতিশীল সংস্কার পাল্টে দিয়ে জন-অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। ঢালাওভাবে বাজেটের টাকার সিংহভাগ সামরিক খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। দেশের গরিব আরো গরিব হয়ে যাচ্ছে এবং ধনী আরো ধনী হয়ে উঠছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়ে পরিণত করা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুঁজিপতিদের শোষণের ফলে বাংলাদেশে সাধারণ মানুষ দুর্বল। আহার সংস্থান করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছে। এক ভয়াবহ ট্র্যাজেডির মধ্যে বাংলাদেশ নিপতিত আজ।

অথচ মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশে এই ট্র্যাজেডি হওয়ার কথা ছিল না। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের বিজয়লাভের পরে শেখ মুজিব সরকারের প্রগতিশীল ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালুর বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে আমেরিকা তার পরাজয়ের প্রতিশোধ তুলে নিতে প্রস্তুত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিব লক্ষ করেছিলেন যে, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর পোড়ামাটি নীতির ফলে বাংলাদেশের ৬৮০০০ গ্রামের ৬০% বসতবাড়ি সম্পূর্ণ ও আরো ২৫% আংশিক বিধ্বস্ত হয়েছে। কৃষক-শ্রমিকেরা ব্যাপকহারে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের কারণে দখলদার বাহিনী বাংলাদেশের কৃষক ও শ্রমিকদের ভিটেবাড়ি ও বসতবাড়ি সব আগুনে পুড়িয়ে দেয়। শস্যক্ষেত্রে ও ফলের বাগানেও আগুন দেয়। তাই তিনি সর্বপ্রথম কৃষকদের জন্য ২৫ বিঘা জমির খাজনা মওকুফ ও জোতদার বর্গাদারদের কবল থেকে জমি উদ্ধার করার জন্য সর্বোচ্চ ১০০ বিঘা জমির সিলিং ঘোষণা করে উদ্ধারকৃত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করেন। শ্রমিকদের জন্যে ন্যায়সঙ্গত মজুরি ঘোষণা করেন। কলকারখানা, ব্যাংক, বীমা মালটিন্যাশনাল কোম্পানি (ক্ষতিপূরণ ছাড়াই) ইত্যাদি সব জাতীয়করণ করেন। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করেন এবং সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অংশ হিসেবে ঘোষণা করেন। এসবের ফলে ভূমিতে ও কলেকারখানায় উৎপাদন বেড়ে যায়। সর্বপ্রকার শোষণ, বিলাসী জীবন-যাপন, মদ, জুয়া, রেস এসব বন্ধ করে দেন। উগ্র পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেন এবং ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে দিয়ে গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা ও প্রশাসন চালু করেন। এসব সংস্কার দেশি ও আন্তর্জাতিক পুজিপতিরা পছন্দ করেনি। স্বাধীন জোট নিরপেক্ষ

পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেন এবং আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহে সাম্রাজ্যবাদীদের কর্মকাণ্ডের প্রতিকূলে আফ্রো-এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকা ও নির্যাতিত জনগণের পক্ষে বাংলাদেশকে স্থাপন করেছিলেন শেখ মুজিব। বাংলাদেশ ছিল সাড়ে সাত কোটি মানুষের গরিব একটি দেশ। কিন্তু বাঙালি জাতির জনকের দূরদর্শী ও বৈপ্লবিক নেতৃত্বগুণে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দ্রুত দুর্লভ সম্পদ ও গৌরবের মর্যাদায় আসীন হয়।

ত্রিশ লাখ মুক্তিযোদ্ধার আত্মদানের বাংলাদেশকে আপনাদের এই আলজেরিয়ার মতো বিশ্বের মুক্তিযোদ্ধাদের তীর্থ কেন্দ্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন আমার পিতা। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন শক্তিশালী করার জন্য ভূমিকা নিয়েছিলেন এবং কিউবাসহ জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যসহ লেনদেন বৃদ্ধি করেছিলেন। অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও পরমাণু অস্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ধিক্কার, তিরস্কার ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সক্রিয় অবদান রাখছিলেন। ফিলিস্তিনিদের মাতৃভূমি পুনরুদ্ধার, আল কুদস পুনরুদ্ধার, ইসরাইলিদের গ্রাস থেকে লেবানন উদ্ধার করার পক্ষে এবং আরব বিশ্বকে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত করে রাখার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন। ফিলিস্তিনিদের সাথে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য বাংলাদেশের তরুণ যোদ্ধাদের পাঠিয়েছিলেন। সর্বোপরি আফ্রো-এশিয়ার মহান নেতাদের আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন এবং এশিয়া আফ্রিকার মাটি থেকে সাম্রাজ্যবাদকে চিরতরে উৎখাত করার সংগ্রামে নৈতিক, বৈষয়িক সমর্থনসহ টোকেন অংশগ্রহণ হিসেবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বেচে যাওয়া ফান্ডের অর্থ বর্ণবাদী প্রিটোরিয়া সরকারের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পাঠিয়েছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদের দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্দি ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিকামী জনগণের প্রতি নৈতিক সমর্থন ঘোষণা করেছিলেন এবং ল্যাটিন আমেকিরার মহান চিন্তানায়ক চিলির রাষ্ট্রনায়ক সালভাদর আলেন্দে হত্যার জন্যও সাম্রাজ্যবাদী আমেকিরার বিরুদ্ধে বিশ্বের যেসব জাতীয়তাবাদী নেতা ও রাষ্ট্রনায়ক কঠোর ভাষায় নিন্দাবাদ উচ্চারণ করেছিলেন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রনায়ক শেখ মুজিব ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ল্যাটিন আমেকিরার জনগণের প্রাণপুরুষ আলেন্দেহত্যার মাত্র এক বছরের মধ্যে আফ্রো-এশিয়ার মুক্তিসংগ্রামী জনগণের অগ্রসেনানী শেখ মুজিবকে ১৯৭৫ সালে সপরিবারে হত্যা করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার জবাব দেয়। সাম্রাজ্যবাদীদের ভাড়াটে সৈন্যদের হাতে বাঙালি জাতি তাদের জনককে হারিয়েছেন। কিন্তু আমি শুধু পিতৃহারা হইনি, আমি মাতৃহারা হয়েছি, ভ্রাতৃহারা স্বজনহারা হয়েছি।

এশিয়ার মুক্তিসংগ্রামের অগ্রসেনানী শেখ মুজিবকে সম্পূর্ণভাবে নির্বংশ করাই ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের হত্যার নীলনকশা। সেই নীলনকশা অনুযায়ী জেলখানায় বন্দি অবস্থায় হত্যা করা হয় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালাকারী প্রথম সারির অন্যান্য জাতীয়তাবাদী ৪ জন নেতাকে। শুধু আমরাই দুই বোন বিদেশে ছিলাম বলে সাম্রাজ্যাবাদীদের ছোবল থেকে

রক্ষা পাই। ১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাস্ট আমার পরিবার-পরিজনদের উপর কারবালার মতো নৃশংস হত্যাকাণ্ড চালানো হয়। ৭০৩ খ্রিস্টাব্দে ইরাকের ফুরাত নদীর তীরে কারবালা প্রান্তরে শিশু মাসুম বাচ্চাসহ হযরত হোসেন ইমামকে সপরিবারে হত্যার বিচার তদানীন্তন সময়ে হয়নি বিধায় শত শত বছর পরেও বিশ্বের মুসলমানরা প্রতি বছর কারবালা দিবস পালন করে শোকের মাতম প্রকাশ করে ও ক্ষোভে গর্জে ওঠে।

ঠিক অনুরূপভাবে বাংলাদেশের মানুষ আজ ক্ষোভে গর্জে উঠছে জাতির জনক শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের হত্যার বিরুদ্ধে। আফ্রো-এশিয়ার সংগ্রামী নেতা ও চিন্তানায়ক আপনারা যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন এবং যারা উপস্থিত নেই সবার কাছে বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর কন্যা হিসেবে আমার অনুরোধ আপনারা এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের বিচারের ব্যবস্থা করুন। আপনাদের সংগ্রামী আদর্শকে যিনি ঊর্ধ্বে ধরেছিলেন, তার হত্যার বিচারের দাবিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরুন। আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তিকামী জনগণের মুক্তিসংগ্রামকে যিনি পরম আরাধ্য বলে বিবেচনা করেছিলেন এবং সেই মুক্তি সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন— তাঁর স্মৃতিকে চিরস্থায়ী করার পদক্ষেপ নিন।

আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেকিরার মুক্তিকামী জনগণের অগ্রসেনানীদের যে শুধু হত্যা করেই সাম্রাজ্যবাদ ক্ষান্ত হয়েছে তা নয়, তাঁদের স্মৃতি পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করে ফেলছে। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে লাখ লাখ জনসমুদ্রের সামনে যে-স্থানে দাঁড়িয়ে বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেই স্বাধীনতা ঘোষণার পবিত্র স্মৃতিবাহী স্থানকে পরিণত করা হয়েছে খেলার মাঠে। তাঁর মরদেহ রাখা হয়েছে অযত্নে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, দেশের নির্জন কোন প্রান্তে। আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার জনগণের মুক্তির যাঁরা মহান জন্মদাতা, অমর স্বপ্নদ্রষ্টা ও বীর অগ্রসেনানী— তাঁদের স্মৃতি ও কর্ম অবদান ও আত্মদানকে স্থায়ী ও চিরস্থায়ী করার মাধ্যমেই আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার ভবিষ্যৎ জাতিসত্তার ভিত্তি ও গৌরব, শক্তি ও প্রেরণার উৎস গড়ে তুলতে হবে। কেননা আজ আমরা এখানে যে আদর্শ, চিন্তা, কর্ম ও স্বপ্নের কথা বলছি ও তার বাস্তবায়নে নিজেদেরকে চরম ত্যাগ স্বীকারে নিয়োজিত করেছি, সেই আদর্শ চিন্তা কর্ম ও স্বপ্নের যারা ছিলেন দিশারী ও স্থপতি, সেইসব নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বলে নাম ও স্মৃতিতে আফ্রোএশিয়া ল্যাটিন আমেরিকার জনগণসহ সারা বিশ্ববাসীর কাছে প্রাতঃস্মরণীয় করে তুলতে হবে। রক্তমাংসের ব্যক্তিকে হত্যা, মরদেহকে লোকচক্ষুর অন্তরাল ও তাদের মহৎ স্মৃতি নিশ্চিহ্ন করলে সেই আদর্শ চিন্তা কর্ম ও স্বপ্ন থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এই সত্যকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সাম্রাজ্যবাদকে মোকাবেলা করা যাবে এবং দেশে দেশে জাতীয়তাবাদী ও মুক্তিসংগ্রামী প্রাণপুরুষদের বিপ্লবী কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করার জন্যে হত্যার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের প্রতিরোধ সম্ভব হবে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যেকটি আঘাতকে প্রত্যাঘাতের মাধ্যমে এশিয়া ও আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার নির্যাতিত জনগণের বিজয় ও উত্থানকে সম্পন্ন ও পরিপূর্ণ করতে হবে। আফ্রো-এশিয় জনগণের সাথে জনগণের সংগ্রামে সামনের কাতারে যাঁরা ছিলেন তাঁদের অনেকেই অকাল মৃত্যুবরণ করেছেন। এখানে সমবেত আমরা কেউ গ্যারান্টি দিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করতে পারি না যে, পরবর্তী সংহতি সম্মেলনে পরস্পর আবার মিলিত হতে পারব। আফ্রো-এশিয়ার দেশগুলোর জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা আদায়ের জন্য আমরা লড়ছি। লড়ছি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি, প্রিয় জনগণকে রক্ষার জন্য, যে, মাতৃভূমি যে-জনগণ আমাদের কাছে প্রত্যাশা করে। মাতৃভূমি ও স্বদেশবাসীর জন্য জীবনপণ করা ব্যতীত আমাদের কোনো বিকল্প নেই। সংগ্রামী আদর্শ ও মুক্তির পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরা ব্যতীত। কোনো সুপার পাওয়অরের ভ্রূকুটি নর্থ-সাউথ ডায়লয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, মোজাম্বিক, অ্যাঙ্গোলা, নিকারাগুয়ায় সামরিক হামলা, নামিবিয়ার স্বাধীনতাকে পদানত, মিজাইলজালে বিশ্বকে ঘেরাও অথবা বিশাল সামরিক অভিযানের মাধ্যমে গ্রানাডাকে গ্রাস ও দাসত্বশৃঙ্খলে বন্দি করে আফ্রো-এশিয়ার সংগ্রামী জনগণের মুক্তির পতাকাকে নত করার আশা যে প্রভূত্বকামী শক্তিরা করেন, অতীতে তারা নিরাশ হয়েছেন ভবিষ্যতেও হবেন।

এতক্ষণ আমি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বলেছি, এখন আমি আন্তর্জাতিক বিষয়ে কিছু আলোকপাত করতে চাই।

বর্তমান পৃথিবী এখন চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখোমুখি। উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিরাপত্তা বিঘ্নিত ও এই এলাকার অধিবাসীরা অর্থনৈতিকভাবে প্রচণ্ড বিপদগ্রস্ত।

বর্তমানে পৃথিবীতে উৎপাদন ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, বেড়ে চলেছে ক্ষুধা, দারিদ্য বেকারত্ব আর সর্বব্যাপী হতাশা। তেল রফতানিকারক দেশগুলোর স্বপ্ল আয়ের লোকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে মানবিক সমস্যা।

ধনী দেশগুলোর সাহায্যদানের প্রবণতা কমে যাওয়ায় বিশ্বব্যাংকও দরিদ্র দেশগুলোকে যথাযথ সাহায্য করতে সক্ষম হচ্ছে না। দ্রব্যমূল্য বেড়ে চলেছে, অপরদিকে প্রকৃত উৎপাদনকারীরা তাদের নায্য দাবি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বেড়ে চলছে সুদের হার আকাশচুম্বিভাবে।

উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে আলোচনায় বর্ধিত অর্থনৈতিক সাহায্যের আবেদন মূলত উভয়েরই স্বার্থ জড়িত। উত্তরের বোঝা উচিত যে দক্ষিণকে সাহায্য তার নিজের স্বার্থেই করতে হবে।

আফ্রো-এশিয়ান দেশগুলো অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর মতো তাদের অর্থনৈতিক ভিতকে মজবুত করতে চায়, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের উন্নয়ন চায়। আমরা সর্বপ্রকার শোষণের বিরোধী। আমরা চাই ন্যায় বিচার ও সমতার ভিত্তিতে একটি নতুন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা।

আফ্রো-এশিয়ান দেশগুলোর মানব সম্পদ এবং প্রযুক্তি নিতান্ত কম নেই। আমাদের প্রয়োজন অর্থনৈতিক সাহায্য এবং সেই সম্পর্কীয় ঋণ যা আমাদের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে না, সুদের দায় মেটাতে শেষ হবে না আমাদের রফতানী আয়। এইজন্য আমাদের প্রত্যেকটি দেশের উচিত নিজস্ব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত মজবুত করা এবং লব্ধ অভিজ্ঞতার সুষ্ঠু প্রয়োগ। উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলোর বিশ্বে একটি ভারসাম্যরক্ষার জন্যই প্রয়োজন পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা।

ভারত মহাসাগরকে শান্তিরক্ষার নামে ক্রমাগত সামরিক এলাকায় পরিণত করা হচ্ছে। ১৩ বছর আগে জাতিসংঘ এই এলাকাকে শান্তি এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে, কিন্তু তার পরেও নিরাপত্তার নামে এখানে মোতায়েন করা হচ্ছে পারমাণবিক যুদ্ধজাহাজ আর পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র। আসুন, আমরা একসাথে দাবি জানাই ভারত মহাসাগরকে শান্তি এলাকা হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য আবাসভূমির দাবি অস্বীকারই হচ্ছে পশ্চিম এশিয়া সংকটের কেন্দ্রবিন্দু। তাদের পৃথক আবাসভূমির দাবী যতদিন না মেটানো হচ্ছে ততদিন এই সংকটের সমাধান হবে না। ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য দাবির প্রতি রয়েছে আমাদের সর্বাত্মক সমর্থন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী নীতি দক্ষিণ আফ্রিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদের অধিকারকে চরমভাবে পদদলিত করেছে এবং এখনও করে চলেছে। নামিবিয়াতে যে নির্যাতন চলছে জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থা কোনোভাবেই তা উপেক্ষা করতে পারে না। সোয়াপোর প্রতি রয়েছে আমাদের পূর্ণ সমর্থন। নামিবিয়া আজ বিকৃত বর্ণবাদী উন্মত্ততার শিকার। পশ্চিমা দেশগুলোকে নিয়ে সংযোগ গ্রুপটি নামিবিয়ার স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করার পরিবর্তে তা আরো পিছিয়ে দিচ্ছে। আমি আশা করি আমাদের এই সম্মেলন নামিবিয়ার স্বাধীনতার সঙ্গে অ্যাঙ্গোলাতে বিদেশি সৈন্যের উপস্থিতির যোগসূত্রকে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করবে। অ্যাঙ্গোলা একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ অথচ এটাও আজ দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রমাগত হুমকি ও আক্রমণের শিকার।

মধ্য আমেরিকান দেশগুলোতেও পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে। কিন্তু যখনি শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনকে অস্বীকার করা হয় তখনি হানাহানি আর উম্মত্ততা এসে এর জায়গা দখল করে। বাইরের সমর্থন এবং সহযোগিতা কোনো পরিবর্তনকেই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। শুধুমাত্র সুষ্ঠু রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, সমঝোতা-সহযোগিতার মাধ্যমেই সম্ভব শান্তিপূর্ণ মঙ্গলকর পরিবর্তন। কনটাডোরা গ্রুপ মধ্য আমেরিকাতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলোচনা চালাতে এগিয়ে এসেছে, যাদের এই উদ্যোগকে সার্বিক সহযোগিতা করা প্রয়োজন। তাদের এই প্রয়াসকে সার্বিক সমর্থন জানাতে হবে। পারমাণবিক অস্ত্রের মওজুত ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। পরাশক্তিগুলো আজ শক্তির প্রতিযোগিতায় মত্ত যা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের জন্য এক ভীষণ হুমকি ও ভীতির কারণ। কৌশলগত অস্ত্র উৎপাদন এবং তার ভাণ্ডার গড়ে তোলা আজ অনেকগুলো শক্তিধর দেশের জন্য নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন নতুন এলাকাকে আনা হচ্ছে সামরিক জোট ও আঁতাতের অধীনে।

কিন্তু শুধুমাত্র সহঅবস্থান এই সার্বিক অবস্থানের তথা স্থিতির পূর্বশর্ত। আমরা অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা এবং নিজের সার্বভৌমত্ব রক্ষার নীতিতে বিশ্বাসী। তবুও আফ্রিকা, এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের ঘটনা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। যাই হোক, এর প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন শান্তিপূর্ণ সমাধান। সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের এই নীতি মেনে চলা উচিত, যে-কোনো অবস্থাতেই অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা বেআইনি ও নীতিবিরুদ্ধ কাজ।

অপরের উপর আধিপত্যবাদের ইচ্ছাই পৃথিবীর সকল অশান্তির মূল উৎস। সমস্ত মানুষ মুক্তভাবেই জন্মগ্রহণ করে। সেই রকম সকল জাতিই স্বাধীন এবং মুক্ত। কিন্তু অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামরিক ক্ষমতা এবং উন্নততর প্রযুক্তির কারণে এক দেশ অপর দেশকে পদানত করার প্রয়াস পাচ্ছে। আমাদের নিজেদের স্বাধীনতা এসেছে দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক দাসত্বের পর— যার অশুভ ছায়া আজও আমাদের তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

আমরা যে শান্তির স্বপক্ষে কাজ করছি তা সবার জন্যই মঙ্গলকর। এই শান্তি কোনো বিচ্ছিন্ন এলাকা বা গোষ্ঠীর স্বার্থে নয়, বিশ্বের প্রতিটি মানুষের জন্যই তা সমান কার্যকর। আজ ধনী ও শক্তিধর দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে চরমভাবে সুরক্ষিত। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূরকরণের মাধ্যমেই সুদৃঢ় করা সম্ভব কেননা সমস্ত পৃথিবীটাই একটি একক সত্তা।

আমি এতক্ষণ আমাদের নিজস্ব এলাকার সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম। আজ সবাইতে জরুরি যে-সমস্যা, তা হল মানব জাতির টিকে থাকার সমস্যা। কেননা আমরা জানি আমরা নিজেরা যদি কোনো পারমাণবিক যুদ্ধে জড়িয়ে নাও পড়ি, তবু আমরা এর সর্বগ্রাসী ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পাব না। পারমাণবিক অস্ত্রের ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ও ভয়ংকর প্রতিযোগিতার কারণেই আমাদেরকে আরো সংঘবদ্ধভাবে শান্তির স্বপক্ষে কাজ করে যেতে হবে।

শান্তির জন্য আমাদের আহ্বানে আজ কর্ণপাত যদি নাও করা হয় তবুও আমরা কাজ করে যাব। কেননা শুভ উদ্দেশ্য ও সৎ আদর্শে নিবেদিত কোনো কাজই ব্যর্থ হতে পারে না বা তাকে দীর্ঘদিন দমিয়ে রাখা যায় না।

আফ্রো-এশিয়ার সংগ্রামী নেতৃবৃন্দের সম্মেলন থেকে শুধু আমরাই নই সারা বিশ্ববাসী লক্ষ করছেন, আফ্রো-এশিয়ার নির্যাতিত জনগণের মুক্তিসংগ্রাম বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। আফ্রো-এশিয়ার জনগণের রাজনৈতিক মুক্তি শেষ কথা নয়। কেননা আমাদের অর্থনৈতিক বিজয়ের সংগ্রাম কখনোই থামবে না। থামবে না আফ্রো-এশীয় জনগণের নবতর বিজয় অর্জন। জয় আমাদের পক্ষে। কেননা আফ্রো-এশিয়ার শক্তি আমাদের পরিচয় ও প্রেরণার উৎস। এই মহতী সম্মেলনের আয়োজন করার জন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে আমি আলজেরীয় সরকার ও জনগণকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। মনে হচ্ছে আমরা আমাদের নিজ দেশেই রয়েছি।

মাননীয় চেয়ারম্যান, এগারো বছর আগে এই সম্মেলনকক্ষে দাঁড়িয়ে আমার মহান পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে-উক্তি করেছিলেন আমি সে-উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করছি। তিনি বলেছিলেন, দুনিয়া আজ দু'ভাগে বিভক্ত—শোসক ও শোষিত। আমি শোষিতের পক্ষে।" আজ সম্মানিত শ্রোতৃবৃন্দের সামনে আমি সেই একই অঙ্গীকার করছি।

---

২৯ মে ১৯৮৪ সালে আলজিয়ার্সে আফ্রো-এশীয় সংহতি সম্মেলনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেত্রী হিসেবে ভাষণ।

দেশ ও জাতির স্থিতি আনতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ

আমার প্রিয় দেশবাসী,

আসসালামু আলাইকুম

আপনারা প্রথমেই আমার সংগ্রামী সালাম ও অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনারা জানেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাষ্ট আপনাদের প্রিয় নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে জনগণের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে এদেশে সূচিত হয়েছে সামরিক শাসনের ধারা। বঙ্গবন্ধুর গতিশীর নেতৃত্বে আপনাদের অপরিসীম ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষের আত্মদান, কোটি কোটি দেশবাসীর অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা, আড়াই লক্ষ মা-বোনের লাঞ্জনার পর আমারা বাংলাদেশকে স্বাধীন করে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা অর্জন করেছিলাম। কিন্তু জাতির জনকের হত্যাকাণ্ডের ফলে খুব দীর্ঘ সময় আমরা সেই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ধরে রাখতে পারিনি।

আপনারা জানেন, স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর গণতান্ত্রিক সরকার তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে দেশবাসীর কল্যাণে। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের অবস্থা সবই আপনাদের জানা আছে। সারা দেশে রাস্তাঘাট, সেতু,বন্দর,স্কুল,কলেজ, মসজিদ, কলকারখানা, ঘরবাড়ি, পাকসেনা ও রাজাকারদের তাণ্ডবলীলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রথমেই জনগণের কল্যাণে হাত দিয়েছিলেন দেশ গঠনের কাজে। শূন্য কোষাগার নিয়ে তাঁকে গড়ে তুলতে হয়েছে রাস্তাঘাট। নির্মাণ করতে হয়েছে শতশত রেল ও সড়ক-সেতু। জাহাজ ও ফেরি চলাচলের উপযোগী করতে হয়েছে ফেরিঘাট ও বন্দরসমূহ। স্কুল, কলেজ, মসজিদ ও সরকারি বেসরকারি ভবনসমূহ নির্মাণের সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি মেরামতে তিনি ব্যয় করেছেন কোটি কোটি টাকা। তার উপর ছিল এক কোটি ছিন্নমূল শরণার্থীর পুনর্বাসন সমস্যা, খাদ্যসংকট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত কলকারখানা চালু করে অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখা। প্রতিটি শহিদ পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ও পুনর্বাসন করা।

জাতির জনক বাংলার কৃষকের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরদিনের জন্য মওকুফ করেছিলেন। পাকিস্তান আমলের বকেয়া খাজনা মওকুফ, ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে খাসজমি বিতরণ,স্বল্পমূল্যে সার ও পাওয়ার পাম্প সরবরাহ, বিনামূল্যে কীটনাশক ঔষধ বিতরণ, কয়েক লক্ষ কৃষিঋণের সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার করেছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করে শিক্ষকদের সরকারী চাকুরের মর্যাদা দান, সারা দেশে হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কালাকানুন বাতিল ও স্বায়ত্তশাসন প্রদান, সহজলভ্য গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ও স্বায়ত্তশাসন

প্রদান,সহজলভ্য গণমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নারীশিক্ষাকে অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক করে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি উচ্চশিক্ষায় উন্নীত করার জন্য ডঃ কুদরত-এ-খোদা শিক্ষা কমিশন গঠন,সকল নাগরিকের সুচিকিৎসার জন্য প্রতি থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ, অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীদের স্থায়ী চাকুরের মর্যাদা দান, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন,ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, মদ, জুয়া, হাউজী, রেস খেলা বন্ধ প্রভৃতি কার্যক্রম অত্যান্ত সাফল্যের সাথেই গ্রহণ করেছিলেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু গড়ে তুলেছেন একটি আধুনিক ও শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনী। '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের শাসনামলে এই সেনাবাহিনীতে ছিল না কোনো হানাহানি, কোনো প্রকার বিশৃঙ্খল অবস্থা। জনগণের সাথে ছিল সেনাবাহিনীর মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল স্বাধীন জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি, আমাদের প্রিয় নেতা **শেখ** মুজিবুর রহমান একটি শক্তিশালী ভিত্তির উপর গড়ে তুলেছিলেন বিশ্বশান্তির প্রতি অবিচল, দুনিয়ার নিপীড়িত মুক্তিকামী জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামের প্রতি সোচ্চার, বর্ণবৈষম্যবাদবিরোধী সকল জাতি ও রষ্ট্রের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ **স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি**। যার ফলে জাতিসংঘ, কমনওয়েলথসহ সমগ্র বিশ্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জন করেছিল গৌরবময় ও সম্মানজনক অবস্থান। প্যালেস্টাইনের মুক্তিসংগ্রামের প্রতি দৃঢ় সমর্থন ও মুসলিম বিশ্বের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনের নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেছিলেন। ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদ লাভ করেছিল বাংলাদেশ তাঁর নেতৃত্বে। **বিশ্বশান্তি ও ভ্রাতৃ**ত্বের প্রতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেক মুজিবের মহান অবদানের স্বীকৃতি-স্বরূপ বিশ্বশান্তি পরিষদ তাঁকে প্রদান করেছিল শান্তির প্রতীক "জুলিও কুরী" পদক।

দেশে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু নির্বাচিত গণপরিষদের মাধ্যমে স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যেই জাতির জন্য একটি সর্বাধুনিক গণতান্ত্রিক সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন। জনগণের দীর্ঘদিনের সংগ্রাম ও গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতার মূল্যবোধকে অক্ষুণ্ন রেখে '৭২-এর সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র,সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা— এই চারটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সকল প্রগতিশীল পদক্ষেপ, পুনর্গঠন, পুনর্বাসন প্রক্রিয়া এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তনকে চরমভাবে বাধা দেওয়া শুরু হয়েছিল স্বাধীনতার পর থেকেই। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি ও একশ্রেণীর উগ্র হঠকারী চক্র দেশি-বিদেশি শত্রুদের মদদপুষ্ট হয়ে দেশের অভ্যন্তরে সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম গড়ে তুলছিল। গুপ্তহত্যা, সার কারখানায় বিস্ফোরন,পাটের গুদামে আগুন, থানা ও ফাঁড়ি লুট প্রভৃতি কার্যক্রম বিপ্লবের নামে সারা দেশে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়েছিল। উপর্যুপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শস্যহানি, বন্যা,বিশ্ববাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং খাদ্য নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চক্রান্তে নগদ অর্থে কেনা খাদ্যের জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে

ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে '৭৪-এ দেশে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। বঙ্গবন্ধুর সরকার স্বল্প সময়ের মধ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় সেদিন পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন।

এমনি অবস্থায় সকল দুর্যোগ ডিঙিয়ে বাংলাদেশে স্বাবলম্বী অর্থনীতি গড়ে তুলে একটি শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। বহুমুখী গ্রাম সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও সুসম বণ্টন-ব্যবস্থা, শিল্পকারখানায় শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ। দুর্নীতিমুক্ত গণমুখী প্রশাসনব্যবস্থার প্রবর্তন, দ্রুততর ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা, সহজলভ্য গণমুখী বিজ্ঞানভিত্তিক কারিগরি ও বৃত্তিমুলক শিক্ষা-ব্যবস্থা,নিরক্ষরতা দূরীকরণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, বিনা খরচে সুচিকিৎসার সুযোগ ও শোষিতের গণতন্ত্র তথা সকল শ্রেণীর ও পেশার জনগণের পূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠাই ছিল দ্বিতীয় বিপ্লবের মূল লক্ষ্য। দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী ঘোষণা করে বঙ্গবন্ধু ডাক দিয়েছিলেন জাতীয় ঐক্যের। সে ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের রাজনৈতিক দলসমূহ সাংবাদিক, সশস্ত্রবাহিনী, সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী, কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক, ছাত্র,আইনজীবী, ডাক্তারসহ সর্বস্তরের পেশাজীবী জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশগড়ার কাজে একই রাজনৈতিক মঞ্চে যোগ দিয়েছিলেন। ঐক্যবদ্ধভাবে দেশকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা যখন শুরু হল তখনই সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় এজেন্টরা জাতির জনককে হত্যা করে এদেশে সূচিত করেছে সামরিক শাসনের ধারা। জনগণ নয়, ব্যালট নয়, অস্ত্র ও বুলেটই হয়ে উঠল ক্ষমতার উৎস। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে শুরু হয় হত্যা-ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। এক উচ্চভিলাষী সামরিক চক্র একের পর এক হত্যা ও ষড়যন্ত্রের ক্ষমতার পালাবদল করে চলছে। এরা অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা দখল করে অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার উদ্দেশ্যে সরকারি অর্থ ব্যয়, প্রশাসন যন্ত্র এবং গোয়েন্দা সংস্থাকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছে নিজেদের ক্ষমতার ভিত। ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে দেশের দুশ্চরিত্র, দলছুট ও সামাজিক অপরাধীদের সমন্বয়ে রাজনৈতিক দল গঠন করে তথাকথিত নির্বাচনের নামে এই শক্তি ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে চায়। '৭২-এর গণতান্ত্রিক সংবিধানকে বুটের তলায় চাপা দিয়ে উর্দিপরা ব্যক্তিরা যখন-তখন কলমের খোঁচায় সংবিধান পরিবর্তন করেছে। এভাবে গত ১১ বছর কখনও প্রকাশ্যে কখনও অপ্রকাশ্যে, কখনও প্রত্যক্ষ কখনও পরোক্ষ সামরিক শাসন চালু রয়েছে বাংলাদেশে। '৭৫-এর পর যারাই ক্ষমতায় এসেছে তাদের কেউ এসেছে বেসামরিক লেবাসে বন্দুকের নলে চেপে বসে, আর কেউ এসেছে সরাসরি উর্দি পরে বন্দুক হাতে নিয়ে।

গত এগারো বছরের সামরিক শাসনের প্রত্যক্ষ ফল হচ্ছে স্বৈরাচারী শাসনপদ্ধতির একচ্ছত্র আধিপত্য। এই সামরিক স্বৈরশাসন দেশের সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, আইনের শাসন ও জনগণের মৌলিক অধিকারের সকল নীতিমালা ধ্বংস করে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। তাদের হাতে গণতন্ত্র লাভ করেছে আইয়ুবি রূপ। পরিবর্তন হয়েছে মহান স্বাধীনতার সুফল রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহ।

জাতীয়করণ বানচালের অশুভ সূচনা, ক্ষমতার স্বার্থে সেনাবাহিনীকে জনতার প্রতিপক্ষরূপে দাঁড় করানোর অপচেষ্টা, প্রশাসনের অভ্যন্তরে দুর্নীতির প্রবেশ, রাজনৈতিক দলে ভাঙন সৃষ্টি ও চরিত্রহননের প্রক্রিয়া, সামাজিক অপরাধীদের প্রশ্রয়দান, জাতির জনকের হত্যাকারী ও জেলখানায় চার জাতীয় নেতার খুনীদের পুনর্বাসন এবং দূতাবাসের চাকুরি প্রদানের মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান, ব্যাংক ঋণের টাকা লুটপাট, ক্ষমতাসীনদের কালোবাজারি ও চোরাচালানে অংশগ্রহণ, স্বাধীনতাবিরোধীদের পুনর্বাসন, সমাজে সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি, নতজানু পররাষ্ট্রনীতির সূচনা প্রভৃতি অপকর্ম অত্যান্ত চাতুর্যের সাথে সম্পন্ন করেছে এই সামরিকচক্র। রাজনীতিতে গণতন্ত্রের বদলে স্বৈরতন্ত্রের ধারা, অর্থনীতিতে অব্যবস্থা ও কালো টাকার দৌরাত্ম্য, সামাজিক ক্ষেত্রে অনাচার '৭৫-এর তুলনায় দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার নিম্নমান সৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে বিদেশি ভাবধারার আমদানি এবং অবক্ষয়ের ধারা হচ্ছে এই সামরিক শাসন আমলের শ্রেষ্ঠতম অবদান।

'৮২ সালের ২৪শে মার্চ দেশে আবার নতুন পর্যায়ে সামরিক শাসন জারি হয়। চারিত্রিকভাবে এই সামরিক শাসনও পুরানো ধারার সাথে এক ও অভিন্ন। গত চার বছরের স্বৈরশাসনের ফলে দেশের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, কর্মচারী, ব্যবসায়ীসহ সর্বস্তরের ও শ্রেণীর জনগণের জীবনে নেমে এসেছে চরম বিপর্যয়। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ঘটেছে চরম অবনতি। সামাজিক অনাচার, খুন-রাহাজানি, শিশু-কিশোর হত্যা, নারী নির্যাতন, বোমাবাজি, লুটপাট অতীতের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, শিক্ষা উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি, ভ্রান্ত শিক্ষানীতির প্রবর্তন, শিক্ষক-সমাজের প্রতি বৈষম্যমূলক বিধিব্যবস্থা শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। সার, কীটনাশক, পাওয়ার পাম্পসহ কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের মূল্যহীনতার সাথে খাজনা, ট্যাক্স, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও রেশনের মূল্য বৃদ্ধি বিরাষ্ট্রীয়করণের ফলে শ্রমিক ছাঁটাই, ব্যাংক কর্মচারীসহ সরকারি কর্মচারীদের চাকুরিচ্যুতি, ন্যায়সঙ্গত মুজরি ও বেতনের অভাব, জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে দেশের শ্রমিক কর্মচারী ও মধ্যবিত্তের জীবনে উঠেছে নাভিঃশ্বাস। সরকার বিভিন্ন খাতে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণের হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করেছে অনুৎপাদনশীল খাতসহ সামরিক-চক্রের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের কাজে। কৃষি ঋণ ও সুদ আদায়ের নামে কৃষকদের উপর চলছে নির্যাতন।

আজ দেশে এক কোটি বিশ লক্ষ বেকার মানবেতর জীবন-যাপন করছে। আজ দেশীয় শিল্পের বিকাশ বন্ধ করে পুঁজির নামে দেশি-বিদেশি লুটেরা গ্রাস করেছে আমদানি রপ্তানি ব্যবসা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ঋণ, মৎস শিল্প তথা অর্থনীতির সকল শাখা। বর্তমান সামরিক জান্তা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে সংবিধান স্থগিত ঘোষণাই করেনি, সংবিধানবিরোধী পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে অবলীলায়। দীর্ঘদিন সামরিক আদালত টিকিয়ে রেখে জনগণের স্বাভাবিক বিচারপ্রাপ্তির অধিকার হরণ করেছে।

বিক্রেন্দ্রীয়করণের নামে সুপ্রীম কোর্টের অবকাঠামো পরিবর্তন, এখতিয়ার ও ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ, করা হয়েছে সামরিক শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হরণ, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীয়করণের নামে গ্রাম পর্যায়ে দুর্নীতির প্রসার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেছে নির্দ্বিধায়। বিভিন্ন সেক্টর কর্পোরেশন, ব্যাংক, সরকারি সংস্থা, সচিবালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সামরিক ব্যক্তিদের উচ্চ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে সৃষ্টি করেছে প্রশাসনিক জটিলতা।

আমার সংগ্রামী দেশবাসী

আপনারা জানেন, এই সামরিক স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গত চার বছর ধরে আমরা পাঁচ দফার ভিত্তিতে লড়াই করেছি। আমাদের আন্দোলনের সাথে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ, পেশাজীবী, আইনজীবী শিক্ষকসহ সর্বস্তরের জনগণের সংগ্রামে একটি ঐক্যবদ্ধ জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে। পনর দলীয় ঐক্যজোটের আহ্বানে জনগণ ধর্মঘট, হরতাল, বিক্ষোভ, সমাবেশের মধ্য দিয়ে একাধিকবার ঘোষনা করেছে গণরায়। কিন্তু এই স্বৈরসরকার জনমতের তোয়াক্কা না করে বেছে নিয়েছে হত্যা, নির্যাতন ও গ্রেফতারের পথ। স্বৈরশাসনবিরোধী আন্দোলনে আত্মাহুতি দিয়েছেন সেলিম-দেলওয়ার, ময়েজউদ্দিন ও রবিউল আওয়াল কিরণ। এমনিভাবে গত চার বছরের গণতান্ত্রিক সংগ্রামে শহিদ হয়েছেন তিতাস, বসুনিয়া, শাজাহান সিরাজ, আসলাম, শ্রমিক নেতা তাজুল, আওয়ামী লীগ কর্মী রমীজ, স্বপন, সোহরাব, মোজাম্মেল, দিপালী সাহাসহ দেশমাতৃকার অগণিত বীর সন্তান। পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে হাজার হাজার ছাত্র, শিক্ষক, শ্রমিক সাংবাদিক ও জনতা। গ্রেফতার, হুলিয়া, মিথ্যা মামলা, হয়রানি সহ্য করতে হয়েছে জাতীয় নেতৃবৃন্দসহ সর্বস্তরের রাজনৈতিক কর্মী, শ্রমিক, কর্মচারী, ছাত্র, শিক্ষক ও পেশাজীবী জনগণকে। আজ কারাগারে ফাঁসির আদেশ মাথায় নিয়ে প্রগর গুনছে ছাত্রনেতা মহিউদ্দিন, বিশ্বজিত নন্দী। নির্যাতন ভোগ করছেন লতিফ সিদ্দিকীসহ বহু রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী। সামরিক আইনে ক্ষমতাসীন এই সরকার শুধু ক্ষমতাই টিকিয়ে রাখেনি, সামরিক শাসনের কড়াকড়ি আরোপ করে আন্দোলনের মাধ্যমে অর্জিত জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিয়ে কোটি কোটি টাকা অপচয় করে তথা কথিত গণভোট ও উপজেলা নির্বাচনের প্রহসন করেছে, যা সমগ্র বিশ্বে কুড়িয়েছে নিন্দা ও ধিক্কার। শত শহিদের রক্তরঞ্জিত ৫ দফার মূল চেতনা হচ্ছে সামরিক শাসনের চির-অবসান।

একটি অবাধ নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই স্বৈরশাসনের অবসান ঘটাতে গত চার বছরের সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে আওয়ামী লীগসহ ১৫ দলীয় ঐক্যজোট।

আমরা দেখেছি, জনগণের আন্দোলনের ফলে বারবার এই সরকার নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলেও সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় বিরোধী দলসমূহের উপর দোষ চাপিয়ে তারিখ স্থগিত ঘোষণা করে নির্বাচন হতে দেয়নি।

বর্তমান পর্যায়ে সামরিক সরকার একতরফাভাবে গণভোট স্টাইলে একটি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। অপর দিকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পেছন দরজা দিয়ে ক্ষমতাদখলের একটি দুরভিসন্ধি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎকে করে তুলেছিল সংকটাপন্ন। এমনি একটি সংঘাতময় পরিস্থিতিকে এড়ানোর জন্য গণতান্ত্রিক ভবিষ্যতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আত্মপ্রত্যয় নিয়ে আওয়ামী লীগ তথা পনর দলী জোট নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই নির্বাচনকে আমরা সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ৫ দফার পক্ষে জনগণের ম্যান্ডেট আদায়ের উদ্দেশ্যে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করেছি। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি প্রক্রিয়ারূপে চলমান গণআন্দোলনকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এই নির্বাচনী সংগ্রাম। গত চার বছরের গণআন্দোলনের ক্ষেত্রে সামরিক স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে জনগণের যে তীব্র অনাস্থা ও ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে তাকে এই নির্বাচনী জোয়ারের মধ্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সাফল্যে আমরা আরো এগিয়ে নিতে চাই। বাংলাদেশের বুক থেকে সামরিক শাসনের চির-অবসান ঘটিয়ে নির্বাচনী সাফল্যকে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়ে যাওয়ার জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর আদর্শের ভিত্তিতে শোষণহীন সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে চায়। নির্বাচিত সার্বভৌম জাতীয় সংসদ রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ রূপে গড়ে তুলতে চাই। আওয়ামী লীগ '৭৫-এর ১৫ই অগাস্টে জাতির জনকের হত্যা ও তাঁর পরিবারবর্গ, শেখ মনি, আব্দুর রব সেরনিয়াবাত ও কর্নেল জামিলের হত্যাকাণ্ড এবং ৩রা নভেম্বর কারাগারে নিহত জাতীয় চার নেতার হত্যার বিচার চায়। মহান স্বাধীনতার সুফল শাসনতন্ত্রের সন্নিবেশিত চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি আওয়মী লীগ যে-কোনো মূল্যে রক্ষা করবেই। জনগণের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের মৌলিক চাহিদার নিশ্চয়তা আমাদের লক্ষ্য। কৃষিক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত ভূমিসংস্কার, কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে দেশের কৃষক ও ক্ষেত-মুজরের অবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করতে হলে আমরা মনে করি প্রথমত বহুমুখী গ্রাম সমবায়ের ভিত্তিতে কৃষক, ক্ষেতমজুর, ভূমির মালিক ও সরকারের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তার সাথে ঘটাতে হবে কুটিরশিল্পের প্রসার। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিমালিকানাধীন দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের স্বার্থে দেশীয় কাঁচামালের সদ্ব্যবহার, আমদানি, হ্রাস, রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। দেশীয় শিল্প ও ব্যবসার উন্নয়নের লক্ষ্যে গ্রহণ করতে হবে কার্যকর পরিকল্পনা তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বৃহৎ ও ভারী শিল্পের উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। দেশের উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করতে হবে সঠিক, কার্যকর ও বাস্তবমুখী পরিকল্পনা।

রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীলতার জন্যই আমরা স্থায়িভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সাধন করতে চাই। উপজাতি সমস্যার রাজনৈতিক

সমাধানই আমরা যুক্তিসঙ্গত পথ বলে মনে করি। এই বাংলার হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ সকল সংখ্যালঘু নাগরিকের পূর্ণ নাগরিক অধিকারে আওয়ামী লীগ বিশ্বাসী। সকল শ্রেণীর ও পেশার জনগণের মৌলিক অধিকার ও ন্যায়সঙ্গত দাবি দাওয়ার প্রতি রয়েছে আমাদের পূর্ণ সহানুভূতি ও সমর্থন। বাঙ্গালির ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ রক্ষায়, সংস্কৃতির বিকাশে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষায় ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের অবিচল ভূমিকা অব্যাহত থাকবে। শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য দাবি ও ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার সংরক্ষণ করতে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ আমরা গড়ে তুলতে চাই। আওয়ামী লীগ যে-কোনো মূল্যে আমাদের জাতীয় সশস্ত্রবাহিনীর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। সেনাবাহিনীকে ক্ষমতাদখলের হাতিয়ারে পরিণত না করে তার সত্যিকার উন্নয়নই আমাদের লক্ষ্য।

আমরা চাই বাংলার গরিব-দুখী মানুষের সুচিকিৎসার লক্ষ্যে প্রত্যেক থানায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও হাসপাতাল এবং দেশের চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের উন্নয়ন সাধন। দুর্নীতি-মুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সরকারি, কর্মচারী, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সত্যিকার উন্নয়ন নিশ্চিত করতে চাই। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমাদের ভূমিকা অত্যন্ত পরিষ্কার। বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন সক্রিয় ও মর্যাদাসম্পন্ন জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতিতে আমরা বিশ্বাসী। প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান, মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও বিশ্বের অন্যান্য সকল দেশের সাথে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য।

আপনারা জানেন, আওয়ামী লীগ এ দেশের জনগণেরই সংগঠন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে বা সেনা ছাউনিতে এই দলের জন্ম হয়নি। কোনো সামরিক শাসকের পকেট থেকেও বের হয়ে আসেনি। বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিকাশ ঘটেছে দীর্ঘ তিন যুগ ধরে। কোনো ষড়যন্ত্র আমাকে ক্ষমতায় বসিয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাসীন দলে পরিণত করবে আমরা তা বিশ্বাস করি না। একমাত্র ব্যালট ও জনগণের ইচ্ছা ভিন্ন অন্য কিছুই ক্ষমতা দখলের উপায় হিসাবে আমরা বিবেচনা করি না।

আমার সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা

আপনাদেরকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই আওয়ামী লীগের প্রতি আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের জন্য। ১৯৮১ সালে দেশে ফেরার পর বঙ্গবন্ধু-প্রেমিক বাঙ্গালি জাতি আমাকে যে গভীর উষ্ণতায় একাত্ম করে নিয়েছে তা-ই আমার চলার পথের পাথেয়। আজও বাংলার পথে-প্রান্তরে আপনাদের যে প্রাণঢালা সমর্থন, দোয়া ও আশীর্বাদ আমি পাচ্ছি তাতেই প্রমাণিত হয় বঙ্গবন্ধু, আওয়ামী লীগ ও বাংলার জনগণ এক প্রাণ, এক আত্মা।

আমি আজ সব হারিয়ে বাংলার মানুষের মাঝে ফিরে এসেছি। আমি আপনাদের

মাঝেই ফিরে পেতে চাই আমার হারানো বাবা, মা ও ভাইদের স্নেহ-ভালবাসা। বঙ্গবন্ধু যেমন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ষড়যন্ত্রের সাথে আপোস করেননি, এই বাংলায় বঙ্গবন্ধুর পথ ধরেই জনগণের মুক্তির সংগ্রামে আমিও এগিয়ে চলেছি, এগিয়ে যাব। আপনাদের ঐক্যবদ্ধ সমর্থন ও সহযোগিতা আমাদেরকে আরও অনুপ্রাণিত করবে।

আমি আপনাদের বলতে চাই, নির্বাচনী এই সংগ্রামে আজ জনতার যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে তাকে যদি অন্য খাতে প্রবাহিত করার কোনো অপচেষ্টা গ্রহণ করা হয় জনতার সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমরা তার জবাব দেব। আমরা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই। নির্বাচনের ফলাফলকে কারচুপি বা অন্য কোনো পন্থায় নস্যাৎ করার চেষ্টা হলে আমরা যে কোনো মূল্যে তা প্রতিরোধ করব। জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

আমি পুর্নবার আপনাদেরকে জানাচ্ছি সংগ্রামী অভিনন্দন। আপনাদের প্রিয় প্রতীক নৌকা আবার এসেছে সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আপনাদের দ্বারে। সারা বাংলায় আমি দেখে এসেছি নৌকার পালে লেগেছে হাওয়া। জনতার সাগরে জেগেছে ঊর্মি। আমি বিশ্বাস করি ১৫ দল তথা নৌকার বিজয় হবেই হবে ইনশাহ্‌আল্লা। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা—জয় বঙ্গবন্ধু।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ ৫মে ১৯৮৬ সালে বেতার ও টেলিবিশন ভাষণ।

এ বিলের মাধ্যমে বুলেটে অর্জিত ক্ষমতাকে ব্যালটের মাধ্যমে অনুমোদন করাইয়া নেওয়া হইল। ৭ম সংশোধনী বিল অনুমোদনের পর সংসদের বিরোধী দলীয় নেতার কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি দেশের ভবিষ্যতের প্রতি আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া বলেন, ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল যে প্রক্রিয়ায় ৫ম সংশোধনী বিল অনুমোদন করা হইয়াছিল, সেই একই প্রক্রিয়ায় আজ ৭ম সংশোধনী বিল পাস করানো হইল। আমার আশঙ্কা, একই প্রক্রিয়ার ধারায় না জানি ভবিষ্যতে আবার কত নম্বর সংশোধনী আসে।

বিলের প্রতিবাদ করিয়া শেখ হাসিনা বলেন, আন্দোলন অব্যাহত থাকিবে। তবে একজন সাংবাদিকের একটি প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হইলে তাঁহারা সংসদে বসিবেন।

শেখ হাসিনা উল্লেখ করেন, বিলের কপি পরিবেশন না করিয়া এমনকি তাঁহার দলের এমপিদেরও অন্ধকারে রাখিয়া মাত্র ৪ ঘণ্টার মধ্যে বিলটি পাস করাইলেন। ১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ সামরিক শাসন জারির সময়ও একটি সংসদ ছিল। তিনি তখন সংসদের পরামর্শ নেন নাই। তিনি বলেন, সংবিধানের সার্বভৌমত্ব প্রথম ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে ক্ষুণ্ন করা হয়। ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ৪ নীতিসহ সংবিধানের মৌল নীতিমালার পরিবর্তন করা হয়। আজ এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের উচ্চাভিলাষকে আইনানুগ করা হইল।

৮ দল ভুক্ত ও স্বতন্ত্র কয়েকজন সদস্যকে বিলে সমর্থনকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যায়িত করিয়া তিনি বলেন, তাঁহারা সমর্থন না দিলে জেনারেল এরশাদ এই বিল অনুমোদন করাইতে পারিতেন না।

১১-১১-৮৬ তারিখে জাতীয় সংসদে ৭ম সংশোধনী বিল পাস হওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলন

(দৈনিক ইত্তেফাকের সৌজন্যে)

সামরিক আইন জারী হয়
ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষার জন্য

মাননীয় স্পীকার, আমি এই প্রসঙ্গে কথা বলতে চাই। এখানে কতগুলো কথা এসে গেছে। একটি হল ঃ যেমন, সামরিক শাসনের ৭ম সংশোধনীর কথা এবং সেই ৭ম সংশোধনী পাস করলে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে বা ৭ম সংশোধনী পাস করার জন্য ভোট দিলে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এই যুক্তি তঁরা দেখিয়েছেন। আমরা ১৫ দলীয় ঐক্যজোট হিসাবে নির্বাচন করেছিলাম, ১৫ দলীয় ঐক্যজোট হিসেবে ইলেকশন কমিশনে যে-তালিকা পাঠানো হয় সেই তালিকার প্রতিটি পাতায় আমার সই রয়েছে। যে প্রতীক বরাদ্দ করা হয় সেই প্রতীকে জোট নেত্রী হিসেবে আমার সই রয়েছে। সরদার আমজাদ হোসেনসহ অনেকেই সেই সই অনুযায়ী প্রতীক পান। আমার কথা সেটা নয়, আমি অন্য কথা বলতে চাই।

আমার কথা হচ্ছে, আমরা কোথায় আছি, কোথায় বাস করছি। দীর্ঘদিন ধরে আমরা আন্দোলন করে যাচ্ছি। সেই আন্দোলন ছিল—সামরিক শাসনের অবসান ঘটানোর, জনগণের শাসন কায়েম করার। এই আন্দোলনের পথ বেয়ে অনেক রক্ত গিয়েছে, অনেক জীবন গিয়েছে। জনাব স্পীকার সাহেব, সংবিধানের সংশোধনী আনা হয়েছে। এই সংবিধান অনুসারে আমি জানতে চাই, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ স্থগিত রেখে সংবিধান সংশোধন সম্পূর্ণ বে-আইনি।

এটা সম্পূর্ণ বেআইনি। সংবিধানের কোনো সংশোধন সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ স্থগিত রেখে হতে পারে না, কিন্তু সেই সংবিধানের যে পরিবর্তন করা হয়েছে বা বিভিন্ন পরিবর্তন আনা হয়েছে সেই পরিবর্তন কিসের অধিকারে আনা হয়েছে? সামরিক শাসনের আওতায় অর্ডিন্যান্স দ্বারা.........

আজকে সংসদের সাথে বা এই সংবিধানের সাথে সামরিক আইনের কোন সংযোগ রয়েছে আমি জানতে চাই। এই সংবিধানের সঙ্গে........

মাননীয় স্পীকার, আমি আপনার কাছে কিছু কথা বলতে চাই।

এই সংবিধানের কোথায় সামরিক আইন জারির বিধি রয়েছে? সামরিক আইন জারি করা হয়েছে ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীবিশেষের স্বার্থ রক্ষা করবার জন্য। ৭ম সংশোধনী পাস হলে সামরিক আইন তুলে নেওয়া হবে ৭ম সংশোধনীতে সেই কথার উল্লেখ আছে কি না? আমি মাননীয় সদস্যদের কাছে স্পীকারের মাধ্যমে জানতে চাই। ৭ম সংশোধনীতে কোথায় লেখা ছিল যে, ৭ম সংশোধনী পাস হলে সামরিক আইন তুলে নেয়া হবে? এই কথা কি ৭ম সংশোধনীতে লেখা ছিল?

এই কথা কোথাও লেখা ছিল না। শুধু তাই নয়, আজকে সামরিক আইন জারি করে মার্শাল ল অর্ডিন্যান্সের মধ্য দিয়ে যে-সমস্ত আইন পাস করা হয়েছে সেই সমস্ত আইন কিভাবে একটা সংসদ গ্রহণ করতে পারে, কিভাবে একটা সংসদ সেটা পাস করতে পারে? এটা জনগণের নির্বাচিত কোনো সদস্যই পাস করতে পারেন না।

জনাব ডেপুটি স্পীকার ঃ বিরোধী দলীয় নেত্রী, আপনি এই পয়েন্টে.........

শেখ হাসিনা ঃ যারা ব্যক্তিবিশেষের অনুকম্পা নিয়ে এই সংসদে বসেছেন কেবল তাঁরাই পারেন এই সংশোধনী পাস করাতে। কিন্তু সত্যিকার জনগণের ভোটে নির্বাচিত যাঁরা তাঁরা জনগণের বিরুদ্ধে। কখনই ভোট দিতে পারে না।

ডেপুটি স্পীকার ঃ একটি পয়েন্টেই বারবার বলছেন।

শেখ হাসিনা ঃ আজকে ৭ম সংশোধনী পাস করানোর সঙ্গে সামরিক আইন প্রত্যাহারের কোনো সংযোগ নাই। ৭ম সংশোধনী পাস করানোর সঙ্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোনো সংযোগ নাই। জনগণের অধিকার ক্ষুণ্ন করে ব্যক্তিবিশেষ, গোষ্ঠীবিশেষ, ক্ষমতা দখল করে...........

মার্শাল ল' জারি করে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে ব্যক্তিবিশেষের গোষ্ঠীবিশেষ ক্ষমতা দখল করে।

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কোনো সামরিক জান্তা বা সামরিক স্বৈরশাসনের প্রবর্তিত আইন কখনও পাস করতে পারে না। সামরিক শাসকদের লেজুড়বৃত্তি করে যারা ভোট ডাকাতি করে, মিডিয়া ক্যু করে এই সংসদে বসেছেন, কেবল তারাই পারেন সেই শাসকদের পদলেহন করতে। তারা এই পদলেহনকারী সামরিক জান্তার সন্তান ছাড়া আর কিছুই নয়।

---

৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ জাতীয় সংসদে ৭ম সংশোধনীর বিতর্কে ভাষণ

জাতীয় রাজনীতি থেকে অস্ত্রের খেলা বন্ধ করতে হবে

মাননীয় স্পীকার, আজকে যে-বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেটা জাতীয় জীবনে সত্যিই একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সবচেয়ে প্রথমে যে একটা প্রশ্ন আসে সেটা হল অস্ত্র দ্বারা রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হবে, না রাজনীতি অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করবে! আমাদের জাতীয় জীবনে আজকে সেটাই মূল কথা।

আমরা জাতীয় জীবনে কী দেখছি? এই অস্ত্রের রাজনীতি কেন শুরু হয়েছে? একটি গেরিলা যুদ্ধ যখন হয়, স্বাধীনতা যুদ্ধ যখন হয়, তখন অস্ত্র সারা দেশে ছড়িয়ে থাকে, ছড়িয়ে থাকতে বাধ্য। সেই পরিবেশ, সেই পরিস্থিতি এক ধরনের। কিন্তু স্বাধীনতার পর পনর বছরের মাথায় এসেও সেই অস্ত্র নিয়ে আজকে রাজনীতিকে যাঁরা নিয়ন্ত্রিত করছেন, জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে অস্ত্র দ্বারা যাঁরা মানুষের মৌলিক অধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ন্ত্রিত করছেন, দুটো খুনের আসামী হয়েও যাঁরা এই সংসদে এসে বসতে পারেন, যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন, বাইরে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছেন তাঁদের বিচার হয় না। অথচ, সংসদ সদস্য হিসাবে ঘোষিত হওয়ায় তাঁদের কোন বিচার হয় না। এটা কোথা থেকে নিয়ন্ত্রিত হয়? যে সরিষা দিয়ে আপনি ভূত তাড়াবেন, সেই সরিষার মধ্যেই যদি ভূত থেকে যায়, তাহলে আপনি কিভাবে সেই ভূতের হাত থেকে রক্ষা পাবেন— সেটাই আজকে আমাদের প্রশ্ন।

আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা থেকে বোঝা যায় যে অবস্থা কত গুরুতর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্ত্রের রাজনীতির বিরুদ্ধে আমরা। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, জাতীয় জীবনেও অস্ত্রের রাজনীতির বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করে আসছি। শামসুল হক সাহেব যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, যখন তাঁর উপর নির্যাতন চলল, যার নমুনা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই এখানে দেখালেন। তখনকার আমার বক্তৃতা, বিবৃতি দেখবেন। ঐ নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমি সোচ্চার হয়েছিলাম। কিন্তু তখন শামসুল হক সাহেবকে সরকারের পক্ষ থেকে প্রটেকশন দেওয়া হয় নাই। তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল সেদিন উপাচার্য পদ থেকে পদত্যাগ করতে।

কেন সেটা করা হয়েছিল? কেন উপাচার্য সেদিন পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন? কেন রাষ্ট্রপতি সেদিন প্রটেকশন দেন নাই? এর পিছনে কী ষড়যন্ত্র ছিল? সেটাও আমাদের মনে আজকে প্রশ্ন জাগে। অস্ত্র দিয়ে যা কিছু করা হয়, তাকে রাজনীতি বলা যায় না। একথা শিক্ষামন্ত্রী বলে গেলেন। একথায় কি সত্যিই তাঁরা বিশ্বাস করেন? এটা আমার প্রশ্ন এবং তার প্রতিফলন কি আমরা জাতীয় জীবনে দেখতে পাচ্ছি? আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি না।

দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই নয়,

বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে খেলা চলছে অস্ত্র নিয়ে তার পিছনে কারণ কী?

রাজনীতি যারা করে, জনগণের কথা বলে জনগণের মধ্য দিয়ে জনগণের 'ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় যাওয়াটাই হচ্ছে রীতি। কিন্তু অস্ত্রকে হাতে নিয়ে অস্ত্রকে সম্বল করে ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে আগে ক্ষমতায় আসা, আর ক্ষমতায় বসে থেকে রাজনীতিতে অবতরণ করা, আর রাজনীতিতে অবতরণ করে রাজনৈতিক দল গঠন করা, যুবসমাজের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাদেরকে ব্যবহার করা এবং এই দল গঠনের জন্য তাদেরকে ব্যবহার করে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার যে খেলা শুরু হয়েছে, শিক্ষা অঙ্গনে অস্ত্র প্রবেশের সেটাই আসল পথ এবং তারই প্রতিফলন ঘটছে প্রতিটি শিক্ষা অঙ্গনে, যেটা আমরা সব সময় দেখতে পাচ্ছি।

গত তিন বছর ধরে সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ বন্ধ রয়েছে এবং কোনো বেসরকারি নিয়োগও হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়তে যায়, সেখানে একটা সময়সীমা আছে শিক্ষাবর্ষ শেষ হবার। সেই সময়সীমা শেষ হবার পরেও শিক্ষাবর্ষ শেষ হয় না। আমি যদি বলি, এটাও একটা ষড়ঙন্ত্র, কারণ, এই যে চাকুরিতে নিয়োগ বন্ধ, বেকার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, শিক্ষাঙ্গনগুলিতে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎকে নষ্ট করবারই একটা ষড়যন্ত্র চলছে।

আজকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে অবস্থার গুরুত্ব নিজেই ব্যক্ত করেন। তাঁর কাছে প্রশ্ন করতে হয় যে, এই অবস্থাই যদি চলে তার প্রতিকার তিনি করতে পারছেন না কেন, তার পিছনে কী বাধা রয়েছে?

আজকে প্রায় পাঁচ-ছয় বছরেও শিক্ষাবর্ষ শেষ হয় না। আমাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শেষ করে বেরিয়ে আসতে পারে না। জাতীয় রাজনীতিতে যেখানে স্বৈরশাসন চলে, সেখানে আমরা মুক্ত শিক্ষাঙ্গন কিভাবে আশা করতে পারি? যেখানে সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য যুবসমাজকে ব্যবহার করা হয়, অস্ত্র ব্যবহার করা হয়, এমনকি সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা যেখানে অস্ত্র সরবরাহ করে, যেখানে সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা অনেক সময় অনেক রাজনৈতিক দলের কর্মীকে পর্যন্ত তুলে নিয়ে তাদের উপর নির্যাতন করে সরকারি দলে যোগ দিতে বাধ্য করে।

এখানে অনেকেই আছেন যাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য ছিলেন। কিন্তু গোয়েন্দা দলের চাপে পড়ে দল বদলাতে বাধ্য হয়েছেন এবং সরকারি দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন। মিথ্যা মামলার চোটে তাঁদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে। এই ঘটনা নজিরবিহীন নয়। যেখানে সর্বোচ্চ আদালতে এই পর্যন্ত অস্ত্রধারীকে যদিও প্রথমে পুলিশে পাঠানো হয়েছিল সেই আদালতের পবিত্র অঙ্গন কলুষিত করা হয়েছে। মসজিদে ছাত্রহত্যা করা হল, সেই হত্যার বিচার কী হয়েছে? দিনে-দুপুরে যে হত্যা করল, যাকে আপনাদের এই 'স্বনিয়োজিত রাষ্ট্রপতি যিনি নিজে ভাই বলে পরিচয় দিয়েছেন, যিনি...

আমি কিন্তু 'স্বঘোষিত' বলি নাই। 'স্বঘোষিত' expunge হওয়ার কথা ছিল।

Self declared President বলি নাই। যখন তাঁকে তিনি নিজে ভাই বলে পরিচয় করিয়ে দিলেন, আর সে হত্যা করল, তখন তার কী বিচার, কী শাস্তি হল? তার মামলা যদি না-ই হল, সে অঙ্গনে কারা বোমা ফাটিয়েছিল, যার জন্য আমাদের ধীরেন বাবু তাঁর দুটি পা হারিয়েছেন, তাদের বোমার আঘাতে? আজকে এই অস্ত্র সর্বক্ষেত্রে কারা নিয়ে যাচ্ছে। এটাও আমাদের প্রশ্ন।

জনাব স্পীকার সাহেব, অস্ত্রের মধ্য দিয়ে অস্ত্রকে সম্বল করে ক্ষমতায় যাওয়ার রাজনীতিতে আমরা বিশ্বাস করি না। জনগণই ক্ষমতার উৎস। জনগণের কতগুলি মেন্ডেট নিয়ে আমরা ক্ষমতায় যাওয়ার কথা চিন্তা করি। কিন্তু যে-প্রক্রিয়া এদেশে চালু হয়েছে, শিক্ষামন্ত্রী বললেন যে, অস্ত্র দিয়ে যা কিছু করা হয়, তাকে রাজনীতি বলা যায় না। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হল, একটি নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করা হল। সেই খুনীদের কোনো বিচার করা হয় নাই। একজন রাষ্টপতিকে যারা হত্যা করতে পারে, তাদের বিচার না হয়ে বিভিন্ন দূতাবাসে তাদের চাকুরি দিয়ে পুরস্কৃত করা হল। শুধু তাই নয়, সেই খুনী, যে একজন নারী হত্যাকারী, শিশু হত্যাকারী, যে রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করল এবং সদম্ভে দেশে-বিদেশে প্রচার করে বেড়াল, সেই অস্ত্রধারী, যারা সামরিক বাহিনীর রীতিনীতিকে পর্যন্ত নষ্ট করল, শৃঙ্খলাভঙ্গ করল, এমনকি পঁচাশি সালে যে অস্ত্রসমেত ধরা পড়ল, যে-মামলা এখনও খুঁজলে পাওয়া যাবে, কিন্তু সেই ফাইল চাপা দিয়ে সেই খুনীকে রাষ্ট্রপতির সর্বোচ্চ আসনের জন্য যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার সুযোগ করে দিলেন, তাঁরা শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করবেন, দেশকে অস্ত্রমুক্ত করবেন, সেটা কীভাবে একটা জাতি দেখবে, বা জাতির কাছে কীভাবে প্রতীয়মান হয়? এটা তো পরিহাস করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমরা চাই, বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সুন্দর পরিবেশ থাকুক। আমার সৌভাগ্য হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় দেখবার। আমি সুইডেনের মূল শহরের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন সেখানকার পরিবেশ দেখেছি। জার্মানির কালসুয়েটে আমি বিশ্ববিদ্যালয় এরিয়ার মধ্যে থেকেছি। সেখানকার পরিবেশ আমি দেখেছি। আমি অক্সফোর্ডে গিয়েছি। আমি সেখানকার পরিবেশ দেখেছি। আমি ইংল্যান্ডের অন্যান্য জায়গায় গিয়েছি, দেখেছি। ইউরোপের অনেক এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকাগুলির পরিবেশ আমি দেখেছি। সেখানে একটি আফসোসই সব সময় হয়েছে যে, এই সুন্দর পরিবেশ কবে আমাদের দেশে আসবে যেদিন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আহরণের ধ্যানে থাকবে, শিক্ষা নেওয়ার একটা সুন্দর পরিবেশ থাকবে। আর আমাদের দেশে, দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, সন্ধ্যার পরে কোনো লোক বিশ্ববিদ্যালয় এরিয়াতে যায় না। কেন? সেখানে ছিনতাই হয়, সেখানে ডাকাতি হয়, সেখানে নানাভাবে দুষ্কর্ম ঘটে।

আমার প্রশ্ন, এই দেশে সরকার আছে, আইন আছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা আছে, এমনকি সামরিক শাসনও চলেছে এই দেশে, যে সামরিক শাসনের যাঁতাকলে আমি নিজেই ৪ বার তাদের হাতে বন্দি হয়েছি, আমার বোন সপরিবার বন্দি হয়েছেন। এপাশে ওপাশে অনেকেই আছেন যাঁরা এই ৮২-র সামরিক শাসনে বন্দি হয়েছেন, বিভিন্ন মামলার আসামী হয়েছেন, জেল খেটেছেন, নির্যাতন সহ্য করেছেন। অনেক

রাজনৈতিক নেতাকে চক্ষু বেঁধে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে গিয়ে তাঁদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছে।

যাঁরা এতদূর করতে পারেন, তাঁরা কী করে একটি এলাকার, এই বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার— যেখানে ছিনতাই হয়, ডাকাতি হয়— সেই জায়গাটা তাঁদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন— এটা আমার প্রশ্ন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহেব এখানে থাকলে খুব ভাল হত। তিনি যদিও চক্ষুবিশারদ তবু তিনি আমাদের আইনের শিক্ষা দিয়ে চলে গেলেন। উনি থাকলে ওনার এই কথাগুলো শোনার প্রয়োজন ছিল। তাই আমি বলতে চাই, আমাদের দেশে আদর্শ নেই, শিক্ষামন্ত্রী বলে গেছেন। আদর্শ শিক্ষা আমরা কোথা থেকে পাব? কার কাছ থেকে পাব? আজকে এই দেশের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়, যে-দেশের ইতিহাসকে, স্বাধীনতার সংগ্রামকে, স্বাধীনতার মূল্যবোধকে নষ্ট করা হয়। বিকৃত ইতিহাস আমার ছোট্ট শিশুদের কাছে প্রকাশ করা হয়। একটি শিশু স্কুলে যাবে, বইতে একরকম ইতিহাস পড়বে, সে যখন বাড়িতে আসবে ইতিহাসের পৃষ্ঠা অন্যরকম দেখবে।

সেই বিকৃত ইতিহাস শিখে সে বিকৃতই হবে, সুষ্ঠু চরিত্রের হতে পারে না। আদর্শ শিক্ষা আমরা কোথা থেকে পাব? আদর্শ শিক্ষা কোথা থেকে আসবে? রাষ্ট্রের কর্ণধার— তাঁর চরিত্র থেকে শুরু করে নিম্নতম লোকটির পর্যন্ত যদি চারিত্রিক গুণাবলী না থাকে, বৈশিষ্ট্য না থাকে, আদর্শভিত্তিক না হয়— মানুষ কোন আদর্শ শিখবে, আজ যে আদর্শ শিখে আমার ভবিষ্যৎ বংশধর আদর্শ শিক্ষা নিতে পারে সেটা যদি আমরা সম্পূর্ণ বন্ধই করে দিই, সে ইতিহাস যদি আমরা মুছে ফেলতে চাই?

জনাব ডেপুটি স্পীকার ঃ মাননীয়া বিরোধীদলীয় নেত্রী, আমি আবার আপনাকে ১৪৮ ধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সময়টি প্রায় meet হয়ে গেছে। এখন একটু সংক্ষেপ করলে ভাল হয়।

বেগম শেখ হাসিনা ঃ আপনাকে ধন্যবাদ। এর আগে তো অনেকে অনেক লম্বা বক্তৃতা দিয়েছেন। মওদুদ সাহেব ২০ মিনিটের উপর বক্তৃতা দিয়েছেন। আমি আমার সাবজেক্টের বাইরে যাইনি।

এখানে কথা হয়েছে অস্ত্রের রাজনীতি নিয়ে। মওদুদ সাহেবের এতে আপত্তি থাকা উচিত নয় যে, অস্ত্রের রাজনীতি শুধু শিক্ষাঙ্গনে সীমাবদ্ধ থাকবে আর বাইরে আলোচনা করা যাবে না, এটা হতে পারে না। আমি আগেই বলেছি যে, এই অস্ত্রের রাজনীতির শিকার আপনি নিজেও হয়েছিলেন। 'সরিষার ভিতর ভূত' থাকলে আপনি ভূত তাড়াতে পারবেন না। আজকে জাতীয় রাজনীতিতে যদি এই অস্ত্রের খেলা বন্ধ না হয়, অস্ত্র দিয়ে যদি ক্ষমতা দখলের খেলা বন্ধ না হয়, তা হলে আপনি আপনার ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অস্ত্রের খেলা বন্ধ করবেন কীভাবে আমাকে বলেন?

আপনি শহিদ মিনারের কথা বলেছেন। গত বছর এই শহিদ মিনারে আমার ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়াকে ছুরি মারা হয়েছিল। সে একজন মুক্তিযোদ্ধা, বীর প্রতীক। কী অপরাধ তাঁর ছিল? ঐ শহিদ মিনারে গুলি চালিয়ে আমার নগর আওয়ামী লীগের কর্মী সোহরাবকে হত্যা করা হয়েছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাসুনিয়াকে হত্যা করা হয়, আসলামকে হত্যা করা হয়।

১৯৭৮-৭৯ সালে মাহফুজ বাবুকে সাদা জীপে করে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়, যার লাশ তার মা কোনোদিন পায়নি, পাবেও না।

একজন ঐদিক থেকে নির্বাচনের দিনের কথা বললেন। আজকে তাঁর নাম বলে আমি তাঁকে বিব্রত করতে চাই না। কিন্তু সেই উপ-নির্বাচনে উনাকে কী অবস্থায় আমি দেখেছিলাম, সেটা নিশ্চয়ই তার মনে আছে, আমারও মনে আছে। সেই নির্বাচনে অস্ত্র পাঠানো হয়েছিল, সেটা 'লীগ্যাল হোক, আর ইল্লীগ্যাল হোক। এমনকি, আমি বলব সামরিক বাহিনীকে পর্যন্ত ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। নির্বাচনে ভোট দখলের জন্য সামরিক বাহিনী ব্যবহার করা হয়েছে। জনগণের পেটের ভাত কেড়ে নেওয়া হয়েছে, বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

আজকে সামাজিক ক্ষেত্রে আমরা কোন অবস্থায় অবস্থান করছি? আজকে ইজ্জতমান রক্ষা করে যে-কোনো একজন চাকুরিজীবীর পক্ষে তার জীবন চালান সম্ভব নয়। শিক্ষাবর্ষ পার হয়ে যায়, গরিব মা-বাবা হালের গরু বিক্রি করে, জমি বন্ধক রেখে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার জন্য পাঠায় যাতে সে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাবাকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু সেখানে যদি শিক্ষাবর্ষ বাড়তেই থাকে, সরকারি চাকুরিতে নিয়োগ যদি বন্ধ করা হয়, তা হলে আমি বলব, এটাও একটা ষড়যন্ত্র। শিক্ষাবর্ষ যাতে শেষ না হয়, চাকুরির সুযোগ যাতে না পায়, চাকুরির বয়স যাতে পার হয়ে যায়, সেইজন্য সুপরিকল্পিতভাবে জাতির বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে। শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষার মান উন্নত করবার জন্য, এমনকি ছোট্ট শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোনো পরিকল্পনা বা বাস্তব ব্যবস্থা সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হচ্ছে না।

আমি আরও বলব, ১৯৭২ সালে শিক্ষাখাতে ব্যয় যেখানে শতকরা ২১·১৪ ভাগ ছিল সেখানে আজকে কমিয়ে ১৪·৭১ ভাগে নামিয়ে আনা হয়েছে। আজকে যেখানে প্রায় দেড় কোটি শিশু স্কুলে যাওয়ার উপযুক্ত সেখানে তাদের মধ্যে ৮৫ লক্ষের বেশি স্কুলে যেতে পারে না। ছোট্ট শিশু, ঐ খবরের কাগজেই আছে যে, সেই ঝরা পাতার মতো তারা শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। এটা আপনাদের পত্রিকা রোববার ২৪শে অগাষ্ট ১৯৮৬ সালের। মঞ্জু সাহেব অবশ্য উপস্থিত নাই এখন। এদেশে যে-কয়টা সংবাদপত্র আছে তার প্রায় সবগুলির সম্পাদকই— প্রায় ৬টার সম্পাদক আপনাদের সরকারী দলের মন্ত্রী। আর আপনাদের পক্ষে আছে যেগুলি আগেই আপনারা খরিদ করে ফেলেছেন। আর রেডিও-টেলিভিশন এগুলো তো আমাদের মিডিয়া। কিন্তু সেগুলোও তো জেনারেল এরশাদ সাহেব আর আপনাদের মন্ত্রীদের ডেইলি ডায়েরি বা রোজনামচা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমি দেখতে পাই যে, ঐ আমার শিশুরা ঝরা পাতার মতো রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় আর ঝরা পাতা কুড়িয়ে আজকে তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। অথচ বঙ্গবন্ধুর সরকার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। আজকে তাই আমি বলতে চাই, এই শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করার জন্য আজকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। আর এই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সর্বাগ্রে আসুন, এখানে যাঁরা আছেন, সকলকেই আমি আহ্বান করব, জনাব স্পীকার সাহেব, আপনার মাধ্যমে যে, আসুন, জাতীয় রাজনীতি থেকে আমরা অস্ত্রের খেলা বন্ধ করি।

অস্ত্রের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করা, ক্ষমতায় বসে রাজনীতি করা, সেটা আমরা বন্ধ করি। পঞ্চম সংশোধনী এসেছে এই অস্ত্রের মধ্য দিয়ে, ক্ষমতা দখলের মধ্য দিয়ে।

আজ '৭২-এর অস্ত্রের খোঁজ করা হয়। আমি যদি প্রশ্ন করি যে, ১৯৭৫ সালে যে-অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল সেই অস্ত্র কোথায়? আমি যদি প্রশ্ন করি, ৭ই নভেম্বর সিপাহী জনতার বিপ্লবের নামে যে-অস্ত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই অস্ত্র কোথায়? সেই অস্ত্রই আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে, কী জবাব আপনারা দেবেন?

১৯৭২ সালে দেশে জনগণের নির্বাচিত সরকার ছিল। সেই সরকারের বিরুদ্ধে, একটি নির্বাচিত সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি গণবাহিনী গড়ে সশস্ত্র বিপ্লবের যাঁরা ডাক দিয়েছিলেন আর অস্ত্রের মধ্য দিয়ে যাঁরা ক্ষমতা দখল করলেন, আজকে তাঁদের সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি করতে আসা, এটা হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

রোকেয়া হলের সামনে যে হত্যাকাণ্ডের কথা বলা হল, আমি যদি বলি যে, ৭৫-এর ১৫ই অগাস্টের ঘটনা ঘটানোর জন্য সেগুলি ছিল প্রাথমিক পদক্ষেপ, বিভিন্ন প্রক্রিয়া। এমনকি ১৬ই ডিসেম্বর আমার ভাই কামালকেও তো গুলি করা হয়েছিল।

এই সমস্ত অস্ত্রের খেলা চলেছে, স্বাধীনতার পর একটি নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করার জন্য, সামরিক শাসকদেরকে ক্ষমতায় আনার জন্য, বিভিন্নভাবে এই সমস্ত ষড়যন্ত্র চলেছে। সেই ষড়যন্ত্রের শিকার বাংলার মানুষ, সেই ষড়যন্ত্রের শিকার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু, যাঁকে সেদিন হত্যা করা হয়েছে। সেই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে বাংলার মানুষ আজও মুক্তি পায় নাই। সেই ষড়যন্ত্রের হাত থেকে আমাদের শিক্ষাঙ্গন এখনও মুক্তি পাচ্ছে না।

তাই আমার প্রস্তাব, আজকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, এখনই সিদ্ধান্ত নিন, জাতীয় জীবন থেকে অস্ত্রের খেলা বন্ধ করুন; অস্ত্রের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখলের খেলা বন্ধ করুন; এই সেনাবাহিনীকে ব্যারাকেই থাকতে দিন; ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসাবে তাদেরকে ব্যবহার করবেন না। আসুন, এই দেশের গোয়েন্দা সংস্থাকে তাদের কাজ করতে দিন। তাদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যবহার করবেন না। তাহলেই শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত হবে।

আপনারা আজকে এই সিদ্ধান্ত নিন যে, কোনো অস্ত্রের ঝনঝনানি থাকবে না; এই সিদ্ধান্ত নিন যে, একটি পবিত্র শান্ত পরিবেশ থাকবে; এই সিদ্ধান্ত নিন যে, ছেলেরা শান্ত মন নিয়ে লেখাপড়া শিখবে, তা হলে মা-বাবারাও শিক্ষাঙ্গনে ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া শেখাতে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। সেই পরিবেশ এই স্বাধীন দেশে আজকে সবচেয়ে জরুরি এবং আমার সেটাই প্রস্তাব থাকবে। আসুন, জাতীয় রাজনীতি থেকে অস্ত্রের খেলা বন্ধ করি। শিক্ষাঙ্গন আজকে অস্ত্রমুক্ত হবে। আর যদি শিক্ষাঙ্গনকে অস্ত্রমুক্ত করতে না পারেন, তা হলে সেটা সরকারেরই ব্যর্থতা এবং এই সরকারই অস্ত্র সাপ্লাই দেয়। কারণ, অস্ত্র রাখার অধিকার কেবল সরকারেরই আছে বলে আমি মনে করব।

আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পীকার।

---

১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ সালে জাতীয় সংসদ সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের ভাষণ

প্রত্যাঘাত করুন—এরশাদকে তাড়ান

উপস্থিত সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা

জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে আমরা এই সমাবেশ ডেকেছি। ষড়যন্ত্র চলছে দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে, ষড়যন্ত্র চলছে বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে। এ ষড়যন্ত্র যারা করছে তাদের চেহারাগুলো আপনাদের চেনা। স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার একটি নির্বাচন দিয়েছেন ৩ মার্চ। কিন্তু এরশাদ সরকারের চরিত্র আপনাদের জানা আছে। তিনি ক্ষমতায় এসেছেন ষড়যন্ত্র করে। ক্ষমতায় এসে একের পর এক নির্বাচনী খেলা খেলে যাচ্ছেন। প্রথমে তিনি রেফারেন্ডাম দিয়েছিলেন। সেই রেফারেন্ডামে কী অবস্থা হয়েছিল তা আপনাদের অজানা নয়। তিনি ঘোষণা দিলেন— তিনি রাষ্ট্রপতি। বারবার সামরিক বাহিনী ও মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে জনগণের রায় কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। আমরা চেয়েছিলাম এদেশে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া নিয়ে আসতে। বাংলার জনগণ আমাদের ভোট দিয়েছিল। স্বৈরশাসনের হাত থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। ২২৬টি আসনে আমরা জয়লাভ করেছিলাম। এরশাদ মিডিয়া ক্যু করে আমাদের পরাজিত ঘোষণা করেছিলেন।

আমরা পার্লামেন্টে গেলাম। আমরা গণমানুষের কথা বলার চেষ্টা করেছি। এরশাদ ষড়যন্ত্র করে পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়েছেন। দেশ ও জাতি যখন এক দফা এক দাবি নিয়ে সোচ্চার তখন তিনি নির্বাচন দিলেন। বাংলার জনগণ এই বিশ্ব বেহায়া স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের কাছে কোনো নির্বাচন চায়নি। আর তাই এ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের রায়ের কোনো প্রতিফলন ঘটবে না। যে-নির্বাচনের মধ্য দিয়ে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটবে না, সেই নির্বাচনে জনগণ অংশগ্রহণ করতে পারে না। বাংলার জনগণ এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না। নির্বাচনের অর্থ আমরা জানি, প্রতিটি মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবে। নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তার ভোটের রায় বেরিয়ে আসবে। জনগণ তাদের পছন্দমত প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। কিন্তু এরশাদ সাহেব যে-নির্বাচন করতে যাচ্ছেন তার অর্থ আমরা জানি। সেই নির্বাচনে জনগণের প্রয়োজন পড়বে না। ভোটারবিহীন ভোটের মধ্য দিয়ে এরশাদ তাঁর পছন্দমত লোকদের নির্বাচন ঘোষণা করবেন। এই নির্বাচন দেশের জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। আর যাই হোক একে নির্বাচন বলা যায় না। বাংলার মানুষ আন্দোলন করছে এক দফা দাবি নিয়ে। সেই দাবি হচ্ছে জেনারেল এরশাদ ও তাঁর সরকারের পদত্যাগ। আর তাই জনগণের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালানো হচ্ছে। আমরা ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধ কর্মসূচীর ডাক দিয়েছিলাম। সেই থেকে আজ অবধি বাংলার জনগণ এই স্বৈরসরকারকে অবরোধের মধ্যে রেখেছে। আজ সারা দেশে যে-কোনো মুহূর্তে সরকারের চাকাকে আমরা অচল করে দেবার ক্ষমতা রাখি। আমাদের সেই শক্তি রয়েছে।

সংগ্রামী ভাইয়েরা,

ক্ষমতায় থেকে জনতার উপর নির্যাতন চালিয়ে আন্দোলন স্তব্ধ করার চেষ্টা চলছে। অনেকেই নিরাশার বাণী শোনাতে চেষ্টা করে—গণআন্দোলনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। জনগণের মধ্যে এই সরকারের কোনো ভিত্তি নেই। এদের অস্তিত্ব শুধু ক্যান্টনমেন্টে। জনগণের মধ্যে কোনো গ্রহণযোগ্যতা না থাকার কারণে ক্যান্টনমেন্টে বসে অস্ত্রের জোরে কয়েকজন দুর্নীতিবাজ সামরিক কর্মকর্তা মিলে বন্দুকের নলে চেপে শাসন ও শোষণ করছে।

আপনাদের মনে আছে সত্তর-এর দশকে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা করে সেইসব দেশে তাঁবেদার সরকার প্রতিষ্ঠা করা হত। যেমন হত্যা করা হয়েছিল চিলির আলেন্দেকে, হত্যা করা হয়েছিল বাংলাদেশের জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে। এখন ষড়যন্ত্রের রূপ পাল্টিয়েছে। এখন ষড়যন্ত্র চালানো হচ্ছে মিডিয়া ও মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে। তারা যা কিছু করছে মিডিয়াকে কেন্দ্র করে, সংবাদপত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে। যখনই সংবাদপত্রগুলো সত্যিকার চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছে তখন তারা এক এক করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করছে। অপরদিকে নিয়ন্ত্রিত সংবাদ পরিবেশনে বাধ্য করছে। একটি কথা এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, বঙ্গবন্ধু সংবাদপত্রের সংখ্যা কমিয়ে এনেছিলেন এ কথা ঠিক, কিন্তু তার ফলে কোনো সাংবাদিক চাকরিচ্যুত হননি। বরং সরকারি চাকরিজীবীর মর্যাদা পেয়েছিলেন। আজকে একদিকে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে, অন্যদিকে শত শত সাংবাদিক-কর্মচারী বেকার। কিভাবে তারা জীবন-যাপন করছেন একবার কি কেউ তা ভেবে দেখেছেন? যারা অস্ত্র হাতে ক্ষমতায় আসে তারা জনগণের দিকে তাকায় না। মিডিয়াই তাদের আশ্রয়। মিডিয়ার মধ্য দিয়েই তারা রাজনীতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে। অপরদিকে স্বৈরশাসকদের গদি পাকাপোক্ত করতে চায়। আজ বাংলাদেশ রেডিও-টেলিভিশন এরশাদের ডেইলি ডায়রি। এক সময় একজন ব্যক্তির নির্দেশে অনেক সংবাদ বন্ধ করে দেওয়া হতো। কয়েকদিন আগে সেই আনোয়ার জাহিদের পাঠানো বিবৃতি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আজকে যারা সরকারের তাঁবেদারি করছেন তাঁদের বলতে চাই, আজকে আপনাদেরকে স্বৈরসরকার ব্যবহার করছে—ব্যবহারের পর ছুঁড়ে ফেলে দেবে, খুঁজে পাওয়া যাবে না। দশ নভেম্বর থেকে হরতাল ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছি। আপনারা অনেক কষ্ট স্বীকার করে এই সকল কর্মসূচী সফল করেছেন। আমার শ্রমিক-কর্মচারী ভাইয়েরা অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। আমার রিকশাওয়ালা ভাইয়েরা পেটে পাথর বেঁধে এ কর্মসূচী সফল করেছেন। বিশ্ব বেহায়ার খপ্পর থেকে দেশ ও জাতি মুক্তি চায়।

কিন্তু এত সহজে তারা ক্ষমতা ছেড়ে যাবে না। কারণ এই ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে তারা চোরাচালান, ড্রাগস চোরাচালান, অস্ত্র চোরাচালান, স্বর্ণ চোরাচালান, কমিশন খাওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে দেশে-বিদেশে তারা অর্থের পাহাড় গড়ে তুলেছে। তারা নিজেদের আখের গোছাতে ব্যস্ত। তাই ক্ষমতা ছেড়ে তারা যেতে চায় না। কিন্তু একটা

কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই, প্রয়োজনে আরো কষ্ট স্বীকার করে আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে যেতে হবে। গণমানুষের আন্দোলনের মুখে তারা টিকে থাকতে পারবে না। স্বৈরাচারী এরশাদকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করবই করব।

সংগ্রামী বন্ধুরা আমার,

চট্টগ্রামে এরশাদ নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও ইয়াহিয়ার গণহত্যা একইভাবে চালানো হয়েছে। বাংলাদেশের হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ ও পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খানের চরিত্র একই। নির্যাতনের মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা দাবিয়ে রাখতে চায়। শুধু তাই নয়, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে আমরা কোনোদিনই দলীয়ভাবে অংশগ্রহণ করি না। সেখানে পর্যন্ত সরকার সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে। সুপরিকল্পিতভাবে গ্রামেগঞ্জে সংঘাত ছড়িয়ে দিয়েছে। জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত সৃষ্টি করে আন্দোলনকে তারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে চায়, ঐক্যে ফাটল ধরাতে চায়। এদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে হবে।

৩ মার্চ সেনাবাহিনী ব্যবহার করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এদের মুখোশ আর একবার উন্মোচিত হলো। সেনা ছাউনিতে থেকে যতই জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি করুন মূলত এরশাদ মার্শালম্যান, সামকিরতন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। গণতন্ত্র নয় মার্শাল ডেমোক্রেসি চালিয়ে যাচ্ছে। জনগণের নেতা নয়, মার্শালম্যান হিসেবেই তিনি পরিচিত। নির্বাচনের নামে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তিনি জনগণ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করতে চান। '৭৫-এর পর থেকে যাঁরা ক্ষমতায় এসেছেন তাঁরা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জাতীয় সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেছেন। একটি বিষয় আপনারা লক্ষ করে থাকবেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যাকারী আত্মস্বীকৃত খুনী রশীদ দাবি করল নির্বাচনে সেনাবাহিনী পাঠাতে হবে, আর এরশাদ সেই মোতাবেক সিদ্ধান্ত নিলেন। এই রশীদ, ফারুক, ডালিম, হুদা চক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে, সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। '৭৫-এর পরবর্তী সময়ে সশস্ত্র বাহিনীর শত শত অফিসার জোয়ান উচ্চাভিলাসি সেনাপতিদের গদিরক্ষার চক্রান্তের শিকার হয়েছে। সেনাবাহিনীতে আজ স্বামীহারা স্ত্রী, পিতৃহারা সন্তান, পুত্রহারা পিতা-মাতার কান্না শোনা যায়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন সেনাবাহিনীতে কোনো বিশৃঙ্খলা ছিল না। ক্ষমতাকে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হয়নি। সেনাবাহিনীর কাউকে নিহত হতে হয়নি।

জনগণের রায় কেড়ে নেওয়ার জন্য আজ সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হচ্ছে। যশোহর থেকে সেনাবাহিনী পাঠানো হয়েছিল গোপালগঞ্জে। যশোহরের জিওসি মেজর জেনারেল হারুন উপনির্বাচনের দুইটি সীট হাইজ্যাক করে জেনারেল এরশাদকে উপহার দিয়েছিলেন। আজ তিনি কোথায়? এত খেদমতের পরেও প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার পর সেনাবাহিনী থেকে তাঁকে বিদায় করে দেয়া হয়েছে। আজকে যাঁরা সেনা ছাউনিতে বসে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করছেন, তাঁবেদারি করছেন, তাঁরা সেনাবাহিনীকে জনগণের

মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছেন। এঁরা একটি ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই ষড়যন্ত্র আর কিছুই নয়—এরশাদের গদিরক্ষার জন্য দেশবাসী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করা, সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত করে তোলা ও সশস্ত্র বাহিনীর সামরিক মূল্য নষ্ট করার জন্যই এই চক্রান্ত। সেনাবাহিনীর প্রতি আমাদের আহবান থাকবে—জনগণের ট্যাক্সের পয়সায় আপনাদের বেতন দেওয়া হয় বহিঃশত্রুর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য—জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হতে না। কোনো স্বৈরশাসকের গদিরক্ষার জন্য আপনারা ব্যবহৃত হবেন না। আমরা চাই সেনাবাহিনী শক্তিশালী হোক, সেনাবাহিনী ব্যারাকে থাকুক, দেশরক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকুক। দুশ্চরিত্র, লম্পট, দুর্নীতিবাজ বেহায়া এরশাদ সরকার আপনাদের ব্যবহার করুক বাংলার মানুষ তা চায় না।

সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,

একই সাথে বেসামরিক, সরকারি, আধা সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি আমার আহ্বান, ৩ মার্চের প্রহসনের নির্বাচনে আপনারা সহযোগিতা করবেন না। নির্বাচন নয়, এরশাদের অপসারণের আন্দোলনে আপনাদের সহযোগিতা চাই। সমগ্র জাতির আজ এক আওয়াজ—বিশ্ব বেহায়া এরশাদ তুমি গদি ছাড়, বাংলার মানুষ হাঁফ ছেড়ে বাঁচুক।

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে পাঁচ শতাধিক লোক নিহত হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে মৃতের সংখ্যা হাজারের উপর যাবে। পনের হাজারের উপর লোক আহত হয়েছে। ৩ মার্চ আবার গণহত্যা চালানো হবে। রক্ত ঝরানো হবে আমার বাংলার মানুষের। এইভাবে নির্বাচনের নামে মানুষহত্যার চক্রান্ত করে যাচ্ছে এরশাদ সরকার। কিন্তু এই চক্রান্ত সফল করতে দেওয়া হবে না। জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত এই নির্বাচন প্রতিহত করা হবে।

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি হরতাল চলাকালীন বিরোধী দলের কর্মীরা যখন পিকেটিং করছিল তখন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় গুণ্ডাবাহিনী বেপরোয়া হামলা চালায়। ফলে সরকারি কর্মচারি নূর মোহাম্মদ পাটোয়ারী মারা যান। এই মৃত্যুর জন্য এরশাদ দায়ী। কেননা হরতালের দিনে সরকারি কর্মচারীরা অফিসে না গেলে চাকরি চলে যায়—বেতন কাটা যায়। তাদের উপর হুমকি ও চাপ প্রয়োগ করা হয়। আমরা সরকীর কর্মচীর, সেক্রেটারিয়েটের কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানাই—আমরা আন্দোলন করছি আপনাদের জন্য, বাংলার মানুষের জন্য। আপনারা অফিসে যাওয়া থেকে বিরত থাকুন। অসহযোগিতা করে এই সরকারকে বিকল করে দিন। এর ফলে আপনাদের চাকরির উপর যদি কোনো আঘাত আসে তাহলে ভবিষ্যতের গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষতিপূরণসহ আপনাদের চাকরিতে বহাল করবে।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আমরা চাই দেশে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া চালু থাকুক। জনগণের প্রতিনিধিরাই রাষ্ট্র পরিচালনা করুক। কিন্তু সেনা ছাউনিতে বসে বন্দুকের নল চেপে পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করে জনগণের ভোট কেড়ে নেবে—আমরা তা মেনে নেব না। আমরা তা হতে দেব না। পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনীকে বলতে চাই—আপনারা জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন না। জনগণের বিরুদ্ধে বন্দুক তুলে ধরবেন না। বাংলার জনগণ তাহলে আপনাদের রেহাই দেবে না। সঙ্গে সঙ্গে বলতে চাই, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তাদের পরিবার পরিজনকে পাকিস্তানে রেখে এসেছিল। কিন্তু আজকের পুলিশ, বিডিআর, সেনাবাহিনীর আত্মীয়স্বজনরা বাংলার গ্রামেগঞ্জে বাস করে। এদের আত্মীয়স্বজনের ঠিকানা খুঁজে বের করুন, সতর্ক করে দিন। হুঁশিয়ার করে দিন, আর যদি এদেশের মানুষের বুকের উপর গুলি চালানো হয়, আর যদি এদেশের মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় আপনাদের প্রতি আমার আহ্বান, প্রতিশোধ নেবেন। অনেক রক্ত দিয়েছি, আর রক্ত দিতে চাই না। লাশের পরিবর্তে লাশ চাই। বাংলার মানুষ বারবার মার খাবে, বারবার বুকের রক্ত দেবে তা হতে পারে না। আবেদন থাকল, যার যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত হোন, স্বৈরাচারের দালালদের উপযুক্ত সাজা দিয়ে দেবেন। আমি মনে করি, সকল সংকটের হোতা এরশাদ সরকার। এরশাদ পদত্যাগ করো, ক্ষমতা ছাড়। জনগণের অধিকার আমরা প্রতিষ্ঠিত করবই করব। বাংলার মানুষের জয় হবেই হবে। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

---

১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ তারিখে জনসমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ

উপরাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিন

আমরা বর্তমান সরকারের অপসারণ, সংসদ বাতিল, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন চাই। সংবিধানের ৫৫ অনুচ্ছেদ মতে, সকলের গ্রহণযোগ্য একজন উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করুন এবং ৫১ অনুচ্ছেদ মতে উপরাষ্ট্রপতির কাছে রাষ্ট্রপতি এরশাদ ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে পদত্যাগ করুন।

১০ নভেম্বর হরতাল সফল করে সর্বস্তরের জনগণ বর্তমান সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করুন। আমরা আন্দোলন করে যাচ্ছি একটা লক্ষ্য নিয়ে, তা হল আমরা এদেশের মানুষের ভাতের অধিকার, ভোটের অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার চাই। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী কুক্ষিগত করল। সেই থেকে দেশে চলছে স্বৈরশাসন। ক্ষমতাসীনরা বিদেশি ব্যাংকে টাকা জমা করেছে আর বাংলার সাধারণ মানুষ ধুঁকে ধুঁকে মরছে।

দেশের মানুষের এহেন দুরবস্থার জন্য স্বাধীনতা আসেনি। আজ যদি বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকতেন, দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে পারলে জনগণের এই দুরবস্থা হত না। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর দেখা যায়, গত ১৫ বছরে মানুষের অবস্থার অবনতি হয়েছে। ৯০ ভাগ লোক আজ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। বঙ্গবন্ধুর সময় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭ ভাগ, এখন তা কমে ১৯ ভাগে দাঁড়িয়েছে। এর কারণ, চরম-দুর্নীতি করা জান্তারা কোনো দেশের মঙ্গল আনতে পারে না।

বঙ্গবন্ধুর সময় দেশে ভূমিহীনদের সংখ্যা ছিল ৩৭ ভাগ, এখন তা দাঁড়িয়েছে ৬৯ ভাগে। শিক্ষিতের হার ২৬ শতাংশ থেকে কমে ১৫-তে নেমেছে। কোনো কথা নেই— স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে '৭৩-এর অধ্যাদেশ কেড়ে নতুন অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে। এই অধ্যাদেশ জনগণ মেনে নেবে না। এই অধ্যাদেশ প্রত্যাহার করতে হবে। ক্ষমতাসীনরা চায় না সন্তানরা শিক্ষিত হোক, স্কুল-কলেজে ফাইনাল পরীক্ষা চলাকালে এখন বন্ধ। ছাত্র-শিক্ষকরা সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি তারিখ ঘোষণা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিন।

ভারতে বাবরী মসজিদের ঘটনা আমরা জানি। সেখানকার সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমাদের দেশে সুপরিকল্পিতভাবে যে, ঘটনা ঘটানো হয়েছে তার জন্য সরকার ও তার কতিপয় মন্ত্রী দায়ী। গুলি, হত্যা করে আন্দোলন নস্যাৎ করার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। এবার সাম্পদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে ১৪৪ ধারা, কার্ফু জারি করে আন্দোলন নস্যাতের ষড়যন্ত্র করেছে। সরকার একদিকে জনগণের সম্পদ বিনষ্ট করছে, আবার অন্যদিকে

রিলিফ বিতরণ করছে। হত্যা, খুন, রাহাজানি, ডাকাতি আজ প্রতিদিনের ব্যাপার। এদিকে বেসামরিক প্রশাসনকে আজ ধ্বংসের চেষ্টা চলছে। জনগণের জানমালের নিরাপত্তায় ব্যর্থ হয়েছে যেসব পুলিশ অফিসার ও সদস্য, তাদের চাকরিতে থাকার কোনো অধিকার নেই। শেখ হাসিনা বলেন, আমরা চাই গণতন্ত্র, গণতন্ত্র ছাড়া কোনো দেশের উন্নতি হতে পারে না। গণতন্ত্র ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পাশাপাশি চলে।

স্বৈর সরকার ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে সংবিধান ক্ষতবিক্ষত করেছে। গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষায় সংবিধানে যথেচ্ছাচার জনগণ সহ্য করবে না। তিনি বলেন, ১০ নভেম্বর নূর হোসেন রক্ত দিয়ে যে শ্লোগান লিখে গেছে আমরা ঐ রক্তের প্রতিশোধ নেবই। বাংলার মানুষের মুক্তি আনবই, স্বৈরশাসনের পতন ঘটাবই। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম নয়। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু এই সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। আমরা চাই না কেউ সেনাবাহিনীকে ক্ষমতাদখলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করুক। মুষ্টিমেয় সেনা কর্মকর্তা উচ্চাভিলাষী হয়ে গোটা বাহিনীর মর্যাদা কলুষিত করেছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার কাজে আমরা চাই সেনাবাহিনী শক্তিশালী হোক।

অবিলম্বে কার্ফু ও ১৪৪ ধারা তুলে নিতে হবে। যারা বিরোধী দলে আন্দোলন করছেন তাঁদের প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আগামীতে বর্তমান সরকারের পতন হলে পা-চাটারা যেন কোনো দলে যেতে না পারে। দাতা দেশগুলোর প্রতি অনুরোধ, যারা জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব করে তাদের কাছে সাহায্য দিন।

---

৬ নভেম্বর, ১৯৯৩ পান্থপথের জনসভায় ভাষণ

(বাংলার বাণীর সৌজন্যে)

বিশ্ব বেহায়ার খপ্পর থেকে দেশ ও জাতি মুক্তি চায়

সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,

আমার সংগ্রামী সালাম গ্রহণ করুন। গণবিচ্ছিন্ন এরশাদ সরকার স্বৈরশক্তির বলে ক্ষমতার মসনদ আঁকড়ে থাকার জন্য চরম নির্যাতন শুরু করেছে। জনগণের মৌলিক অধিকার কেড়ে নিতে জরুরি আইন ও কারফিউ জারি করেছে—যার ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হচ্ছে, উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, নিম্নবিত্ত ও খেটে খাওয়া মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সামরিক শাসক বর্বর আইয়ুব-ইয়াহিয়া ও পাক হানাদার বাহিনী যেভাবে গণতন্ত্রকামী বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করেছিল ঠিক একই কায়দায় বর্তমান গণধিকৃত সরকার ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, ময়মনসিংহ, সিলেট, বগুড়াসহ বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলে হত্যাযজ্ঞ, দমন পীড়ন ও নির্যাতন চালাচ্ছে। বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে লুটতরাজ ও ভাঙচুর করে যাচ্ছে। বহু মায়ের কোল খালি করছে। বাংলার মানুষ এই অন্যায় মেনে নিতে পারে না। তাই তারা প্রতিবাদে ফেটে পড়েছে। জরুরি আইন ও কারফিউ জারির ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার ছাত্র, জনতা, কৃষক, শ্রমিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে, প্রতিরোধের দুর্গ গড়ে তুলেছে এবং স্বৈরশাসকের ক্ষমতার ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। আমি এ বীর জনতাকে তাদের বীরোচিত ভূমিকার জন্য সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই এবং আন্দোলনকে অব্যাহত গতিতে চালিয়ে যাবার আবেদন জানাই। এই আন্দোলনে আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী, ব্যবসায়ী, শিক্ষকবৃন্দ, সাংবাদিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, কৃষিবিদসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ অত্যন্ত সাহসী ভূমিকা গ্রহণ করে আন্দোলনকে আরও গতিশীল করেছেন, তাঁদেরকেও আমি আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। আমি বিশ্বের সকল গণতান্ত্রিক শক্তি ও দেশকে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতাদানের আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা জানেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট নির্মমভাবে হত্যা করে সামরিক শাসনের জগদ্দল পাথর জাতির উপর চাপিয়ে দিয়ে জান্তার শাসন শুরু হয়। দীর্ঘ ১৫ বছর যাবত সামরিক শাসকরা হত্যা, ষড়যন্ত্র এবং নির্বাচনী প্রহসনের নামে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলে রাখতে চরমভাবে দুর্নীতি, জাতীয় অর্থসম্পদ আত্মসাৎ, জনতার ভোট ও ভাতের অধিকার ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করে বিদেশি ঋণ ও সাহায্য অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় ও অবাধ লুটপাট, বিদেশি ব্যাংকে টাকা পাচার ও স্বজনপ্রীতি অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে দেশ ও জাতি আজ দরিদ্রতার চরম সীমায় পৌঁছেছে। নব্বই ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে মানবেতর জীবন-যাপন করছে। চাল, ডাল, তেল লবণসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি জনজীবনে নাভিশ্বাস তুলেছে। শিক্ষিতের হার হ্রাস পাচ্ছে, অপরদিকে চার কোটির

মতো যুবক বেকারত্বের যন্ত্রণার দিশেহারা; জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার ১·৯ ভাগে নেমে গেছে। এক কথায় বলতে গেলে স্বাধীনতার চেতনা ও মূল আদর্শকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে জাতিকে অমানিশার ঘোর অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,

সমগ্র জাতি আজ উপলব্ধি করেছে এবং একথা অত্যন্ত বাস্তব যে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। সরকারের নীতিমালা যদি জনসম্মুখে প্রকাশিত না হয়, সরকার যদি জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য না থাকে, তাহলে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। সেনা ছাউনি ক্ষমতার উৎসস্থান থাকার কারণে বিগত পনের বৎসর বাংলাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার পরিবর্তন ঘটাবার জন্য কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-জনতার মুক্তির লক্ষ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য।

প্রিয় সাথীরা,

স্বৈরাচারের পতন, নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন, শাসনকার্যে জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ, জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক সরকার অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত্র কায়েমের লক্ষ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এই আন্দোলনে ডাঃ শামসুল আলম খান মিলন, হানিফ, ইউনুস, ওয়ালী, ফিরোজ, জাহাঙ্গীর, মানিক, দেলোয়ার হোসেন দিলু, চুন্নু, আউয়াল, মিলন, রতন, মোঃ জাফর, মোঃ নূরুল হুদা, আবদুস সামাদ, আবুল খালেকসহ অর্ধ শতাধিক আন্দোলনরত দেশপ্রেমিক সন্তান জীবন দিয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছে। গ্রেফতার করা হয়েছে অসংখ্য রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে। যারা বিত্তশালী তাদের প্রতি আবেদন, আহতদের চিকিৎসা ও নিহতদের পরিবারের প্রতি সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়ান।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী, মেডিকেল কলেজসমূহের শিক্ষকবৃন্দ ও চিকিৎসকগণ একযোগে পদত্যাগ করে এই সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে চলমান আন্দোলনের সাথে সংহতি ঘোষণা করে রাজপথে নেমেছেন। সংস্কৃতিসেবী, সাংবাদিক, সামাজিক সংগঠন, নারীসমাজসহ সর্বস্তরের জনতার ঢল আজ রাজপথে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। আমি সরকারি কর্মচারী, বেসামরিক প্রশাসন, সশস্ত্র বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসারসহ সকল পেশার মানুষকে জনতার এই ন্যায়সঙ্গত দাবির সাথে একাত্মতা ঘোষণার অনুরোধ জানাচ্ছি। সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ, বিডিআর ও আনসার বাহিনীর কাছে আমার আকুল আহ্বান—আপনারা নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাবেন না, এই গুলি আপনার ভাইয়ের জীবন কেড়ে নিচ্ছে। দুর্নীতিবাজ সরকারের গদি রক্ষার জন্য আর মায়ের বুক খালি করবেন না। সর্বশ্রেণীর ও পেশার মানুষের কাছে আহ্বান—দুর্নীতিবাজ সরকারের সঙ্গে সর্বতোভাবে অসহযোগিতা করুন। জনতার জয় হবেই। ইনশাআল্লাহ্।

১-১২-৯০ তারিখে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান

এই মুহূর্তে পদত্যাগ করতে হবে

আমার সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,

আজকে লাখো সংগ্রামী মানুষের ঢল এখানে নেমেছে। আজকে আন্দোলনের প্রতিটি কর্মসূচীতে আপনারা যারা অংশগ্রহণ করেছেন, যারা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে এই আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করেছেন আমি সকলের প্রতি আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বিগত দিনের আন্দোলনে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন, বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছেন, ঐ এরশাদের লেলিয়ে দেয়া পেটোয়া বাহিনীর বুলেটের আঘাতে যারা নিহত হয়েছে তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাচ্ছি।

আমি জানি না, এই স্বাধীন বাংলাদেশে আর কত রক্ত ঝরবে। আর কত মায়ের কোল খালি হবে। এই স্বাধীন বাংলাদেশে যখন দেখি মাত্র ৭ মাসের শিশু ইমন বুলেটের আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে নিহত হয়েছে, লজ্জা ঢাকার জায়গা আমাদের নেই। যেদিন রাসেলের রক্ত ঝরেছিল, ভেবেছিলাম আর কোনো শিশুর বোধহয় রক্ত ঝরবে না। কি অপরাধ করেছে এই বাংলাদেশের মানুষ? বাংলার মানুষ তো কোনো অপরাধ করে নাই। বাংলার মানুষ তো তার ন্যায্য অধিকার নিয়ে সংগ্রাম করেছে। তার ন্যায়সঙ্গত দাবি-দাওয়া নিয়ে সংগ্রাম করছে। তার বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছে।

আজকে যখন চালের দাম ১৪ টাকা থেকে ১৮ টাকা, তেল-লবণ-পেঁয়াজের দাম ধরা- ছোঁওয়ার বাইরে, আজকে যখন নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত খেটে খাওয়া প্রতিটি মানুষ অর্ধ দিবসও চালাতে পারছে না, আজকে যখন এদেশের মানুষ ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত—তারপর ট্যাক্সের বোঝা, করের বোঝা, জগদ্দল পাথরের মতো সামরিক জান্তারা বসে থেকে রক্ত চুষে নিচ্ছে—মানুষ তখন মরিয়া হয়ে পথে নেমেছে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য।

জনগণ যখনই তাদের অধিকার আদায়ের জন্য রাজপথে নামছে—তাদের উপর চলে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি। জেনারেল এরশাদ এবং তার লেলিয়ে দেয়া বাহিনীকে একটি কথাই আমি বলতে চাই—এই বাংলার মানুষ, আজকে আপনি তাকিয়ে দেখুন—বুলেট দিয়ে হত্যা করে কেউ দাবাতে পারে নাই, কোনোদিন দাবাতে পারবেও না।

জেনারেল এরশাদ সাহেব, এক এক এলাকার মানুষকে গুলি করেছেন, হত্যা করেছেন—হাজার হাজার মানুষ বুলেট উপেক্ষা করে রাজপথে নেমে এসেছে—তারা

আপনার বুলেটকে পরোয়া করে না। আপনি সান্ধ্য আইন দিয়েছেন, বাংলার মানুষ তা ভঙ্গ করেছে। আপনি জরুরি আইন দিয়েছেন, বাংলার মানুষ তা ভঙ্গ করেছে। আপনার কোনো আইন আজ কার্যকর হয় না। মানুষের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কাছে আপনার সমস্ত দমননীতি উড়ে গিয়েছে—এদেশের মানুষের আন্দোলনের তোড়ে।

আমি ধন্যবাদ জানাই এদেশের ছাত্রসমাজকে। ধন্যবাদ জানাই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দকে এবং চিকিৎসকবৃন্দকে। ধন্যবাদ জানাই ঢাকা, চট্টগ্রাম, জাহাঙ্গীরনগর, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকবৃন্দকে। আমি ধন্যবাদ জানাই সরকারি কর্মচারী ও কমকর্তাদের আমি ধন্যবাদ জানাই আইনজীবী, চিকিৎসক, কৃষিবিদ, সাংবাদিক, বিসিএস, সমন্বয় পরিষদ, রেডিও-টিভির শিল্পী ও কলাকুশলী, সংস্কৃতিকর্মী, অন্যান্য পেশাজীবী কর্মচারী, সড়ক পরিবহন এবং এদেশের কৃষক-শ্রমিক রিকশাওয়ালা-মুটে-মজুর, নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত সর্বস্তরের জনগণকে—যাঁরা এই আন্দোলনের সঙ্গে শুধু একাত্মতা ঘোষণা করেছেন; যাঁরা পদত্যাগ করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই আমার ছাত্র বোনদেরকে এবং নারীসমাজকে—যাঁরা আজ ঘর ছেড়ে পথে নেমে এই আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করেছেন।

জেনারেল এরশাদ! সর্বস্তরের জনগণ আজকে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা চান তাঁদের অীধকার। আপনি বক্তৃতা দিয়েছেন গতকাল। এই বক্তৃতায় আপনি পদত্যাগের কথা বলেছেন। একটি কথা বলতে চাই, এদেশের মানুষের আন্দোলনের তোড়ে, আন্দোলনের জন্য এরশাদ আজকে এই পদত্যাগ করবার কথা বলতে বাধ্য হয়েছে। গণমানুষের দাবীর চাপে সে এই পর্যায়ে এসেছে। কিন্তু তার যে-বক্তব্য সে বক্তব্য অত্যন্ত অস্পষ্ট। তার বক্তব্য অন্ত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ। তার বক্তব্যের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রয়ে গেছে। জেনারেল এরশাদকে আমি হুঁশিয়ার করে দিতে চাই— বাংলার মানুষ আপনার পদত্যাগ চায়। কোনো ছলচাতুরি বাংলার মানুষ মেনে নেবে না।

সংগ্রামী ভাইয়েরা আমার! জেনারেল এরশাদ অতীত কার্যকলাপে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা অনেক আগেই হারিয়েছেন। তিনি 'বিশ্ব বেহায়া' হিসেবে অনেক আগেই খ্যাতিলাভ করেছেন। শুধু 'বিশ্ব বেহায়া' নয়, তিনি 'মহা মিথ্যাবাদী' হিসেবেও বাংলাদেশে কেন—সারা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছেন। কাজেই আজকে একটি কথাই আপনাদের কাছে বলতে চাই, উনি ঘোষণা দিয়েছেন— তার পরও একটু টালবাহানার চেষ্টা করতে পারেন। এ বিষয়ে আপনাদের সতর্ক থাকতে হবে। আর আপনাদের কাছে আবেদন, সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আর একটু জোরে ধাক্কা দিতে হবে। এমন ধাক্কা, যে-ধাক্কায় এরশাদের গদি থাকবে না। এরশাদ ক্ষমতায় থাকতে পারবে না। আমাদের দাবি অত্যন্ত সুস্পষ্ট— আমরা গণতন্ত্র চাই। কারণ আমরা জানি, গণতন্ত্র ছাড়া জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক সরকার ছাড়া কোনোদিন উন্নয়ন হতে পারে না। কোনোদিন কোনো দেশে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হতে পারে না। বরং দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়। আর এই দুর্নীতি যে বৃদ্ধি পেয়েছে তার প্রমাণ আপনারা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন। আজকে

দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। যেখানে জবাবদিহিমূলক সরকার না থাকে, যেখানে জনগণ ক্ষমতায় মূল শক্তি না হয় সেখানে দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

১৯৭৫ সালের ১৫ অগাস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করার পর এ দেশের সামরিক জান্তার শাসন শুরু হয়েছে। বুলেট ও ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করে সে ক্ষমতায় বসে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে জাতীয় অর্থসম্পদ, বিদেশি সাহায্য ও ঋণের টাকা লুটাপাট করে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সমস্ত সম্পদের মালিক হচ্ছে। আর বাংলার নব্বই ভাগ মানুষ আজকে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। আজকে সারা গ্রামবাংলায় নীরব দুর্ভিক্ষ চলছে। আজকে ঘরে ঘরে হাহাকার। মানুষ খেতে পায় না। খেতে না পেয়ে মানুষ মৃত্যুবরণ করছে। আরেকটি যুদ্ধ এসেছে, দেশের জাতীয় সম্পদ লুট করে বিদেশের ব্যাঙ্কে টাকা জমা হচ্ছে। ঐ হত্যা ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল নয় আমরা চাই এদেশের জনতাই হবে ক্ষমতার উৎস— ক্যান্টনমেন্ট নয়। বুলেট নয় ব্যালট চাই। ব্যালটই হবে এদেশের মানুষের শক্তি এবং ক্ষমতার একমাত্র উৎস। তার জন্য আমাদের দাবি অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

আপনারা জানেন, আমরা রূপরেখা দিয়েছি। ৬ নভেম্বর পান্থপথের জনসভা থেকে প্রথম ঘোষণা করেছিলাম যে, এরশাদ সাহেব, আপনার পথ আছে। সংবিধানের ৫৫ এবং ৫১ ধারা অনুযায়ী আপনি চলে যেতে পারেন। আমরা আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছি। দরোজা খোলা, আপনি এবার গিয়ে বাংলার মানুষকে রেহাই দিন।

পরবর্তীকালে আপনারা জানেন, তিনজোট গত ১৯ তারিখ এই রূপরেখা বিস্তারিত ভাবে পেশ করেছি। আমরা চাই সকল জোটের কাছে গ্রহণযোগ্য একজন ব্যক্তিকে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ করে জেনারেল এরশাদকে পদত্যাগ করতে হবে। সেই উপ-রাষ্ট্রপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে এই দেশে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দেবেন। তাই আমাদের দাবি উপরাষ্ট্রপতি নিয়োগ করতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ বাতিল করতে হবে। সংসদ বাতিল করতে হবে। নির্বাচনের তরিখ ঘোষণা করতে হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে আমরা সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন চাই— যে, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমরা চাই জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল একজন সরকার গঠন করতে।

একটি কথা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে চাই, আবার সামরিক শাসন মানেই সংবিধান বহির্ভূত হয়ে ক্ষমতায় আসা। সংবিধান বহির্ভূত হয়ে যারা ক্ষমতায় আসবেন, ঐ সামরিক আইন জারি করবেন। সামরিক আইন জারির মধ্য দিয়ে অর্ডিন্যান্স করবেন এবং তখনি আবার সংবিধানের বহির্ভূত বিষয়কে বৈধ করবার জন্য ঐ জান্তারা ক্ষমতায় এসে করবে আবার দল গঠন, আবার নির্বাচন। আর নির্বাচন মানে আপনারা জানেন, যদি কোনো আইন আনতে, সংবিধানে সংশোধনী আনতে হলে দুই-তৃতীয়াংশে সদস্য লাগে। ঐ জান্তারা ক্ষমতায় এসে ঐ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের জন্য দল করে। নির্বাচনে কারচুপি করে দুই-তৃতীয়ংশ নিয়ে সংবিধানে মার্শাল ল অর্থাৎ সামরিক আইন এবং

তাদের যত কালাকানুন থাকে সেগুলি আবার সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করবার যে-নীতি রয়েছে সেগুলি আবার চালু করবে। বাংলার মানুষ তার ক্ষমতা পাবে না। ক্ষমতা জনগণের হাতে আসবে না। ক্ষমতা আবার ঐ ক্যান্টনমেন্টে জান্তার হাতে চলে যাবে। তার জন্য আমরা সামরিক শাসন চাই না। সংবিধানে নির্দিষ্ট ভাবে দেয়া আছে এবং আমরা পথ দেখিয়ে দিয়েছি। এখানে টালবাহানা করবার আর কোনো অবকাশ নাই। জেনারেল এরশাদকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই- আর কোনো টালবাহানা করে পদত্যাগ করতে দেরি করলে বাংলার মানুষ তা মেনে নেবে না। আপনাকে এই মুহূর্তেই পদত্যাগ করতে হবে— বাংলার মানুষ তাই চায়। আর আমরা জান্তার শাসন চাই না। বাংলার মানুষের আমরা অধিকার চাই।

গত কয়েকদিনের আন্দোলনে আমাদের অনেক কর্মী, নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমি এরশাদকে নির্দেশ দিতে চাই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের সকল বন্দিকে মুক্তি দিতে হবে, অবিলম্বে জরুরি আইন তুলে নিতে হবে। সান্ধ্য আইন তুলে নিতে হবে।

আর একট কথা আমি বলতে চাই, আপনারা জানেন, আমরা যখন আন্দোলন শুরু করলাম, জেনারেল এরশাদ কখনও গুলি চালিয়ে, কখনও লাঠিপেটা করে, কখনও বাধা দিয়েছে নানাভাবে। প্রায় ৭০ জন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে। সারা বাংলাদেশ থেকে এখনও মৃত্যুর খবর আসছে। প্রায় হাজার হাজার মানুষ বুলেটবিদ্ধ অথবা নানাভাবে আহত হয়েছে। এরশাদ নানা ছলাকলা করছে। এর আগে আন্দোলনের এক পর্যায়ে আপনাদের মনে আছে, এদেশে সাম্প্রদায়িক সংঘাত জেনারেল এরশাদ তাঁর ঐ গুণ্ডা বাহিনী দিয়ে শুরু করেছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু ধর্ম সম্প্রদায়ের দোকানপাট লুট করা, বাড়িঘরে আগুন দেয়া, মন্দির ভাঙা, নানা কর্মকাণ্ড করে আন্দোলনকে বিপথগামী করতে চেয়েছিলেন। আজকেও আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি, ঐ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করবার পাঁয়তারা জেনারেল এরশাদ করছে। আপনাদের কাছে আমার আবেদন— প্রত্যেক এলাকায় এলাকায়, মহল্লায় মহল্লায় গণসংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলে আপনারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যাতে বজায় থাকে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। জেনারেল এরশাদের কোনোরকম ষড়যন্ত্র যেন কার্যকর হতে না পারে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথা বলতে চাই, আপনারা জানেন, যখনই আন্দোলন এগিয়ে যাবে, যখনই জনগণ বিজয়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবে তখনই ষড়যন্ত্র শুরু হবে। নানা ধরনের অপপ্রচার শুরু হবে। এই সমস্ত অপ্রপচারে আপনারা কান দেবেন না।

আপনারা জানেন, আমি মা-বাবা-ভাই সব হারিয়েছি। আমার ব্যক্তিগতভাবে চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। কোনোকিছু চাওয়া-পাওয়ার জন্য আমি রাজনীতি করি না—আমি আপনাদের বলেছি। আমি শুধু বাংলার মানুষের অধিকার চাই। যে অন্যায়, যে অত্যাচার-অবিচার শুরু হয়েছে, যে শোষণ শুরু হয়েছে, এই শোষণের হাত থেকে বাংলার মানুষকে আমি মুক্তি দিতে চাই। যে স্বপ্ন নিয়ে ত্রিশ লক্ষ শহীদ রক্ত দিয়েছিল, যে আদর্শ নিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এদেশের স্বাধীনতা এনেছিলেন— সেই স্বাধীনতার মূল্যবোধ, স্বাধীনতার চেতনাকে সমুন্নত রাখতে চাই। স্বাধীনতার

সুফল বাংলার মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে চাই। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এই স্বাধীনতার সুফল বাংলার মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেবার জন্য যখনই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, যখনই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন—সেই মুহূর্তে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিল, আপনারা জানেন। আমি আগেই সবকিছু বলেছি, আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু বাংলার মানুষকে এই অত্যাচার নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্য, এই আন্দোলনকে এগিয়ে নেবার জন্য, বাংলার মানুষের বিজয় ছিনিয়ে আনবার জন্য যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারে আমি প্রস্তুত—এই ওয়াদা আমি আপনাদের কাছে করছি। সেইসঙ্গে আমি আরেকটি কথা বলি, আমি আপনাদের কাছে জানতে চাই যে, আমার উপর আপনাদের বিশ্বাস আছে কিনো, আস্থা আছে কি না, আপনাদের কাছে আমি জানতে চাই।

আপনাদের প্রতি আমি পরম কৃতজ্ঞতা জানাই, বাংলার মানুষকে স্বৈরাচারের হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্য, এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যদি প্রয়োজন হয় বাবার মতো বুকের রক্ত দিয়ে বাংলার মানুষের অধিকার আমি প্রতিষ্ঠা করব।

সংগ্রামী ভায়েরা আমার,

আজকে শুধু বাংলাদেশে নয়, বিশ্বের প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশ এবং গণতান্ত্রিক মানুষের কাছেও আমার আহ্বান—আপনারা দেখুন, বাংলার মানুষ গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছে, বাংলার মানুষ তার ভাত-কাপড়ের জন্য লড়াই করছে। ঐ স্বৈরাচারী এরশাদকে আর কোনো সাহায্য-সহযোগিতা নয়—বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়ান। বাংলার মানুষের কাজে আপনারা সাহায্য-সহযোগিতা করুন— আপনাদের কাছে আমার সেই আবেদন রইল।

আজকে আপনাদের কাছে আরেকটি আবেদন—আপনারা জানেন, এই স্বৈরাচারী এরশাদ ও তার চেলাচামুণ্ডারা আর তারপর আছে ঐ ভাড়াখাটা মন্ত্রীরা, গুণ্ডাবাহিনী—এরা নানাভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্ন এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করবে। আমরা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করি, আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাস করি। এই আন্দোলনকে সফলতার দিকে নিয়ে যেতে হবে। অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে আপনাদের আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

জেনারেল এরশাদকে বলতে চাই, আর সংঘাতের পথে পা দেবেন না। সংঘাতের পথে পা দিলে কী হবে ফলাফল— আপনার প্রভু, যাঁর দাসত্ব করেছিলেন, যাঁর কাছ থেকে নিশান-এ-পাকিস্তান আনেন, তঘমায়ে পাকিস্তান আনেন, সেই ইয়াহিয়ার কথা স্মরণ করবেন। বাংলার মানুষ বর্ষায় যেমন নরম, ঠিক চৈত্র মাসে তেমনি সেই নরম মাটি ঢেলা হয়ে যায়। তার প্রমাণ জেনারেল এরশাদ গত কয়েকদিনে পেয়েছেন। আর যদি বাড়াবাড়ি করেন, আর যদি এই দেশের মানুষের উপর গুলি চালান—বাংলার মানুষ তা ছেড়ে দেবে না। প্রতিটি হত্যার প্রতিশোধ আমরা গ্রহণ করবই করব। প্রতিটি গুলির আঘাতকে আমরা প্রতিঘাতে ফেরত পাঠাব—এই আমার নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি। ইনশাল্লাহ্ জয় আমাদের হবেই হবে। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। জয় হোক বাংলার মেহনতি মানুষের।

৪.১২.৯০ তারিখে বঙ্গবন্ধু এভিউনিতে জনসভায় ভাষণ

ক্ষমতা হস্তান্তর না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে

'এরশাদ পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছে কিন্তু এখনও পদত্যাগ করেনি, মন্ত্রিসভা বাতিল করেনি। এরশাদকে নির্দেশ দিতে চাই, অবিলম্বে মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে দিয়ে অবৈধ সংসদ বাতিল করতে হবে এবং রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে। যতক্ষণ না এরশাদ পদত্যাগ করে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে ততক্ষণ আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।' বুধবার বিকেলে বঙ্গবন্ধু এভেনিউতে আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক বিশাল গণসমাবেশে ভাষণ দানকালে তিনি একথা বলেন। গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগ গতকাল বিকেলে এই সমাবেশের আয়োজন করে। মঙ্গলবার রাতে রাষ্ট্রপতি এরশাদের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর গতকালের এই সমাবেশেই ৮ দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা প্রথম ভাষণ দেন। আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর ভাষণ শোনার আশায় গতকাল দুপুর থেকে হাজার হাজার ছাত্র, শ্রমিক, জনতা মিছিলসহ বঙ্গবন্ধু এভেনিউতে সমবেত হতে থাকে। জাতীয় ও দলীয় পাতাকা, বঙ্গবন্ধুর ছবিসহ নানা রং-এর ব্যানার বয়ে নিয়ে অর্ধলক্ষাধিক জনগণ এ সমাবেশে যোগ দেন। ঢাকা নগর আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, কৃষকলীগ, মহিলা আওয়ামী লীগ এবং ৮ দলের অন্যান্য শরিক সংগঠনের পক্ষ থেকে কর্মীরা মিছিলসহ সমাবেশে যোগ দেয়। এ যাবতকালের সর্ববৃহৎ এ সমাবেশে শেখ হাসিনা উপস্থিত হন বিকেলে ৪টা ৩৭ মিনিটে। তখন স্বতঃস্ফূর্ত জনতা 'হাসিনা তুমি এগিয়ে চলো আমরা আছি তোমার সাথে', 'হাসিনা তোমার ভয় নাই, সঙ্গে আছে লাখো ভাই', হৈ হৈ রৈ রৈ এরশাদ গেল কৈ' প্রভৃতি শ্লোগান দেয়।

শেখ হাসিনা বলেন, আমরা গণতন্ত্রের জন্যে লড়াই করে যাচ্ছি, স্বৈরশাসনের হাত থেকে দেশকে মুক্তি দিতে। গতকাল মঙ্গলবারের সমাবেশে আমরা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এরশাদকে পদত্যাগের ঘোষণা, সকল রাজবন্দীর মুক্তি, অবৈধ সংসদ বাতিল করে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন দেয়ার দাবি জানিয়েছি। আপনাদের আন্দোলনের জন্যে বাংলার মানুষ আরেকবার বিজয় ছিনিয়ে এনেছে। এরশাদ পদত্যাগের ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়েছে। অনেক দেরিতে হলেও রাষ্ট্রপতি এরশাদের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে, আর রক্তপাত না ঘটিয়ে তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। রেডিওতে এ ঘোষণার পর যে হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল তা প্রকাশের ভাষা আমার নেই। তিনি বলেন, নূর হোসেবের ভাই আলী হোসেনের বুকফাটা কান্নায় বাতাস ভারী হয়ে এসেছিল। শত শহিদের রক্তের বিনিময়ে সে আন্দোলন আজ বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসেছে।

এ আন্দোলনে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, পেশাজীবী, শিল্পী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ বিভিন্ন সংগঠন রাজপথে শরিক হয়েছে, সমগ্র বাঙালি জাতি স্বৈরশাসনের

পতনের জন্যে আবার ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তিনি বলেন, গত মঙ্গলবার মনে হয়েছিল '৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরের কথা। 'জয় বাংলা' শ্লোগানে ভরে গেছে রাজপথ। ক্ষমতাসীনদের কোনো ছলচাতুরিকে বাংলার জনগণ প্রশ্রয় দেবে না, বাংলার মানুষ তাঁদের অধিকার চায়। '৭৫-এর ১৫ অগাস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার বন্দি রয়েছে। আন্দোলনকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে আপনাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। যে কোনো ষড়যন্ত্রকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করবেন, কোনো রকম অপপ্রচারে কান দেবেন না, লুটপাট-ভাংচুরকে প্রশ্রয় দেবেন না। দেশবাসী তথা নির্বাচিত সরকার দালালদের আইনানুযায়ী বিচার করবে। বারবার সশস্ত্র বাহিনীকে ক্ষমতার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। যতদিন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল সশস্ত্র বাহিনীতে কোনো বিশৃঙ্খলা ছিল না, সেখানে কোনো সন্তানহারা মায়ের কান্না শোনা যায়নি।

শেখ হাসিনা বলেন, জনগণের সরকার ক্ষমতায় গেলে সেনাবাহিনীর কোনো ক্ষতি হবে না, সেনাবাহিনী তার পূর্ণ মর্যাদা ফিরে পাবে। তিনি বলেন, সেনাবাহিনীর দায়িত্ব দেশকে রক্ষা করা, কারো গদি রক্ষা করা নয়। পুলিশ, বিডিআর সদস্যরা জনগণের সেবক— আপনারা নিরপেক্ষ থাকবেন। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী, নারী-সমাজ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, কর্মী, আপামর জনগণকে ধন্যবাদ জানাই— যেভাবে আপনারা আন্দোলনকে সফলতার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছেন। বিগত আন্দোলনকালে ডাঃ মিলনকে হত্যা করা হয়েছে, আরো অনেকে শহিদ হয়েছেন। এ রক্তের দাগ যেন বৃথা না যায় সেজন্যে জনগণকে তৎপর থাকতে হবে। তিনি বলেন, যেহেতু এরশাদ এখনও ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি, সেহেতু ১০, ১১ ও ১২ ডিসেম্বর-অবরোধ কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে। ইনশাল্লাহ্ আজ যে বিজয়ের সূচনা হয়েছে আমরা একদিন বিজয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছুতে পারব। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত করে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারব।

৫.১২.৯০ তারিখে বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে জনসভায় ভাষণ

[দৈনিক 'বাংলার বাণী'র সৌজন্যে]

জনগণই হবে ক্ষমতার মূল নিয়ন্ত্রক শক্তি

আমার প্রিয় সংগ্রামী দেশবাসী,

আস্‌সালামু আলাইকুম, আমার সংগ্রামী অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা নেবেনে। বাংলাদেশের ফাল্গুন মাস তার দামাল ছেলেদের আত্মহত্যা ও রক্তদানের এক ঐতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত মাস। সেই মাসেরই এক পুণ্য দিনে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত। আমি আজ প্রথমেই স্মরণ করি আমাদের ভাষাসংগ্রাম থেকে শুরু করে স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পরবর্তীকালে ১৯৭৫-এর ১৫ই অগাস্ট থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত স্বৈরশাহীর হাতে এবং স্বৈরশাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে দেশের যেসব বীরসন্তান আত্মদান করেছেন, শহিদ হয়েছে—তাঁদের সকলকে। এই শহিদদের রক্তের দামে জিয়া-এরশাদ স্বৈরশাসন আমলের ১৫ বছরের অন্ধকার যুগের অবসান হয়েছে। বাংলার মানুষ আবার মুক্ত সূর্যের অভ্যুদয় দেখছে রক্তিম আকাশে। বাংলাদেশের এই বীর সৈনিকদের কাছে আমরা চিরদিনের জন্য রক্তঋণে বাঁধা। তাঁদের কাছে আমাদের এই কৃতজ্ঞতার ঋণ কোনো দিন শোধ হবে না।

সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,

আমি ক্ষমতার জন্য রাজনীতিতে আসিনি। এসেছিলাম একটি হারানো স্বপ্ন উদ্ধার এবং একটি রক্তাক্ত আদর্শের পাতাকা আবার তুলে ধরার জন্য। কোন কিছু পাওয়ার জন্য আমি জেল-জুলুম ও গুলির মুখে বুক পেতে দিইনি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে যে ৩০ লাখ ভাইবোন শহীদ হয়েছেন, সেই বীর শহীদদের স্বপ্নের বাংলাদেশ হায়নারা গড়ে তুলতে দেয়নি। সেই বীর শহীদের স্বপ্ন সফল করা এবং জিয়া-এরশাদ পদ্ধতির স্বৈরশাসনের কবল থেকে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে উদ্ধার করার লড়াইয়ে আমি নিজেকে উৎসর্গ করেছি। স্বৈরতন্ত্রকে চিরকালের জন্য এদেশ থেকে উৎখাত করা এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা করা জাতির জন্য অপরিহার্য। এ জন্য আমরা বিরামহীন সংগ্রাম করেছি। আজ সেই সংগ্রামের ফলেই স্বৈরশাসনের দীর্ঘ অমানিশা শেষে এক নতুন স্বর্ণ উষার দরজা আমাদের সামনে খুলে গেছে। জাতির জন্য এই সোনালি ভোরের দরজা খোলার চাবি হচ্ছে সাধারণ নির্বাচন। আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারি এই বহু প্রতীক্ষিত নির্বাচনের তারিখ।

এবারে নির্বাচনের একটি বিশেষ তাৎপর্য এই যে, এটা কেবল একটি সরকার পরিবর্তনের নির্বাচন নয়, এটি জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনের নির্বাচন। জিয়া-এরশাদ মার্কা স্বৈরাচারী পদ্ধতির বদলে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার নির্বাচন। আপনাদের ভোটাধিকার ও নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার নির্বাচন। এবারে নির্বাচনে

তাই ভুল করলে চলবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাংলার জাগ্রত জনতা ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যেমন ভুল করেনি, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে যেমন ভুল রায় দেননি, ১৯৮৬ সালেও যেমন তারা ব্যাপক ও প্রকাশ্য ভোট ডাকাতির মাঝেও আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিপুলভাবে জয়যুক্ত করেছে, তেমনি ১৯৯১ সালের এই সাধারণ নির্বাচনেও তারা ভুল করবে না। ভুল রায় দেবে না।

আওয়ামী লীগ একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের প্রায় অর্ধশতাব্দী কালের ইতিহাস আপনাদের জানা। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আওয়ামী লীগ অস্ত্রের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। তার শক্তির উৎস জনগণের আস্থা ও সমর্থন। এই সমর্থনের বলে বলীয়ান হয়েই আপনাদের প্রিয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ একদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সফল নেতৃত্ব দিয়েছে। আবার এই সেদিন আওয়ামী লীগের শুরু করা জনগণের সম্মিলিত গণতান্ত্রিক আন্দোলন বাংলাদেশের বুক থেকে জিয়া-এরশাদ পদ্ধতির স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। সংগ্রামী জনগণের সঙ্গে আমাদের শত শত কর্মীর আত্মদান, ত্যাগ তিতিক্ষা ও দুঃসহ নির্যাতন বরণের মধ্য দিয়ে যে বিজয় অর্জিত হয়েছে, তাকে রক্ষা করা ও স্থায়ী করা আজ আমাদের জাতীয় কর্তব্য।

আওয়ামী লীগ সংসদীয় গণতন্ত্র চায়। সে নির্বাচিত সংসদে আপনাদের মনোনীত প্রতিনিধিরা একত্রিত হয়ে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ইচ্ছা অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবেন। জনগণের সমর্থন থাকলে তাঁরা ক্ষমতায় থাকবেন। জনগণের সমর্থন না থাকলে তাঁরা ক্ষমতা থেকে সরে যাবেন। কেউ বন্দুকের জোরে আপনাদের উপর তার স্বেচ্ছাচারী শাসন চাপিয়ে দেবে না। কালো বাক্সের 'হাঁ ও না-সূচক' নির্বাচনী প্রহসন দ্বারা বা ভোট ডাকাতির বলে নিজেকেই নিজে দেশের শাসক বলে ঘোষণা করবে না। বন্দুকের নল নয়, জনগণই হবে সকল শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। বুলেট নয়, ব্যালট হবে তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের হাতিয়ার। এই লক্ষ্য সামনে নিয়ে বাংলার মানুষ তাদের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ২৫ বছর সংগ্রাম করে জয়ী হয়েছে। আবার ১৯৭৫ সালের ১৫ই অগাস্টের সেই অভিশপ্ত রাত্রির পর থেকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই গড়ে ওঠা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন ১৯৯০ সালে এসে স্বৈরচারের কবর রচনা করেছে। আল্লাহ্ আমাদের সফল করেছেন। বাংলার মানুষ তার রক্ত দিয়ে নতুন বিজয় ছিনিয়ে এনেছে।

এই জয় আমাদের উপর আরো বিরাট দায়িত্ব অর্পণ করেছে। মুহূর্তের ভুলে এই জয় আমাদের হাত থেকে চলে যেতে পারে। জনগণের মুক্তিকে অতন্দ্র পাহারা দিয়ে রক্ষা করতে হবে। চারি দিকে পরাজিত শত্রুপক্ষ ওৎ পেতে আছে। তাদের ছোবল ও ষড়যন্ত্র থেকে লড়াই করে ছিনিয়ে আনা গণমানুষের মুক্তিকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। গণমুক্তি ও গণতন্ত্রকে রক্ষা করা এবং স্থায়ী করার লক্ষ্যে নির্বাচন একটি সোপান মাত্র। এই সোপান বেয়ে আমাদের আরও বহু দূর লক্ষ্যপথে যেতে হবে। সে পথ আরও দুরূহ

এবং আরও জটিল। ক্ষমতায় যাওয়া সহজ, কিন্তু ক্ষমতায় গিয়ে কোটি কোটি দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো এবং তাদের সমস্যা সমাধান করা একটি কঠিন কাজ। দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে যদি বাধামুক্ত করা যায় এবং জনগণকে সঙ্গে নিয়ে যদি তাদের সমস্যা সমাধানে এগুনো যায়, তা' হলে সমস্যা যতই গুরুতর হোক, তার সমাধানের একটা না একটা পথ খুঁজে পাওয়া যাবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আপনারা জানেন একাত্তরের নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সময় পাক হানাদার বাহিনী ও রাজাকার, আলবদর, স্বাধীনতাবিরোধীদের ধ্বংসযজ্ঞের কারণে গোটা বাংলাদেশ ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছিল। হানাদার বাহিনী দেশের সকল সড়ক, মহাসড়ক, সেতু, রেলযোগযোগ, সমুদ্র বন্দর, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মন্দির কলকারখানা, ঘরবাড়ি, খাদ্যগুদামসহ গ্রামের হাটবাজার পর্যন্ত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়। ১৬ই ডিসেম্বর এরূপ একটি ধ্বংসস্তূপের উপর আওয়ামী লীগ শূন্য কোষাগার নিয়ে এদেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। অর্থ, খাদ্য, বাসস্থান, বস্ত্র এমনকি সাধারণ ঔষধের সংকট মোকাবেলা করতে হয়েছে সেই সরকারকে। দেশের অভ্যন্তরে চিল মুক্তিযদ্ধের বিরোধীতাকারী শত্রুরা, যারা "পূর্ব পাকিস্তান জিন্দাবাদ" শ্লোগান দিয়ে দেশব্যপী সন্ত্রাস ও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। এই সময় জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য সব দ্রব্যের মূল্য বিশ্ব-বাজারে অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়। সে সময় উল্লেখযোগ্য কোনো সাহায্য বিদেশ থেকে পাওয়া যায়নি। এ ছাড়াও চলে খাদ্য নিয়ে দেশি-বিদেশি চক্রান্ত। ফলে নগদ অর্থে কেনা খাদ্যের জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ফিরিয়ে নেয়া হয়। ১৯৭২ সালের দীর্ঘস্থায়ী খরা, ১৯৭৩ সালের প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন ছাড়াও ১৯৭৪ সালে দেশ ভয়াবহ বন্যাকবলিত হয়। সে সময়ে বিশ্ব ব্যাংক এক রিপোর্টে বলেছিল যে যুদ্ধকালীন ধ্বংসলীলার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের দুই কোটি লোক অনাহারে মারা যেতে পারে। বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার সে দুর্ভিক্ষ প্রতিহত করেছে। '৭৪ সালে যে-খাদ্যভাব দেখা দেয়, সে খাদ্যাভাব সৃষ্টিতে দেশি ও আন্তর্জাতিক স্বাধীনতাবিরোধী চক্রান্তের ভূমিকা আজ সর্বজনবিদিত।

প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী ও গতিশীল নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার স্বাধীনতা উত্তরকালের বহুমুখী সংকটকে সাফল্যজনকভাবে মোকাবেলা করে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন সুসম্পন্ন করে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তোলে। এখানে সেই গণমুখী সরকারের শুধু কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথাই আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি ঃ

হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও ভৈরব সেতুসহ ৫৬৭টি সেতু নির্মাণ ও মেরামত, ৭টি নতুন ফেরি, ১৮৫১টি রেলওয়ে ওয়াগান ও যাত্রীবাহী বগি, ৪৬০টি, বাস, ৬০৫টি নৌযান এবং ৩টি পুরাতন বিমান নিয়ে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের ব্যবস্থা করা, মাইন উদ্ধার করে বন্দর সমূহ সচল করা।

পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত ব্যাংক, বীমা ও ৫৮০টি শিল্প ইউনিটের জাতীয়করণ চালু করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থান। ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন।

জনগণকে সকল ক্ষতার উৎস হিসেবে ঘোষণা করে ১৯৭২ সালের আধুনিক গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন।

মদ, জুয়া, হাউজি, ঘোড়দৌড়সহ সমস্ত ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড কার্যকরভাবে নিষিদ্ধকরণ।

ইসলামী ফাউন্ডেশন গঠন ও মাদ্রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা।

পবিত্র হজ্জব্রত পালনে সরকারি অনুদান।

ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদ লাভ।

পাকিস্তান আমলের বকেয়া খাজনাসহ ২৫বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরতরে মওকুফ।

কয়েক লক্ষ কৃষি ঋণের সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহারসহ ভূমিহীন কৃষকের জন্যে খাস জমি বিতরণ।

চাষীভাইদের জন্য সহজ শর্তে কৃষি ঋণদানের ব্যবস্থাকরণ, বিনা মূল্যে কীটনাশক ঔষধ, স্বল্পমূল্যে সার, বীজ ও যৎসামান্য ভাড়ায় পাওয়ার পাম্প ও গভীর নলকূপ সরবরাহ।

ভারত হতে প্রত্যাবর্তনকারী ছিন্নমূল ১ কোটি লোকের পুনর্বাসন ও দেশের অভ্যন্তরে ২ কোটি বাস্তুহারার খাদ্যসংস্থান।

৩ মাসের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের ফেরত পাঠানো ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ফিরিয়ে নেয়া।

মুক্তিযুদ্ধে নিহত ৩০ লাখ শহীদ পারিবারকে আর্থিক সাহায্য ও ৩ লাখ নির্যাতিতা মা-বোনের দায়িত্বগ্রহণ, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য বিদেশ প্রেরণ, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন।

৪০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জাতীয়করণ ও কয়েক লক্ষ অবহেলিত শিক্ষককে সারকারি কর্মচারীর মর্যাদা দান, বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ প্রণয়ন, ডঃ কূদরত-ই-খূদা শিক্ষা কমিশন গঠন ও জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলন।

১১ হাজার নূতন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনসহ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ পুনর্নির্মাণ।

প্রতি থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ এবং অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীদের স্থায়ী চাকুরের মর্যাদা দান।

জাতীয় সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী, নৌবাহিনীসহ প্রতিরক্ষা বাহিনীকে জাতীয় মর্যাদায় পুনর্গঠন এবং কুমিল্লায় দেশের প্রথম সামরিক একাডেমী স্থাপন।

পুলিশ, বি. ডি. আর. আনসার ও বেসামরিক প্রশাসনের অবকাঠামো গড়ে তোলা।

১৯৭৩ সালে সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের রায় নিয়ে সরকার গঠন।

পাকিস্তানে আটক এক লাখ বাইশ হাজার বাঙালিকে দেশে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসিত করা।

৭ লক্ষ পাকিস্তানিকে ফেরৎ পাঠানো।

বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষায় মর্যাদা বৃদ্ধি এবং জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলায় প্রথম ভাষণদান।

জাতিসংঘের সদস্যপদ ও ১৪০টি দেশের স্বীকৃতিলাভ।

বিশ্বশান্তি ও বিশ্বমানবতার ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর অবদান ও 'জুলিও কুরী' পুরস্কার লাভ।

ফারাক্কার পানিবণ্টন চুক্তিতে বাংলাদেশের জন্য ৪৪ হাজার কিউসেক পানির ব্যবস্থা।

প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

যুদ্ধবিদ্ধস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের কাজ শেষ করে বঙ্গবন্ধু যখন স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলার ব্রত নিয়ে অগ্রসর হলেন, তখন স্বাধীনতার দেশি-বিদেশি পরাজিত শত্রুরা একজোট হয়ে তাঁর গৃহীত বৈপ্লবিক কর্মসূচিকে প্রতিহত করার হীন উদ্দেশ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারের সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করে এদেশে সামরিক স্বৈরশাসনের ধারার সূচনা করে। জনগণ নয়, ব্যালট, নয়, বুলেট ও ষড়যন্ত্রই হয়ে উঠল তাদের ক্ষমতার উৎস। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে শুরু হয় এ দেশে হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। ষড়যন্ত্রকারী এই উচ্চাভিলাষীরা অস্ত্রের জোরে ক্ষমতা দখল করে অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার হীন উদ্দেশ্যে সরকারি অর্থের অঢেল অপচয় করে এবং প্রশাসনযন্ত্র ও গোয়েন্দা সংস্থাকে ব্যক্তিগত স্বার্থে নিজেদের ক্ষমতার মসনদ গড়ার কাজে সহায়ক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে। অপর দিকে ক্ষমতার উচ্ছিষ্ট বিলিয়ে দেশের দুশ্চরিত্র, দলছুট ও সামাজিক অপরাধীদের সমন্বয়ে নির্বাচনী প্রহসনের মাধ্যমে এই অপরাধীচক্র ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করতে অপচেষ্টা চালায়। প্রথমে জেনারেল জিয়া এই অবৈধ ধারার সূচনা করে এবং পরবর্তীতে জেনারেল এরশাদ জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এই ভাবে গত ১৫ বছর ধরে জিয়া-এরশাদের শ্বাসরুদ্ধকর সামরিক স্বৈরশাসন চালু থাকে বাংলাদেশে।

এই সামরিক স্বৈরশাসন দেশের সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, আইনের শাসন ও জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করে সকল ক্ষমতা জিয়া-এরশাদের হাতে কুক্ষিগত করে। জিয়া-এরশাদের হাতে গণতন্ত্র লাভ করেছে গণধিকৃত আইয়ুবি রূপ, ধ্বংস হয়েছে সুমহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহ, শুরু হয়েছে সশস্ত্র বাহিনীল মধ্যে হানাহানি, প্রশাসনের অভ্যন্তরে দুর্নীতির প্রসার, রাজনৈতিক দলে ভাঙনের প্রক্রিয়া, সামাজিক অপরাধীদের প্রশ্রয়দান, বৈদেশিক স্যায্যের হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট, ব্যাংকঋণের নামে কোটি কোটি টাকা লুটপাট, ক্ষমতাসীনদের কালোবাজারি, স্বর্ণ ও মাদকদ্রব্য চোরাচালানে অংশগ্রহণ, দুর্বিসহ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের ঝনঝনানি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের

লাগামহীন মুল্যবৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মাতাতিরিক্ত ব্যয়বৃদ্ধির ফলে জনজীবনে নাভীশ্বাস, স্বাধীনতাবিরোধী ও বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনীদের পুনর্বাসন, সমাজের সুবিধাভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি ও নতজানু পররাষ্ট্রনীতির সূচনা।

জিয়া-এরশাদ দুজনই ক্ষমতা দখলের সময় বলেছিলেন যে, তাঁরা সৈনিক এবং তাঁরা কোনো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ পোষণ করেন না। কিন্তু জেনারেল জিয়া জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে সেনাছাউনিতে ফিরে যাওয়ার যে ওয়াদা জাতিকে দিয়েছিলেন রেডিও-টিভির ভাষণে, তা ভঙ্গ করে প্রথমে জাগদল, তারপর ফ্রন্ট, তারও পরে ১৯ দফা বাস্তাবায়ন কমিটি এবং সর্বশেষে বি.এন.পি. গঠন করেন। এরশাদ অনুরূপভাবে তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করে প্রথমে জনদল, তারপর ফ্রন্ট, তারও পরে ১৮ দফা বাস্তাবায়ন কমিটি এবং সর্বশেষে জাতীয় পার্টি গঠন করেন। চারিত্রিকভাবে জিয়া-এরশাদের সামরিক স্বৈরশাসন ও তাঁদের সৃষ্ট দুটি দল এক ও অভিন্ন। তাদের দলের সবাই দলের স্রষ্টাদের মতো লুটেরা ক্ষমতালিপ্সু। সেজন্যই বি.এন.পি.র অধিকাংশ মন্ত্রী ও নেতা জিয়ার মৃত্যুর পর ছুটে গিয়ে এরশাদের দল জাতীয় পার্টিতে যোগ দেন।

আমার সংগ্রামী দেশাবাসী ভাই ও বোনেরা,

জাতির জনকের কন্যা হিসেবে ১৯৮১ সালে দেশে প্রত্যাবর্তনের দিন থেকেই আমি স্বৈরশাসনের অবসানকে আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য এবং জাতির প্রতি আমার মহান কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করি। এই লক্ষ্যে ১৯৮২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে ১৫ দলীয় ঐক্যজোটের পক্ষ থেকে আমি ১১ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে গণআন্দোলনের সূচনা করি। আন্দোলনে বেসামাল হয়ে সরকার যে- দমননীতির আশ্রয় নেয় তার অংশ হিসেবে ১৯৮৩-র ১৫ই ফেব্রুয়ারি আমাকেসহ ১৫ দলীয় জোট নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায় ও নির্যাতন চালায়। আন্দোলনের তীব্রতায় ১৯৮৬ সালে আমাদের কিছু দাবি সরকারকে মানতে বাধ্য করা হয় এবং আন্দোলনের অংশ হিসেবে ১৯৮৬-র নির্বাচনে বি.এন.পি.সহ সকল জোট অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয। চুক্তি ছিল আওয়ামী লীগ ১৮০ আসনে এবং বি.এন.পি ১১০ আসনে জোটবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশ নেবে এবং সে অনুযায়ী জোটগুলির মধ্যে একটি চুক্তি হয়। কিন্তু রাতের আঁধারে বি.এন.পি এরশাদকে টিকিয়ে রাখা ও আওয়ামী লীগকে ঠেকানোর জন্য এরশাদের সাথে আঁতাত করে এই চুক্তি থেকে সরে যায়। এই নির্বাচনে আমরা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করা সত্ত্বেও স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার ভোট ডাকাতি ও মিডিয়া ক্যুর মাধ্যমে আমাদের অর্জিত বিজয় ও গণরায় কেড়ে নিয়ে ভুয়া নির্বাচনি ফলাফল ঘোষণা করে ভোট ডাকাত হিসেবে কুখ্যাত হয়ে ওঠে। ১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর স্বৈরাচারী এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে ঢাকা অবেরাধসহ দেশব্যাপী গণআন্দোলন শুরু করার পরপরই ১১ই নভেম্বর আমাকে আবার গ্রেফতার করা হয়।

আমাদের নেতৃত্বে গণআন্দোলনের তীব্রতায় স্বৈরচারী এরশাদ সরকার দিশেহারা হয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ কায়দায় ১৯৮৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি চট্টগ্রামের জনসভায় আমার উপর গুলিবর্ষণ করে। বীর জনতা তাদের জীবনের ঝুঁকি নয়ে আমাকে রক্ষা করে। স্বৈরাচারের বুলেটে সেদিন আমার ৩৮ জন ভাই শহিদ হন এবং শত শত আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মী বুলেটবিদ্ধ হন। আপনারা জানেন, আমি কখনও জীবনের পরোয়া করিনি। আমি জানি, আমার হারাবার আর কিছুই নেই। তাই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমি স্বৈরাচারের পতনের লক্ষ্যে সংগ্রামের পর সংগ্রাম গড়ে তুলি। এক গণআন্দোলন থেকে আরেক গণআন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ি। গত ৬ই নভেম্বর পান্থপথের বিশাল জনসভায় সংবিধানের ৫১ ও ৫৪ ধারা মোতাবেক সাংবিধানিক পন্থায় এরশাদের পদত্যাগের পথ দেখিয়ে দিই—যার ফলশ্রুতিতে এক গণঅভ্যুত্থানের সৃষ্টি হয় এবং ১৯৯০ এর ৬ই ডিসেম্বর অসংখ্য শহিদের রক্তের ঢেউয়ে ভেসে যায় স্বৈরচারী এরশাদের মসনদ। সূচিত হয় গণতন্ত্রের বিজয় অভিযান এবং রচিত হয় ২৭শে ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচনের পটভূমিকা।

প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

আপনাদের অবগতির জন্য ১৯৯০ সাল পর্যন্ত তিন সরকারের আমলে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ, অর্জিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা তুলনামূলকভাবে বিচার করার সুবিধার্থে আমি এখন কিছু পরিসংখ্যান উপস্থাপন করছি।

১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর আমলে বিদেশি সাহায্য এসেছে মাত্র ১ হাজার ৮ শত ৩১ কোটি টাকা, যার সিংহভাগ ব্যবহৃত হয় জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতায় যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসন প্রকল্পে। বি.এন.পি. বা এরশাদ সরকারকে যুদ্ধবিদ্ধস্ত কোনো দেশ গড়তে হয়নি। দেশবাসী ভালভাবেই জানেন যে, এই দুই সামরিক স্বৈরাচারের আমলে এসব সাহায্য জনগণের বা দেশের কোনো কল্যাণমূলক কাজে লাগেনি। দুর্নীতির মাধ্যমে এসব বৈদেশিক সাহায্যের হাজার হাজার কোটি টাকা মুষ্টিমেয় লোকের পকেটে গেছে এবং বিদেশে পাচার হয়েছে। ফলে দেশের ৯০ ভাগ মানুষ আজ দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে।

এই সময়কালের গড় প্রবৃদ্ধির হারের তুলনা করলে দেখা যাবে যে, আওয়ামী লীগ আমলের প্রবৃদ্ধির হার ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি অর্থাৎ শতকরা ৭.০৬ ভাগ। জিয়ার আমলে প্রবৃদ্ধি কমে গিয়ে ৪.৭৫ ভাগে দাঁড়ায়। এরশাদের আমলে তা আরও কমে গিয়ে হয় ৩.৯৫ ভাগ। স্পষ্টত জিয়া-এরশাদের আমলের চেয়ে আওয়ামী লীগের আমলে উন্নয়নমূলক কাজ সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয় এবং সাধারণ মানুষের অবস্থাও ছিল অনেক সচ্ছল।

বঙ্গবন্ধুর আমলে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৮৬ কোটি ডলার। জেনারেল জিয়া ও এরশাদের আমলে তার পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে ৩৮০ কোটি ডলার ও ১০৩৫ কোটি

ডলারে দাঁড়ালেও দুর্নীতি ও অপচয়ের কারণে প্রবৃদ্ধির হার কমে যায়, গণমানুষের দারিদ্র্য বেড়ে যায় এবং অর্থনীতি প্রায় ভেঙে পড়ে।

ভূমিহীনের সংখ্যা বঙ্গবন্ধুর, আমলে ছিল শতকরা ৩৫ ভাগ। জেনারেল জিয়ার আমলে ৫৫ ভাগ এবং এরশাদের আমলের শেষে ৭৫ ভাগের উর্ধ্বে।

আওয়ামী লীগের আমলে অতি দরিদ্র লোকের শতকরা হার ছিল ৫০ জন। বি.এন.পি. এবং এরশাদের আমলে এই হার বেড়ে যথাক্রমে ৬৫ এবং ৮৬ জনে দাঁড়ায়।

চাল, ডাল, আটা, লবণ, ভোজ্যতেল, কেরোসিন, লুঙ্গি, শাড়ি, গামছা ইত্যাদি প্রত্যেক জিনিসেরই দাম আজ ১৯৭৫ সালের তুলনায় অনেক বেশি। ১৯৭৫-এর তুলনায় চাল, লুঙ্গি ও শাড়ির দাম বেড়েছে ৪ গুণ, আটার দাম বেড়েছে ৭ গুণ, ডালের দাম বেড়েছে ১২ গুণ, পেঁয়াজের দাম বেড়েছে ২৭ গুণ।

আওয়ামী লীগ আমলে শতকরা ১৫ জন বেকারের জায়গায় বি.এন.পি. আমলে তা দ্বিগুণ হয়ে ৩০-এ দাঁড়ায় যা বর্তমানে শতকরা ৪২ জন। বি.এন.পি. দাবি করেছে যে, বি.এন.পি. শাসনামলই বাংলাদেশের স্বর্ণযুগ। জাতীয় পার্টি পক্ষ থেকে একই হাস্যাস্পদ দাবি রেখেছেন মিজান চৌধুরী। আমি বি.এন.পি.র তথাকথিত স্বর্ণযুগ সম্পর্কে উদাহরণস্বরূপ কিছু তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

হত্যা, ষড়যন্ত্র ও অস্ত্রের অপব্যাবহার করে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত সাংবাধিনিক সরকারের অপসারণ ও অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল।

মুক্তিযুদ্ধের মহান চেতনাকে পুনর্বাসিত করা এবং শাহ আজিজ, মাওলানা মান্নান, আবুদল আলীম প্রমুখ জাতিদ্রোহী কুখ্যাত ব্যক্তিদের প্রধানমন্ত্রী/মন্ত্রী বানানো।

সংবিধানের ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ও তাঁর পরিবারবর্গের হত্যার আত্মস্বীকৃত খুনীদের বিচার বন্ধ।

কর্নেল হুদা, লেঃ কর্নেল হায়দার, মেজর জেনারেল খালেদ মোশররফসহ অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা, জিয়ার প্রাণ রক্ষাকারী কর্নেল তাহেরকে প্রহনসমূলক বিচারে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ফাঁসি।

গদিরক্ষার্থে সেনাবাহিনীর ৬ শতাধিক অফিসার এবং ৩ হাজারের অধিক জওয়ানকে হত্যা।

জনগণের ভোটাধিকার হরণ এবং "হাঁ-না" নির্বাচনের প্রহসন করে নিজেকে শতকরা ৯৮.৮৭ ভাগে জয়যুক্ত বলে ভুয়া ফলাফল ঘোষণা।

কযেক শত মদের লাইসেন্স প্রদান ও সারা দেশে আনন্দমেলার নামে অসমাজিক কার্যকলাপে উৎসাহদান।

২৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমির উপর পুনরায় খাজনা আরোপ।

যুব কমপ্লেক্সের মাধ্যমে হাট-বাজার ইজারা দেয়া, পরিকল্পনাহীন খাল কাটা এবং তথাকথিত গ্রাম সরকারের মাধ্যমে গ্রামেগঞ্জে দুর্নীতি ছড়িয়ে দেয়া।

ফারাক্কার পানি বণ্টনের চুক্তিতে ৪৪ হাজার কিউসেক পানি থেকে ৩৪ হাজার

কিউসেকে কমিয়ে এনে উত্তরাঞ্চলের বিরাট এলাকাকে মরুভূমিতে পরিণত করা।

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রের ব্যবহার ও সন্ত্রাসসৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বিনষ্ট করা।

খুলনা ও রাজশাহী জেলে অনশনরত বন্দিদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালিয়ে বহু বন্দিকে হত্যা ও আহত করা।

মন্ত্রীদের সরকারি বাসভবনকে খুনী, দাগীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত করা। যুবক মন্ত্রী আবুল কাশেমের সরকারি বাড়িতে বহু খুনের আসামী কুখ্যাত ইমদুর গ্রেফতারের কথা এখনও সবার মনে আছে।

১৯৭৮ সালে উত্তর বঙ্গে, বিশেষ করে বৃহত্তর রংপুরে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে বহু প্রাণহানি হয়। এ সময় পেটের জ্বালায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে বহু মহিলা পতিতাবৃত্তিতে নাম লেখায়।

বাংলাদেশ সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী ১৯৭৬ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত অর্থাৎ বি.এন.পি আমলে ব্যাংকসমূহ থেকে মোট ১৮৭১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা শিল্প ঋণ বেসরকারি খাতে দেয়া হয়। দলীয় টাউটদেরকে নামে বেনামে এসব ঋণ দেয়ার ফলে শিল্পে উৎপাদন বাড়েনি, শুধু বেড়েছে ব্যাংকগুলোর লোকসানের পরিমাণ।

বি.এন.পি. সরকারের স্বর্ণযুগের দাবি প্রসঙ্গে আপনাদেরকে ১৯৮২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি বি.এন.পি. সরকারের রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার নিজেই বি.এন.পি মন্ত্রী দুর্নীতিবাজ ও অযোগ্য বলে আখ্যায়িত করে মন্ত্রিসভা বাতিল করার সময় যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট অংশের উদ্ধৃতি দিচ্ছি ঃ

"সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিভিন্ন গুরুদায়িত্বে যাঁরা নিয়োজিত রয়েছেন তাঁদের অনেকের কর্তব্য ও দায়িত্বপালনে ব্যর্থতা ও অবহেলা, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা, দেশের মঙ্গল সম্পর্কে নির্লিপ্ততা ও দুর্নীতিপরায়ণতার ফলে দেশের সামগ্রিক অবস্থার অবনতি ঘটেছে।....এই মন্ত্রিসভার অনেক সদস্যের নিষ্ঠা, সততা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে জনমনে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে এবং অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তাই আমি বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙে দিচ্ছি। সামগ্রিক প্রশাসনব্যবস্থাকে দুর্নীতি ও স্থবিরত্ব থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।"

যে-দলের প্রধান রাষ্ট্রপতি হিসেবে দুর্নীতি ও অযোগ্যতার দায়ে তাঁর দলীয় মন্ত্রিসভা বাতিল করেন, সে-দল যখন নির্বাচনি ইশতেহারে "দুর্নীতিমুক্ত সৎ সরকার প্রতিষ্ঠা"কে তাদের কর্মসূচীর শীর্ষে স্থান দিয়ে কথা বলে তখন মনে হয় দেশবাসী যেন "ভূতের মুখে রাম নাম" শুনছেন।

জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং রাষ্ট্রপরিচালনায় তাঁর পূর্বসূরি জিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন, কিন্তু বেশ কয়েক ক্ষেত্রে তাঁর অপকর্ম পূর্বসূরির রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়েছে। তাই মিজান চৌধুরীর দাবি যে, জাতীয় পার্টির সময়ে দেশে "স্বর্ণযুগ" বিরাজ করেছে— তার প্রেক্ষিতে জাতির কাছে সে সম্পর্কে নতুন করে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন, কারণ তাদের দুঃশাসন ও সীমাহীন লুটপাটের কথা দেশবাসীর স্মৃতির

পটে এখনও জাজ্জ্বল্যমান। বিগত ১৫ বছর জিয়া-এরশাদ ও তাঁদের দোসরদের জন্য স্বর্ণযুগ ছিল, আপামর জনগণের জন্য নয়।

স্বৈরশাসকদের গর্ভে জন্মলাভকারী অশুভ শক্তি জাতির জনকের হত্যাকারীর সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাদখলের উদ্দেশ্যে গোপন আঁতাত করতে পারেন এবং একই উদ্দেশ্যে দলীয় নির্বাচনি ইশতেহারে নির্জলা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ১৯৭১ সালের এক অজ্ঞাত মেজরকে স্বাধীনাতর ঘোষক বলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহস বিকৃত করে জাতিকে ধোঁকা দেয়ার ধৃষ্টতা দেখাবার দুঃসাহস করেন তাদেরকে জাতি কোনো দিন বিশ্বাস ও ক্ষমা করতে পারে না।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামীর ঘৃণ্য ভূমিকার কথা দেশের মানুষ কখনোই ভুলতে পারে না। জামায়াতের লোকেরা মুক্তিযুদ্ধের সময় আলবদর, আলসাম্‌স ও রাজাকারবাহিনী গঠন করে পাক হানাদারবাহিনীর সহযোগী হয়ে দেশব্যাপী গণহত্যা, বুদ্ধিজীবী হত্যা, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও কয়েক লক্ষ মা-বোনের শ্লীলতাহানি ইত্যাদি জঘন্য অপরাধ করেছে। তারাও আজ ধর্মের নাম নিয়ে নির্বাচনী মাঠে ভোট চাইছে। পাকবাহিনীর জল্লাদ দোসর এই জামায়াতের লোকদের সম্বন্ধে অতীতের ন্যায় এবারেও আপনাদের সজাগ ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মূল্যবোধ ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে কিছু অপব্যাখ্যা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলিম বিশ্বের মহান নেতা জনাব ইয়াসির আরাফাত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করেছেন।

আলজেরিয়া ও তুরস্কসহ বহু দেশ এই নীতিতে বিশ্বাসী। আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার শিক্ষা পবিত্র কোরআন শরিফ থেকেই পেয়েছি। পবিত্র কোরআন শরিফের সুরা কাফেরুনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রযেছে "লা-কুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন"। কোনো মোমেন মুসলমানের মুখ থেকে কোনো শক্তি 'বিস্‌মিল্লাহ' তুলে নিতে পারে না। ধর্মনিরপেক্ষতা ও বিসমিল্লাহ্‌তে কোনো বিরোধ নেই। জামায়াত, বি.এন.পি.-সহ প্রতিক্রিয়াশীল মহল, যারা ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে অপপ্রচার চালাচ্ছে তারা জনগণের সাথে রাজনৈতিক ভাঁওতাবাজি করছে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময় ও ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় এই গোষ্ঠীর পূর্বসূরিরা "ইসলাম গেল" বলে এই ধরনের অপপ্রচার চালিয়েছিল। ১৯৭১-এর সুমহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পবিত্র ইসলামের নাম নিয়ে এই শক্তিই ঘৃণ্য কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল। সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করে এই মহলটি রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চায়। আমরা এই চিহ্নিত অশুভ শক্তি সম্পর্কে সমগ্র জাতিকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। এই অপপ্রচার সত্ত্বেও '৫৪, '৭০, '৮৬ সালে জনগণ নৌকায় ভোট দিয়েছিল। জনগণ অতীতে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে ভুল করেনি, এবারও করবে না।

বঙ্গবন্ধু ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ করার পাশাপাশি আইন করে মদ, জুয়া, হাউজি, ঘোড়াদৌড় ইত্যাদি অনৈসলামিক কার্যকলাপ বন্ধ করেছিলেন। জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের জন্য ধর্মনিরপেক্ষতা তুলে দিয়ে সংবিধানে

"বিসমিল্লাহ্" সংযোগ করে ৩৬০টি মদের দোকানের লাইসেন্স নির্দ্বিধায় দিয়েছিলেন। এরশাদ ইসলামকে একই উদ্দেশ্যে ১৯৮৮ সালে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেন কিন্তু তাঁর সরকারের ছত্রছায়ায় দেশে হেরোইন ও অন্যান্য মাদকদ্রব্যের বহুল প্রসার ঘটেছে। এমতাবস্থায় বর্তমানে তারা অতীতের পাক শাসকদের কায়দা ইসলাম বিপন্ন বলে যে জিগির তুলেছেন তা স্পষ্টতই স্ববিরোধী, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং মোটেই নীতিভিত্তিক নয়।

প্রিয় সংগ্রামী দেশবাসী ভাই ও বোনেরা,

এবারে আমি দেশ ও জাতির সার্বিক অগ্রগতি আনয়নের জন্যে আমাদের প্রস্তাবিত কর্মসূচী আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

দেশে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের সংবিধানের ভিত্তিতে জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করতে চাই। এই লক্ষ্য অর্জনে ১৯৭২ সালের সংবিধান চতুর্থ সংশোধনী পুনর্বহাল করা হবে।

একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মুল্যবোধ সমুন্নত রাখা।

মহান স্বাধীনতার সুফল '৭২ এর শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত ৪ রাষ্ট্রীয় মূলনীতি— জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিপেক্ষতা রক্ষা করা।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের হত্যার বিচার করা।

জেলের অভ্যন্তরে জাতীয় ৪ নেতার হত্যাকাণ্ডের বিচার করা।

আত্মনির্ভশীল অর্থনীতি গড়ে তুলে জনগণের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের মৌলিক চাহিদা পূরণসহ জনগণের জীবনের মানোন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন করা।

দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শাক্তিশালী করে গড়ে তোলা, খাদ্যে দ্রুত স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, গ্রামাঞ্চলের পুঞ্জীভূত দারিদ্র্য নিরসন এবং দ্রুততার সঙ্গে অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বিগত ১৫ বছরের স্বৈরশাসন যে দুর্বিসহ বেকার সমস্য সৃষ্টি করেছে তার সমাধানের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামবাংলার আজকের মলিন চেহারা দ্রুত পাল্টে দেয়ার সবরকম ব্যবস্থা করা। কৃষক, ক্ষেতমজুর, ভূমির মালিক ও সরকারের যৌথ উদ্যেগে সূচনা করা হবে এক কৃষি তথা সবুজ বিপ্লবের। তার সাথে ঘটাতে হবে কুটিরশিল্প ও পল্লীঅঞ্চলের বিদ্যুতায়নের প্রসার এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য আয়বৃদ্ধিকারী সব ধরনের প্রকল্পে উৎসাহ প্রদান। দ্বিতীয়ত ব্যাক্তিমালিকানাধীন দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশের পরিকল্পনার মাধ্যমে কাঁচামালের সদ্ব্যবহার উৎসাহিত করে আমদানি হ্রাস এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করা। তৃতীয়ত রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বৃহৎ ও ভারী শিল্পের উন্নয়ন ও উৎপাদনবৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জন, প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারায় ন্যায়সঙ্গত সামাজিক বণ্টন, উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় জনগণের পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং ক্রমান্বয়ে স্বাবলম্বিতা অর্জন— এই চার নীতি হবে আমাদের উন্নয়ন দর্শন।

সৃজনশীল ও ব্যক্তিখাতের স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগকে সর্বাগ্রে স্থান দেয়া এবং অগ্রাধিকারভিত্তিতে ব্যাক্তিখাতের সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশের নিশ্চয়তা বিধান করা। সাধরণভাবে ব্যক্তিগত কোনো উদ্যোগ, ব্যবস্থা, আর্থিক অবস্থা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করা হবে না।

ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় খাতের প্রত্যক্ষ ভূমিকাও হবে গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় খাতের ব্যবস্থাপনায় বিদ্যামান অদক্ষতা ও অনভিপ্রেত অলাভজনকতা দূর করে দক্ষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, প্রতিযোগী বাজারব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ধায়ার উৎপাদনশীলতা দ্বারা এদেরকে লাভজনক করা।

কৃষিক্ষেত্রে সময়োপযোগী ভূমিসংস্কার, কৃষিব্যবস্থার বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন, প্রকৃত ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের নিকট খাস জমি বিতরণ, ভর্তুকি ও অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে সার, বীজসহ সব ধরনের কৃষি উপকরণের মূল্যহ্রাস, কৃষকদের জন্য সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্ত নিশ্চিতকরণ।

জাতির জনকের ওয়াদা অনুযায়ী ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ, ৫,০০০/ টাকা পর্যন্ত বিদ্যমান কৃষিঋণ সুদসহ মওকুফ, ১০,০০০/ টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণের সুদ মওকুফ করা ইত্যাদি ব্যবস্থার মাধ্যমে যথাশীঘ্র খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন।

বন্ধ কলকারখানা চালু করা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যহ্রাসের ব্যবস্থা, কালোবাজারি, মুনফাখোরি, ফটকাবাজি কঠোরভাবে দমন করা ও শ্রমিক-কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি পূরণ করা।

কামার-কুমার-জেলে-তাঁতি সম্প্রদায়সমূহের এবং গ্রাম ও শহরের বিত্তহীন গরিব মানুষের বিভিন্ন সমস্যার ন্যায্য সমাধান করা। প্রকৃতি মৎস্যজীবী জেলেদের জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা।

বস্তিবাসী, রিকশাচালক, মুটে-মজুর প্রভৃতি গরিব ও বাস্তুহারা নিঃস্ব মানুষের জীবন-জীবিকা ও বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করা।

বেকার যুবকদের জন্য দেশে ও বিদেশে কাজের ব্যবস্থা করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

পানিসহ জাতীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার এবং দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পানিবণ্টন ও বন্যা-সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করা।

যমুনা বহুমুখী ও মেঘনা-গোমতী সেতু প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়ন করা।

অবৈতনিক সার্বজনীন বাদ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, গণমুখী ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষানীতি চালু করা, সেশন জটের নিরসন, শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাঙ্গনের নৈরজ্য দূর করা, নিরক্ষরতা দূর করা, গ্রামঞ্চলের মেয়েদের জন্য ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা, ছাত্রসমাজের ন্যায্য দাবিসমূহ পূরণ করা, '৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা।

গণমুখী স্বাস্থ্যনীতি ও চিকিৎসার ব্যবস্থা চালু করে চিকিৎসাখাতে বাজেট বৃদ্ধি করা।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করণের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কার্যকর ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

জাতিসংঘের নারীর সমধিকার সনদ অনুমোদন, যৌতুকপ্রথাসহ নারী নির্যাতন কঠোরভাবে দমন করা, শিশু-নির্যাতন বন্ধের ব্যবস্থা করা।

অপসংস্কৃতির প্রসার এবং প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণার বিস্তার রোধ করা। বাঙালি জাতির আবহামান ঐতিহ্য অনুযায়ী জাতীয় সংস্কৃতি, ভাষা ও কৃষ্টির গণমুখী প্রগতিশীল বিকাশের ব্যবস্থা করা। নাটক ও সিনেমাশিল্পের অব্যবস্থা দূরীকরণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

ক্রীড়া ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও মান উন্নয়নের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দুনীতিদমনে কঠোর ব্যবস্থাগ্রহণ।

চোর চালান, চুরি-ডাকাতি, খুন, ছিনতাই, নারী নির্যাতন, সামাজিক অনাচার ও ঘুষ-দুনীতি কঠোরভাবে দমন করা এবং অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিপ্রদান করা।

আন্তর্জাতিক মাদক ব্যবসার অশুভ বলয় এবং মাদকাশক্তির ভয়াবহ বিস্তারের বিপদ থেকে দেশকে উদ্ধার করা।

চিকিৎসক, প্রাকৌশলী, কৃষিবিদ, সাংবাদিক সাহিত্যিক, শিক্ষক, শিল্পী, আইনজীবীসহ সকল পেশাজীবীর ন্যায়সঙ্গত দাবির সম্মানজনক সামাধান করা।

বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

বাক-ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতার স্বাধীনতা নিশ্চিত করা। গণ-প্রচারমাধ্যমগুলোকে নিরপেক্ষভাবে কর্তব্য সম্পাদন করতে দেয়ার উদ্দেশ্যে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিক করা।

সংবিধান কর্তৃক রক্ষিত মৌলিক অধিকরারের পরিপন্থী সকল নিবর্তনমূলক আইন ও কালাকানুন বাতিল করা।

যে-কোনো মূল্যে আমাদের দেশপ্রেমিক জাতীয় সশস্ত্র বাহিনীর মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা। সশস্ত্র বাহিনীকে ক্ষমতাদখলের হাতিয়ারে পরিণত করার প্রচেষ্টা প্রতিহত করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সুদক্ষ, শাক্তিশালী ও কার্যকর করে গড়ে তোলা।

প্রশাসনের গণমুখী বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা। দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলার মাধ্যমে প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সরকারি কর্মচারী, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সত্যিকার উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে শাক্তিশালী করে গড়ে তোলা।

উপজাতীয় জনগণের ওপর সকল নির্যাতন বন্ধ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করা।

অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করা।

স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে যেসব ব্যক্তি আহত ও নিহত হয়েছেন, তাদের পরিবারবর্গকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা।

বিশ্বের সব দেশের সহিত বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক ও শান্তিপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখা। সাম্রাজ্যাবাদ , আগ্রাসনবাদ, বর্ণবৈষম্যবাদ, ইহুদিদের বিরুদ্ধে এবং ফিলিস্তিনিদের মুক্ত সংগ্রাম ও নয়া আন্তর্জাতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পক্ষে সংগ্রাম জোরদার করা। জোট

নিরপেক্ষ আন্দোলন,ও. আই. সি. সার্কভুক্ত রাষ্ট্রসমুহের সথে বন্ধুত্বপূর্ণ সদ্ভাব বজায় রাখা।

আমার সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,

আওয়ামী লীগ এদেশের গণমানুষের ঐতিহ্যবাদী সংগ্রামী সংগঠন। প্রাসাদের অভ্যন্তরে বা সেনা-ছাউনিতে এই দলের জন্ম হয়নি। কোনো সামরিক শাসকের পকেট থেকেও এই দল বেরিয়ে আসেনি। বাংলার জনগণের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়মী লীগের বিকাশ ঘটেছে। ১৯৪৯ সাল থেকে আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা জন্মলগ্ন থেকে দেশবাসীরা সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে আছেন। বাঙালি জাতির সুদীর্ঘ মুক্তির লড়াইয়ের আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীরা শত সহস্র জেল-জুলুম সহ্য করছেন, রক্ত ও জীবন দিয়েছেন। জিয়া-এরশাদবিরোধী দীর্ঘ আন্দোলনেও আওয়ামী লীগের নেতা ও কমীরা অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেছেন। এখানে শ্রদ্ধার সাথে আমি স্মরণ করছি জিয়া-এরশাদের স্বৈরাচারের বুলেটে শহিদ শওকত, ওয়ালী, মোহসীন, মাহফুজুল রহমান বাবু, মুনির, সেলিম, দেলোয়ার, দিপালী সাহা, জননেতা ময়েজউদ্দিন, রবিউল আওয়াল কিরণ, রমিজ, মোজাম্মেল, শ্রমিক নেতা তাজুল, নূর হোসেন, ফাত্তাহ, বাবুল, তিতাস, আসলাম, স্বপন, মনির, শাহজাহান সিরাজ, বসুনিয়া, জিয়াবুল, দুলাল, কামরুজ্জামান, আজিজুল ইসলাম, রতন, ডাঃ মিলন প্রমুখ শহীদ বীরদের, যাঁদের রক্তের বিনিময়ে জিয়া-এরশাদ স্বৈরশাসনের অমানিশার অবসান হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর শহীদের সাথে গত পনের বছরের শহিদ বীরদের নাম সমগ্র জাতির কাছে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা আমার,

দীর্ঘ ১৫ বছর এদেশে গণতন্ত্র অনুশীলন করা হয়নি। হত্যা, ষড়যন্ত্র, সন্ত্রাস, ক্ষমতা জবরদখল ও ভোটাধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খেলাই ছিল ক্ষমতাসীনদের একমাত্র লক্ষ্য। ক্ষমতা দখল করে অবাধ লুটপাট, দুর্নীতির মাধ্যমে কালো টাকার পাহাড় গড়ে তোলা, রাষ্ট্রীয় অর্থসম্পদ বিদেশে পাচার, অবৈধ অর্থসম্পদের মালিক হয়ে দেশের মানুষকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করাই ছিল জিয়া-এরশাদ সরকারের রাষ্ট্রপরিচালনার ধারা। গণতন্ত্র অনুশীলন করতে হলে সংযম, সহনশীলতা ও পরমতসহিষ্ণুতা, একান্ত প্রয়োজন। গণতন্ত্র ছাড়া জাতীয় অগ্রগতি ও উন্নয়নসাধন সম্ভব নয়। তাই আমাদের লক্ষ্য জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বৈরশাসকদের দ্বারা সৃষ্ট সকল অনিয়ম, অব্যবস্থা সঙ্কট ও নৈরাজ্য নিরসনকল্পে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করা। জনগণকেই ক্ষমতার মূল নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। সরকার হবে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ। সেই লক্ষ্যে আমরা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠনের মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির পথ উন্মুক্ত করতে চাই। রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্র থেকে সন্ত্রাসকে নির্মূল করে জনগণকে সামাজিক নিরাপত্তা দিতে চাই।

প্রিয় দেশবাসী,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার জন্মলগ্ন থেকেই বাঙালি জাতির মুক্তি ও সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। জাতির দুঃসময়ে আওয়ামী লীগের অগণিত নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা জনগণের পাশে থেকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। ন্যায় ও সত্যের

সংগ্রাম করেছে। যে-কোনো আন্দোলন, সংগ্রাম, গণঅভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধে আওয়মী লীগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। আপনাদের প্রাণপ্রিয় নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে গড়া সংগঠন বাংলাদেশ আওয়মী লীগ কখনও জাতির কাছে প্রদত্ত ওয়াদার বরখেলাফ করেনি। জাতির যে-কোনো সংকটময় মুহূর্তে জনগণকে সাথে নিয়ে অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে, আত্মত্যাগ স্বীকার করেছে, জেল-জুলুম, অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেছে। এই সংগঠনের নেতা-কর্মীরা নিঃস্ব, রিক্ত হয়ে আপোষহীনভাবে জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। আর তাই আওয়ামী লীগের উপর জনগণ আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

আগামী ২৭শে ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচন জাতির জন্য অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। দীর্ঘ ১৫ বছর পর অবাধ ও মুক্ত পরিবেশে আপনারা ভোট দেবার সুযোগ পেয়েছেন। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ আমাদের ঐক্যজোট প্রার্থীরা আপনাদের প্রিয় নৌকা প্রতীক নিয়ে ভোটপ্রার্থী হয়েছেন। নির্বাচনকে সামনে রেখে আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল সফর করছি। সারা বাংলাদেশে আজ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতীক নৌকার পক্ষে অভূতপূর্ব গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। নৌকার পালে যে হাওয়া লেগেছে তা বাঙালি জাতিকে মুক্তির স্বর্ণদুয়ারে পৌছাবেই। আমি আমার প্রিয় আপামর দেশবাসীর কাছে উদাত্ত আহ্বান জানাব, আপনারা নৌকায় ভোট দিন, আমি আপনাদের গণতন্ত্র দেব, অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে সর্বতোভাবে কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রাখব, স্বাধীনতার সুফল বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দেব। এই নির্বাচনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য, প্রশাসনকে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রিয় দেশবাসী,

১৯৫৪ সালে এই নৌকা হক-ভাসানী ও সোহরায়ার্দীর আহবানে বাঙালির বিজয় এনেছিল। এই নৌকা ১৯৭০ সালে বঙ্গবন্ধুর ডাকে স্বাধীনতার ম্যান্ডেট এনেছিল।

এই নৌকা ১৯৭৩-এ নির্বাচনে শোষণমুক্তির অঙ্গীকার এনেছিল। ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে এই নৌকার ভোটেই স্বৈরাচারী এরশাদের পতনের সূচনা করেছিল। এবারের নৌকা জিয়া-এরশাদ পদ্ধতির স্বৈরাচারী সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় পদ্ধতির গণতান্ত্রিক সরকার এনে দেবে এবং জনগণের শাসন কায়েম করে গরিব দুঃখী মানুষের ভোট ও ভাতের অধিকার সুনিশ্চিত করবে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের স্বাদ ঘরে ঘরে পৌছে দেবে। ইনশাল্লাহ্ জনতার জয় হবেই। আমি আপনাদের কাছে ওয়াদা দিচ্ছি যে, জাতির পিতা এবং তাঁর দল আওয়মী লীগের নৌকায় আপনাদের আস্থা ও রায়ের মর্যাদা আপনাদের প্রিয় বঙ্গবন্ধুর ন্যায় আমিও আমার জীবন দিয়ে হলেও রক্ষ করব। আমি আজ আপনাদের দোয়া চাই। আমি যেন বঙ্গবন্ধুর মতো সারা জীবন তাঁর আদর্শের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে দুঃখী মানুষের সেবা করে যেতে পারি, দেশ ও জনগণের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করতে পারি। আপনারা আমার জন্য এই দোয়াই করবেন। আবারো আপনাদের সকলকে জানাই সালাম ও আন্তরিক শুভেচ্ছা।

খোদা হাফেজ। জয় বাংলা— জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক বাংলার মেহননি মানুষের।

---

২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ জাতীয় সংসদে নির্বাচন উপলক্ষে বেতার ও টেলিভিশন ভাষণ

নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা আমার সংগ্রামী শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। আমরা আওয়ামী লীগসহ দেশের গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল সংগঠনগুলো দেশবাসীকে সাথে নিয়ে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে দীর্ঘদিন আন্দোলন পরিচালনা করেছি। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক সরকার তথা সংসদীয় গণতন্ত্র কায়েমই ছিল আমাদের লক্ষ্য। দীর্ঘ ১৫ বছরের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম ও আন্দোলনের ফসল হিসেবে গত ৬ই ডিসেম্বর গণআন্দোলনের মুখে স্বৈরশাসক এরশাদের পতনের পর দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার আলোকে প্রতিষ্ঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, যার তত্ত্বাবধানে গতকাল ২৭শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একটি গণতান্ত্রিক দল হিসেবে বিশ্বাস করে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য। জনগণের রায়ই হবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের একমাত্র হাতিয়ার। এই বিশ্বাস নিয়েই আওয়ামী লীগ তার সহযোগী ১৫ দলকে সাথে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

স্বৈরশাসনের পতনের পর আমরা জাতির কাছে বারংবার আহ্বান জানিয়েছি যে, অর্জিত বিজয়কে সংহত করে গণতন্ত্র ও জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার যে সুযোগ আমাদের কাছে এসেছে তাকে দায়িত্বশীলতার সাথে বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে, জনগণকে স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে দেশকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় উত্তরণ ঘটানোর জন্যে। নির্বাচনকে সত্যিকারভাবে অবাধ ও নিরপেক্ষ করার জন্যে আমরা নির্বাচন আচরণবিধি মেনে চলার এবং গণতান্ত্রিক সহনশীল এবং নির্বাচনী রীতি-নীতি পদ্ধতি যথাযথভাবে মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছিলাম। কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তিগুলো গোপন আঁতাতের মাধ্যমে নানাবিধ ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ পরিচালনা করেছে। ভিত্তিহীন মিথ্যা প্রচারণা করেছে এবং অসত্যের আশ্রয় নিয়েছে। তারা ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কালো টাকা, ভয়ভীতি ও অদৃশ্য শক্তির প্রভাব খাটিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নস্যাৎ করার জন্যে হীন প্রয়াস চালিয়েছে।

দীর্ঘদিনের স্বৈরশাসনের সুবিধাভোগী ও ষড়যন্ত্রকারীরা কালো টাকা আর অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে জনগণের কাছে একটি জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে অশুভ গোপন আঁতাত ও চক্রান্তের মাধ্যমে জনগণের গণতান্ত্রিক প্রত্যাশাকে নস্যাৎ করেছে। এই চক্রান্ত দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষাকে শুধু বানচালই করেনি, গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎকেও অনিশ্চিত করে তুলেছে। এই নির্বাচনি ফলাফল জাতির জন্যে শুভ ফলাফল কোনোমতেই বয়ে আনতে পারে না। গত ১৫

বছরের ন্যায় মানুষের ভোট ভাত ও মৌলিক মানবাধিকার অশুভ শক্তির বলয়ে বন্দি হয়ে পড়বে। আমরা গণতন্ত্রকে স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনে গণতন্ত্রপ্রিয় দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা,

দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে জনগণের অধিকারকে কুক্ষিগত করার হীন পন্থা অবলম্বনের খবর আমাদের কাছে আসতে শুরু করেছে। আমরা আমাদের জেলা নেতৃবৃন্দকে আগামী ৫ দিনের মধ্যে নির্বাচনকালে চিহ্নিত ষড়যন্ত্রকারীদের কার্যক্রমের উপর সার্বিক প্রতিবেদন পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছি। আমরা আশা করি আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তার পূর্ণ বিবরণ জাতির কাছে তুলে ধরতে সক্ষম হব।

আমি নির্বাচন চলাকালে ঢাকায় সংগঠিত কয়েকটি ঘটনা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এই কয়েকটি ঘটনা থেকেই ভুয়া ভোটার সংগ্রহ, ভোট ক্রয় এবং ভোট কেন্দ্র দখল করে ভোটদানের দৃষ্টান্তের প্রমাণ পাওয়া যাবে।

১. নজরুল শিক্ষালয় ভোট কেন্দ্রের ৫ নং বুথে ২ জন জাল ভোটদাতা আওয়ামী লীগ এজেন্ট কর্তৃক ধৃত হওয়ার পর অনুসন্ধান করে দেখা গেছে ভোটার ক্রমিক নং ১৮৬২ থেকে ২৩২৬ পর্যন্ত ভোটারের নাম ভুয়া এবং ঐ ঠিকানায় ঐ নামের কোনো লোকই বাস করে না। নজরুল শিক্ষালয় কেন্দ্র, ইস্কাটন লেডিজ ক্লাব, মনু মিয়া স্কুল কেন্দ্র, পোস্টার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে আওয়ামী লীগ পোলিং এজেন্টরা অনেক জাল ভোট প্রদানকারীদের ধরিয়ে দিলেও তাদের ছেড়ে দেয়া হয়। এমনকি তারা ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করে ভোটারদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে।

২. সেগুনবাগিচা বয়েজ স্কুল কেন্দ্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের ভয়ভীতি দেখিয়ে ভোটপ্রদানে বিরত করে। তাঁতি বাজার, শাঁখারিবাজার, সূত্রাপুর, রায়েরবাজার এলকায়ও এ ঘটনা ঘটে।

৩. চম্পাতলি লেনের ভোট কেন্দ্রে এবং ইসলামিয়া হাই স্কুলের ভোট কেন্দ্রে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা সন্ত্রাস চালিয়ে ভোটারদের ভোট প্রদানে বাঁধা দিয়েছে, অন্যদিকে জাল ভোট প্রদান করেছে। ইসলামিয়া হাই স্কুলে সকালের দিকেই সন্ত্রাস চালিয়ে ভোটারদের তাড়িয়ে দেয় এবং সকাল সাড়ে ১০টার মধ্যে ১০০০ ভোট প্রদান করে। সেখানে উপস্থিত নির্বাচন পর্যবেক্ষণ কমিটির সদস্যরা কোনো প্রকৃত ভোটারকে দেখেননি। কোনো কোনো কেন্দ্রে শান্তিরক্ষা কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিরা পর্যন্ত সন্ত্রাস সৃষ্টিকারীদের সাহায্য করেছে এবং এই সমস্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে পত্র দিয়ে জানিয়েও তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিকার পাওয়া যায়নি। ঢাকা মহানগরীর বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে প্রকৃত ভোটারদের পর্যন্ত ভোট দিতে দেয়া হয়নি। ভোটার তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রেও অসততার আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

এই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আমি বলতে চাই যে, ঢাকা মহানগরীতে আচরণবিধি পরিপূর্ণভাবে লংঘন করে নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে অশুভ শক্তি সফল হয়েছে এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা একই অবস্থার সৃষ্টি করে নির্বাচনের প্রত্যাশিত

ফলকে উল্টিয়ে দিয়েছে। আওয়ামী লীগ স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে গত ১৫ বছর জনতার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে আপোসহীন সংগ্রাম করেছে। এই স্বৈরাচারবিরোধী সংগ্রামে আমাদের বহু নেতা, কর্মী নিজেদের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন। বাংলাদেশের জনগণ আওয়ামী লীগ ও তার নেতৃত্বাধীন জোটকে ভোট প্রদান করেনি তা কিছুতেই বিশ্বাস করে না। আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই যে, ভোটার জনসাধারণ আমাদিগকেই ভোট প্রদান করেছে, কিন্তু চিহ্নিত অগণতান্ত্রিক শক্তি সূক্ষ্ম কারচুপি করে আমাদের বঞ্চিত করেছে।

আমরা ন্যায় ও সত্যের জন্য সংগ্রাম করছি। ষড়যন্ত্র চলিয়ে এই সংগ্রামকে নস্যাৎ করা যাবে না। জনতার ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে ষড়যন্ত্রকারীদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এই দেশের বুকে যতদিন পর্যন্ত গণমানুষের অধিকার তথা জনগণের ভোটে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে না পারব, ততদিন পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম বিরামহীন ভাবে এগিয়ে যাবে।

পরিশেষে আমি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত দেশবাসী, জনগণকে আমাদেরকে ভোট দেয়ার জন্যে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আগামী দিনে তাদের সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছি।

জয় বাংলা—জয় বঙ্গবন্ধু

২৮.২.৯১ তারিখে জাতীয় সংসদ নির্বাচনোত্তর সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্য

সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্রে উত্তরণ

মাননীয় স্পীকার,

দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে আমরা গনতন্ত্রের পথে উত্তরণ করেছি। আমাদের একটা লক্ষ্য ছিল যে, আমরা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার গঠনের মধ্য দিয়ে দেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেব। যে গণতন্ত্র হবে নির্ভেজাল গণতন্ত্র। এই দ্বাদশ সংশোধনী বিলের উপর আমাদের অনেক amendment আছে। এখানে কতগুলি বিষয়ে আমরা শুরুতেই আপত্তি করেছিলাম, যেমন— ৫৬, ৭০-এর (খ) ১১৯, ১৪২ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে অর্থাৎ সেখানে ছিল referendum এর ব্যাপার, technocrate, floor crossing এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের গোপন ব্যালট। আমরা অনুরোধ করেছিলাম, বিষয়গুলি আর একটু উন্নত করতে। সংবিধান সংশোধনীকে আরও উন্নত করার জন্য কতগুলি সংশোধনী আপনারা গ্রহণ করেছেন, এর জন্য ধন্যবাদ জানাই। এটা আরও উন্নত হয়েছে, আমরা বিশ্বাস করি। সঙ্গে সঙ্গে আমি এও বিশ্বাস করি যে, আজকে দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার জন্য আমরা এই সংশোধনী এ অবস্থায় আপাতত মেনে নিচ্ছি, তবে আমরা আশা করব যে আমাদের ভবিষ্যৎ generation-এর জন্য আগামীতে গণতন্ত্র অনুশীলন করতে গিয়ে কখনো কোনো বাধা না আসে, কখনো কোনো অসুবিধায় পড়তে না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রেখেই এবং গণতন্ত্রকে আরও উন্নতমানের করার জন্য— এই কয়েকটি বিষয়ে আমাদের আপত্তি রয়েছে।

তার পরেও আপত্তিসহ আমরা মেনে নিচ্ছ, তার কারণ, জাতির কাছে এসব আমাদের ওয়াদা ছিল, যে, আমরা সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব, নির্বাচনের সময়ও আমরা ওয়াদা করেছিলাম জাতির কাছে, যে, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক ধারা সূচিত করব।

মাননীয় স্পীকার,

এবার একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, আজকে ৬ই আগস্ট ১৯৯১। আপনার মাধ্যমে সকলকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ১৯৯০ সালের ৬ই নভেম্বর, পান্থপথের জনসভায় প্রথম আমি ঘোষণা করেছিলাম, সংবিধানের ৫১ এবং ৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়। যখন তদানীন্তন স্বৈরাচারী সরকার প্রশ্ন তুলেছিল, সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো পথ নেই। যে পথ আমরা ৬ই নভেম্বর দেখিয়েছিলাম, ১৯৯০ সনের ৬ই ডিসেম্বর, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে

আমরা সফল হই। ৬ই ডিসেম্বর, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা নেন। আজকে ৬ই আগস্ট জাতির কাছে দেওয়া সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছি। আমি মনে করি এটা একটা ঐতিহাসিক দিন।

আপনারা জানেন, সম্পূর্ণভাবে নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য এবং বিলটিকে সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করার জন্য আমরা এনেছিলাম। যেহেতু আমি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি, দেশ ও জাতিকে ভালবাসি, দেশের মঙ্গলের স্বার্থে কিছু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমরা এটা মেনে নিচ্ছি। তবে, আমি আশা করব, আগামী দিনে গণতন্ত্রকে আরও গতিশীল করার জন্য আরও উন্নত করা হবে। যাতে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় সেটাই আমরা প্রতিষ্ঠা করব। আজকে আমরা এটাই প্রমাণ করেছি, ballot is powerful than bullet— আশা করব, এটা আরও প্রতিষ্ঠিত হবে, আরও শক্তিশালী হবে। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আপনাদের এবং দলমত নির্বিশেষে এই সংসদে যারা উপস্থিত আছেন সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আগামী দিনে গণতন্ত্র আরও গতিশীল করার জন্য সকলে ঐক্যবদ্ধ হবে, সেই সাথে এই সংসদে যারা কাজ করেছে এবং বাছাই কমিটির সদস্যবৃন্দসহ সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই।

আমরা আরও দুটি বিল দিয়েছি— সেটা হচ্ছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার জন্য আর একটা indemnity ordinance রহিতকরণ বিল। আমি আশা করব, আগামী অধিবেশনে এই বিলগুলিও একইভাবে সর্বসম্মতভাবে সকলে গ্রহণ করে, পাস করে দেশ থেকে হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্রের রাজনীতির চিরঅবসান ঘটাবে এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত করবে এবং জাতির কাছে দেওয়া তিন জোটের রূপরেখা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করবে, জনগণের মৌলিক অধিকার, মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে। আমি সংসদের সমস্ত দলের নেতৃবৃন্দ সংসদ নেত্রী, মাননীয় স্পীকার, সকলের কাছে এই আবেদন রাখছি এবং সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ মাননীয় স্পীকার।

সংসদীয় পদ্ধতির সরকার বিল পাশের পূর্বে ৬.৮.৯২ তারিখে জাতীয় সংসদে ভাষণ

আন্তর্জাতিক ক্রাইম অ্যাক্ট ১৯৭৩ অনুসারে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার করতে হবে

অবাক পৃথিবী, অবাক করলে তুমি ঃ

মাননীয় স্পীকার, গত কয়েক দিন ধরে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি, এটা আমাদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, আজ একজন যুদ্ধাপরাধী, স্বীকৃত যুদ্ধাপরাধী হিসেবে যার বিচার হয়েছে; সে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব হারিয়েছে, রাজনীতি করার অধিকার হারিয়েছে, ভোটার তালিকায় যার নাম নেই ভোট দেবার, ভোটে অংশগ্রহণ করবার, সব অধিকার হারিয়েছে। রাজনীতি করার যে অধিকার হারিয়েছিল, আজ স্বাধীনতার এত বছর পর তাকে নিয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে এবং সে যুদ্ধাপরাধী কি না, তার পক্ষে কেউ কেউ কিতাবের পর কিতাব তুলে নিয়ে এমনভাবে ওকালতিতে নেমেছেন— এর প্রতিবাদ বা নিন্দা করবার ভাষা আমার জানা নেই। শুধু সুকান্তের ভাষায় বলতে হয়, "অবাক পৃথিবী, অবাক করলে তুমি!" আমরা বিস্মিত, অবাক, মর্মাহত এবং ব্যথিত হয়েছি। শুধু মনে হয়, আমরা কি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে বাস করছি, নাকি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পরেও বন্ধনীতে কোনো নাম অলিখিতভাবে লিখিত হয়েছে আমরা সেই দেশেই বাস করছি—সে প্রশ্নটাও আজ বারবার মনে জাগছে।

মাননীয় স্পীকার, আজ অনেক কথা বলার আছে, কিন্তু ওকালতির বহর দেখে আজকে সেসব কথা বলতেও যেন নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে। কারণ ন্যক্কারজনকভাবে ওকালতিপনায় একজন যুদ্ধাপরাধীকে রক্ষা করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটা কথা আছে যে, "অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর"—অনেকটা সেই অবস্থায়ই চলে গিয়েছে। কারণ, আজকে এই সংসদে দাঁড়িয়ে ঠিক এইভাবে জামায়াত-এর মতো একটি দল, যে দল স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল, আর তারই নেতা গোলাম আজম একজন যুদ্ধাপরাধী, তার পক্ষে একটি দল ওকালতি করছে, যে দলের নেতাও মুক্তিযুদ্ধ করেছিল। সে দলের দিকে যদি আমি তাকাই, তা হলে আজ বহু চেহারা আমার নজরে পড়ে, যারা কেউ স্বামী হারিয়েছেন, ভাই হারিয়েছেন, বাবা হারিয়েছেন, সেই দলের মধ্য থেকে যখন কথাগুলো আসে, তখন সত্যি কাতর না হয়ে পাথর হওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকে না, মাননীয় স্পীকার।

রাজাকাররা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অংশ ঃ

মাননীয় স্পীকার,

আপনি জানতে চেয়েছেন, আল-বদর, রাজাকার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর auxiliary force (সহযোগী বাহিনী) ছিল কি না। এই প্রশ্ন গতকাল এসেছে। আর আমাদের কোনো কোনো ব্যারিস্টার সাহেবদের বক্তব্য শুনে মাঝে মাঝে ভুলে যাচ্ছিলাম, আমরা কি কোর্টে দাঁড়িয়েছি, না সংসদে বসে আছি ।

রাজাকারবাহিনী auxiliary force ছিল কি না, আমি একজন তার সাক্ষী। তার কারণ হচ্ছে, ১৯৭১ সনে আমার মা, আমার বোন, আমার ভায়েরা, আমার স্বামী, আমার চাচা-চাচী, আমরা সবাই পাকিস্তানি আর্মির হাতে দীর্ঘ দিন বন্দি ছিলাম। এই বন্দি অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজে আমার সন্তান হয়। ধানমণ্ডির ১৮ নম্বর সড়কের একটি বাড়িতে আমরা যখন বন্দি ছিলাম, তখন পাকিস্তানি আর্মির সঙ্গে তাদের মিলিশিয়া বাহিনী আমাদের ঐ বাড়িটি পাহারা দিত। ছাদের উপর কয়েকটি মেশিনগান পাতানো ছিল, বাঙ্কার করা ছিল এবং যুদ্ধ যখন চলছিল, তার একটি পর্যায়ে দেখা গেল পাকিস্তানের সেই মিলিশিয়া বাহিনী, যারা বেলুচ রেজিমেন্টে ছিল তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে, বাংলাদেশের কিছু রাজাকারকে অস্ত্র হাতে নিয়ে পাকিস্তানি মিলিটারিদের সঙ্গে সেই বাড়ি পাহারা দেবার কাজে নিয়োজিত রেখেছিল। রেশনে যে খাবার আসত, তা রাজাকারদের জন্যই আসত। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি অংশ হিসেবে তারাও বাড়ি পাহারা দিত। আমার মনে হয়, এর থেকে জ্বলন্ত প্রমাণ আর কিছু হতে পারে না।

একটি গেজেট নোটিফিকেশনের দিকে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই গেজেটটি ছিল ঃ

১. **The Gazette of Pakistan**

Extraordinary

Published by Authority

ISLAMABAD, TUESDAY, SEPTEMBER 7, 1971.

Government of Pakistan

CABINET SECRETARIAT

(Cabinet Division)

NOTIFICATIONS

Rawalpindi, the 4th September, 1971

No. 103/22/71-Min-Dr. Abdul Motaleb Malik, HQA, assumed charge of the office of Governor of the Province of East Pakistan on and from the afternoon of the 3rd September, 1971.

GHULAM ISHAQ KHAN, HQA,S.PK.CSP

Cabinet Secretary.

অনুবাদঃ

১। পাকিস্তান গেজেট

অতিরিক্ত

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত।

ইসলামাবাদ, মঙ্গলবার, সেপ্টেম্বর ৭, ১৯৭১

পাকিস্তান সরকার,

ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট, ক্যাবিনেট ডিভিশন।

বিজ্ঞপ্তি

রাওয়ালপিন্ডি, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

নম্বর ১০৩/২২/৭১ তারিখ মিন- ডাঃ আবদুল মোতালেব মালিক এইচ.কিউ.এ. ১৯৭১ সালে ৩রা সেপ্টেম্বর অপরাহ্ণ হইতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক গভর্ণর পদে দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন।

গোলাম ইসহাক খান, এইচ কিউ এ, সেতারায়ে পাকিস্তান,
সি এস পি, কেবিনেট সচিব।

2. **MINISTRY OF DEFENCE**

Rawalpindi, the 7th September, 1971

Government of Pakistan

No. 4/8/52/543/PS-IA/3659/D-2A- In exercise of the powers conferred by sub-section (l) and sub-section (3) of Section 5 of the Pakistan Army Act, 1952 (Act No. XXXIX of 1952) the Central Government is pleased to direct that-

(a) all the provisions of the said Act shall, so far as may be, apply to the Razakars raised under the East Pakistan Razakars Ordinance, 1971 (East Pakistan Ordinance No. X of 1971);

(b) the Officer of the Pakistan Army under whose command any member of the Razakars is placed shall exercise the same powers in relation to that member as he is authorised to exercise under the said Act in relation to a member of the Pakistan Army placed under his command;

অনুবাদঃ

২। মিনিষ্ট্রি অব ডিফেন্স

রাওয়ালপিন্ডি, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

পাকিস্তান সরকার

নং ৪/৮/৫২/৫৪৩/পি এস-১ক/৩৬৫৯/ডি-২ক

১৯৫২ সনের পাকিস্তান আর্মি অ্যাক্ট (অ্যাক্ট নং ৩৯/১৯৫২)-এর ৫নং ধারার (১ এবং ৩ উপধারা) প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কেন্দ্রীয় সরকার সন্তুষ্টির সঙ্গে নির্দেশ প্রদান করিতেছে যে,

(ক) উক্ত আইনে সমস্ত ধারাসমূহ, যতদূর সম্ভব, পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অধ্যাদেশ ১৯৭১ (পূর্ব পাকিস্তান অধ্যাদেশ নং ১০/১৯৭১)-এর অধীনে সংগঠিত রাজাকারদের প্রতি প্রযোজ্য।

(খ) পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অফিসার যাহার অধীনে কোন রাজাকারকে ন্যস্ত করা হইবে, তাহার সম্পর্কে তিনি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে ন্যস্ত সদস্যদের প্রতি যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার অধিকারী তদ্রূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

আমার মনে হয় এর বেশি তো আর প্রমাণ করার প্রয়োজন হয় না। সেইসঙ্গে আর একটি বিষয় জনৈক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজাকারের সনদপত্র (যা পাকিস্তান সেনা-অফিসার কর্তৃক প্রদত্ত), আমার মনে হয় মোহাম্মদ নাসিম এটা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। কাজেই এটা আমি আর পুনরুল্লেখ করতে চাই না।

মাননীয় স্পীকার, আজকে যে-কথাটা এসেছে, আমি সে প্রসঙ্গে বলতে চাই যে, এখানে লেখা আছে রাজাকার বাহিনী, এর পর আছে বদর বাহিনী—

"Source reports that Pak. Army has organised and formed Razakar Bahini in East Pakistan.

Badar Bahini : This Bahini is mixed with Punjabi, Bihari and Bengalee. Almost all the persons are educated and well trained. The Bahini, most of the persons, selected from Razakars and Muzahids. Their dress is Milishian. Their monthly salary is Rs. 150/-. This Bahini has been deployed with local Razakars in different districts". - (B.D. Documents Vol. II)

গোলাম আজম নরঘাতক ঃ

মাননীয় স্পীকার, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বিষয় যে এতদিন পর আমাদের প্রমাণ করতে হচ্ছে যে, গোলাম আজম রাজাকার প্রধান ছিলেন কি না। গোলাম আজম যে একজন হত্যাকারী ছিলেন, তার একটি প্রমাণ আমি এখানে দিচ্ছি। হোমনা থানার প্রতিনিধি নিশ্চয়ই এখানে আছেন। কুমিল্লার হোমনা থানার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক জনাব সিরু মিয়া দারোগা ও তার কিশোরপুত্র আনোয়ার কামালকে গোলাম আজমের লিখিত পত্রের নির্দেশে হত্যা করা হয়। সিরু মিয়া দারোগা মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন এবং কুমিল্লা সীমান্ত দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ট্রেনিং ও অপারেশন চালাতেন। '৭১-এর ২৭শে অক্টোবর সিরু মিয়া দারোগা এবং তার একমাত্র কিশোরপুত্র আনোয়ার কামাল মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিং ক্যাম্পে যাওয়ার সময় অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধার সাথে রাজাকারদের হাতে ধরা পড়েন। সিরু মিয়া দারোগা মুক্তিযুদ্ধে অনেক দুঃসাহসিক কাজ করেছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজ তিনি করেছিলেন যে, তিনি আমাদের প্রবাসী বিপ্লবী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের স্ত্রী বেগম তাজউদ্দিনকে সপরিবারে কুমিল্লা সীমান্ত পার করে পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সিরু মিয়াকেও গোলাম আজমের নির্দেশে হত্যা করা হয়েছিল। তার নজির ও প্রমাণ (একখানা কাগজ দেখিয়ে) এই কাগজে রয়েছে। আপনি চাইলে এই কাগজও আমি আপনার কাছে দিতে পারি।

মাননীয় স্পীকার, আজকে আমরা আইন হাতড়ে বেড়াচ্ছি যে কোন আইনে তাকে বিচার করা যায়। এখানে বিএনপি'র ব্যারিস্টার সাহেবরা অনেক কথাই বলেছেন। আজকে আমাদের দলের পক্ষ থেকে আমরা Act XIX মতো ১৯৭৩ (আন্তর্জাতিক

ক্রাইম অ্যাক্ট) উল্লেখ করেছি। এই অ্যাক্টের ধারা অনুযায়ী ট্রাইবুন্যাল গঠন করে এই বিষয়ে বিচার করা যেতে পারে বলে আমাদের সদস্যরা যে প্রস্তাব রেখেছেন, সরকার পক্ষ থেকে এর বিরুদ্ধে নানারকম অজুহাত দেখাচ্ছেন। গোলাম আজম একজন নরঘাতক। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে যারা বিশ্বাস করে তাদের মনে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে, এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমরা জানি, অন্তত এ বিষয়ে কারও মনে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রকৃত অপরাধীদের ক্ষমা করা হয়নি ঃ

আজকে এই সরকার একটা কথা বলছে যে, আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমা করেছিল। হাঁ, মাননীয় স্পীকার, ক্ষমা করেছিল। কিন্তু কেন ক্ষমা করা হয়েছিল ? মাননীয় স্পীকার, আপনি জানেন যে বঙ্গবন্ধু কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় ৩৭ হাজার দালাল বন্দি হয়। এবং এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর প্রায় ২৬ হাজার দালাল মুক্তি পায়। তার পরও ১১ হাজার দালাল তখনও বন্দি ছিল এবং তাদের বিচারকাজ চলছিল। এর মধ্যে অনেক বন্দি সাজাপ্রাপ্ত ছিল। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি এইসব সাজাপ্রাপ্ত বন্দিরা এই স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর পদও অলঙ্কৃত করেছেন।

মাননীয় স্পীকার, আজকে বলা হয় আওয়ামী লীগ এইসব দালালদের সাজা দেয়ার জন্য কিছুই করেনি। আওয়ামী লীগ ত্রিপক্ষীয় চুক্তি করে যে Clemency (ক্ষমা) দিয়েছিল, সে কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু সেটা কেন করতে হয়েছিল ? সেইসব বন্দির মুক্তির বিনিময়ে কাদেরকে ফেরত আনা হয়েছিল ?

মাননীয় স্পীকার, আপনি জানেন, দেশবাসী নিশ্চয় তা জানে। সেই সময় প্রায় চার লক্ষ বাঙালি পাকিস্তানে বন্দি অবস্থায় ছিল। তাদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজন বাঙালিদের ফিরিয়ে আনার জন্য রাস্তায় নেমেছিল, বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়েছিল। আমাদের কাছে এসেও তাদের আত্মীয়স্বজন অনেকে কান্নাকাটি করেছেন। এইরকম একটা অবস্থায় সেইসব বাঙালিকে ফিরিয়ে আনার জন্যই এই Clemency (ক্ষমা) দেয়া হয়েছিল। এদেশে ফেরত আসতে পেরেছিলেন আজকে যিনি আমাদের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নুরুদ্দিন, আজকে যিনি বিডি আর প্রধান জেনারেল লতিফ এবং জেনারেল মাহমুদুল হাসান, জেনারেল সালামসহ অনেকেই। আজকে এখানে মন্ত্রীদের সারিতে বসে আছেন মজিদ-উল-হক সাহেব, মোস্তাফিজুর রহমান সাহেব, সেদিন সেই ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হয়েছিল বলেই তারা এদেশে ফেরত আসতে পেরেছিলেন এবং আমি মনে করি, তারা সকলেই বঙ্গবন্ধুর সেই প্রচেষ্টার কথা আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবেন এবং বলবেন Clemency (ক্ষমা) দিয়ে বঙ্গবন্ধু ভুল করেননি। কিন্তু Clemency (ক্ষমা) দিলেই যে বিচার করা যাবে না, এমন তো কোনো কথা নেই। এদের বিচার করার জন্য তো বঙ্গবন্ধু অ্যাক্ট করে রেখেছিলেন, সেটা হল Act XIX of 1973 (আন্তর্জাতিক ক্রাইম অ্যাক্ট)এবং সংবিধানের ৪৭ (৩) অনুচ্ছেদে স্পস্ট বিধান রয়েছে যে এদের বিচার করা

যাবে। সাধারণ ক্ষমা করার ব্যাপারে আরও কিছু কারণ ছিল। মাননীয় স্পীকার, আপনি সেসব কথা জানেন। কেননা আপনি নিজেও একজন মুক্তিযোদ্ধা। এই দেশে যে মুক্তিযুদ্ধ হয় সেটা গেরিলা যুদ্ধ ছিল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, বাড়ির একজনকে কোনো একটা পদে রেখে সেই বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা তাদের যুদ্ধ পরিচালনা করেছে এবং এই ধরনের যে সমস্ত কেস ছিল, যারা প্রকৃতপক্ষে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে, তাদেরকেই বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা করেছিলেন। কিন্তু যারা সত্যিকার যুদ্ধাপরাধী, বিশেষ করে যারা গণহত্যা চালিয়েছে, যারা লুটতরাজ করেছে, যারা নারীধর্ষণ করেছে, যারা অগ্নিসংযোগ করেছে— তাদেরকে কিন্তু ক্ষমা করা হয়নি। এই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য—

* ১৯৭২ সালের ২৪শে জানুয়ারি বাংলাদেশ দালাল আইন জারি করা হয় P. O. No. VIII of 1972.

* ১৯৭২ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি স্ব-স্ব জেলা কোর্টে অধ্যাপক গোলাম আজম গংদের হাজির হওয়ার নির্দেশ জারি হয়েছিল।

* ১৯৭২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন জারি করা হয়। P. O. No. 149 of 1972.

* ১৯৭৩ সালের ১৮ই এপ্রিল গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গোলাম আজম গংদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়।

* ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধানের ১২ ও ৩৮ অনুচ্ছেদ মোতাবেক ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা রহিত করা হয় ।

* ৬৬ ও ১২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দালালদের ভোটাধিকার ও সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার বাতিল করা হয়।

* ১৯৭৩ সনের ৩০শে নভেম্বর বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

কিন্তু প্রকৃত অপরাধীদের, আমি আগেই বলেছি, যারা গণহত্যা করেছে, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ করেছে— সেইসব অপরাধীদের ক্ষমা করা হয়নি। এই আইনগুলো বঙ্গবন্ধু করেছিলেন।

মাননীয় স্পীকার,তবে যেহেতু সময়ের অভাব, আমি বেশি সময় নেব না। এখানে একটি বই পাবলিশ করা হয়েছিল "WAR CRIMES AND GENOCIDE : The trial of Pakistan war criminal". এই বইটির ভেতর আপনি পাবেন কী ভাবে বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীরা তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড চালিয়েছিল। এর মাধ্যমে সারা দেশ এবং বিশ্বে এটা প্রচার করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। WAR CRIME AND BANGLADESH— The details of humanity and justice, এগুলোতে যারা ওয়ার ক্রাইম করেছিল তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ব্যাপক হারে প্রচার করে তাদের চরিত্র তুলে ধরার ব্যবস্থা তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকার করেছিল। আরও একটি বই রয়েছে "THOUSAND MYLAIS" বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অপরাধের সমস্ত বর্ণনা

এখানে আছে। এর মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সে সময়ে এই যুদ্ধাপরাধীদের চিত্র তুলে ধরেছিল, আওয়ামী লীগ বিচারের ব্যবস্থা নিয়েছিল। কিন্তু সেই ব্যবস্থা রহিত করা হল কখন?

মার্শাল ল জারির মাধ্যমে ঃ

মাননীয় স্পীকার, ১৯৭৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর 'দালাল আইন' বাতিল করা হয়— Ordinance No. 63 of 1975 .

* এর পরে ১৯৭৫ সালের ৩১শে ডিসেম্বর Second Proclamation Order No. 3 of 1975 প্রথম তফসিল থেকে বাংলাদেশ দালাল আইনের যে সেফগার্ড ছিল তা তুলে দেওয়া হয়।

* এর পর ১৯৭৬ সালে Second Proclamation Order No. 3 of 1976 জারি করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার লক্ষ্যে সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের শর্তাদি তুলে দেওয়া হয়।

* Second Proclamation (ঘোষণা) জারি করে সংবিধানের ১২২ অনুচ্ছেদ তুলে দিয়ে দালালদের ভোটার হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়।

* Proclamation Order No. 1 of 1977 জারি করে সংসদে নির্বাচিত হওয়ার লক্ষ্যে সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের কিছু অংশ তুলে দেওয়া হয়।

* ১৯৭৬ সালের ১৮ই জানুয়ারি নাগরিকত্ব ফেরত পাবার জন্য মন্ত্রণালয় হতে আবেদন করতে বলা হয়।

* এবং Proclamation Order No.1 of 1977 দ্বারা সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদ তুলে দেওয়া হয়।

এখানে আমি একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, মাননীয় স্পীকার, এ সবকিছুই করা হয়েছিল কোনো সংসদের মাধ্যমে নয়, বরং মার্শাল ল অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে।

গণআদালতের বৈধ্যতা ঃ

মাননীয় স্পীকার, এই সংসদে প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে গণআদালতের সাংবিধানিক ভিত্তি কোথায়। এই সংবিধান আমাদের পবিত্র আমানত। এই সংবিধানের বরাত দিয়ে কোনো একজন বক্তা দেখাতে বলেছেন যে, এই সংবিধানের কোথায় গণআদালতের কথা লেখা আছে। এর উত্তরে আমি যদি প্রশ্ন করি, এই সংবিধানের কোথায় মার্শাল ল জারি করার কথা লেখা আছে, মাননীয় স্পীকার? কী জবাব তাঁরা দেবেন? এই সংবিধানে কোথাও কি আছে মার্শাল ল জারি করা যায়? মার্শাল ল সম্পর্কে এই সংবিধানের কোথাও কিছু নেই। সাংবিধানিকভাবে মার্শাল ল জারি করার কোনো ব্যবস্থাই এই সংবিধানে লেখা নাই, মাননীয় স্পীকার। তাহলে দালালদের বিচারের জন্য যে-সমস্ত আইন করা হল, মার্শাল ল proclamation (ঘোষণা)-এর মাধ্যমে এবং মার্শাল ল অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে তার যে সংশোধন করা হল এবং পরবর্তীকালে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এই সংবিধানে যা ratify (অনুমোদন) করা হল সেটা কি illegal (অবৈধ) নয়, মাননীয় স্পীকার?

আজ যদি গণআদালত সংবিধানবহির্ভূত হয় মার্শাল ল-ও সংবিধানবহির্ভূত। কিন্তু গণআদালতকে আজকে যারা সংবিধানবহির্ভূত বলছেন তাঁদের কাছে আমার কয়েকটি প্রশ্ন। মাননীয় স্পীকার, বিএনপি বলেছে, এরশাদ অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছে। এ কথাটা কিন্তু জনসম্মুখে সর্বপ্রথম আমিই এনেছিলাম। কারণ আমি বলেছিলাম, এরশাদ মার্শাল ল জারি করে ক্ষমতা দখল করেছে। কাজেই মর্শাল ল জারি করা সংবিধান বহির্ভূত হওয়াতে তাঁর ক্ষমতা দখল অবৈধ। এরশাদ অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছে, বিএনপিও সেকথা বলেছে। কিন্তু আজকে আপনার মাধ্যমে বিএনপি সরকারের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই যে, এরশাদ অবৈধভাবে ক্ষমতা যখন দখল করল, আপনারা তো সেজন্য কোর্টে গেলেন না? আপনারা সেসময় কোর্টে না গিয়ে গিয়েছেন গণআদালতে জনগণের কাছে। তখন জনগণের কাছে আপনারা বিচার দিয়েছিলেন এবং জনগণের কাছে গিয়েই আপনারা দাঁড়িয়েছিলেন এবং জনগণের রায় নিয়েছেন। তারা (বিএনপি) জনগণের নিকট গিয়েছিলেন, ঠিকই করেছিলেন, আমরা আপত্তি করি না।

সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ ঃ

মাননীয় স্পীকার, আমাদের সংবিধানের ৭ম অনুচ্ছেদে লেখা আছে ঃ " প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ,"— কাজেই জনগণ হচ্ছে সুপ্রীম অথরিটি, তার উপর আর কিছু নেই। আজকে জনগণের কাছে যাওয়াটা মোটেই অপরাধমূলক নয়। শুধু তাই নয়,মাননীয় স্পীকার, আমার তারিখটা মনে নেই। রশিদ নামে এক লোক পাতাবাহারের ডাল ভেঙে আমাদের বেগম জিয়ার ছেলেকে হত্যা করতে গিয়েছিল এবং তারপরে বেগম জিয়া গুলিস্তান চত্বরে বক্তব্য দিয়েছিলেন এবং সেখানে তিনি জেনারেল এরশাদকে তাঁর স্বামীহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন। সেখানেও আমি বলব যে, তিনি জেনারেল এরশাদকে স্বামীহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করে কোর্টে যাননি, গিয়েছিলেন গণআদালতে— জনগণের কাছে এবং সেদিন তিনি জনগণকে আহ্বান করে বলেছিলেন যে, আমি আজ আপনাদের কাছে বিচার চাই এবং আপনাদের কাছে নালিশ করতে এসেছি। তিনিও কিন্তু জনগণের কাছে গিয়েছিলেন, কোর্টে যান নাই।

মাননীয় স্পীকার, আজ গণআদালত যারা করেছেন তারা কারা আপনারা জানেন। গণআদালতের সদস্যবৃন্দ হলেন ঃ জাহানারা ইমাম চেয়ারপার্সন, অ্যাডভোকেট গাজীউল হক সদস্য, ডঃ আহমেদ শরীফ, স্থপতি মাজহারুল ইসলাম, ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, ফয়েজ আহমেদ, কবীর চৌধুরী, কলিম শরাফী, মাওলানা আবদুল আউয়াল, লেঃ কঃ (অবঃ) কাজী নুরুজ্জামান, লেঃ কঃ(অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী, ব্যারিস্টার শওকত আলী খান। মাননীয় স্পীকার, তারা গণআদালত করেছেন। গণআদালত-মোকদ্দমা নম্বর ১/১৯৯২। এখানে তাঁরা আসামী করেছেন গোলাম আযমকে, পিতা— মাওলানা গোলাম কবীর, সাকিন পাকিস্তান।

মাননীয় স্পীকার, তাঁরা গণআদালত করে আপনার কাছে এসেছিলেন এবং আপনিও তাঁদের অনুমতি দিয়েছেন। তাঁরা সংসদ নেত্রীর কাছেও গিয়েছিলেন, তিনিও

কিন্তু দেখা করেছেন, স্বীকৃতি দিয়েই দেখা করেছেন। তারা আমার কাছে এসেছিলেন, আমি তো স্বীকৃতি দিয়েই রেখেছি। আজকে গণআদালত যদি বেআইনি হবে, জনগণের ইচ্ছা যদি বেআইনিই হবে, তাকে আপনারাই তো স্বীকৃতি দিয়েছেন, অস্বীকার তো করতে পারেন না, মাননীয় স্পীকার।

মাননীয় স্পীকার, আজকে দুঃখ হয়, যখন দেখি যে, আমার সামনে যাঁরা আছেন তাঁরা জনগণকেই অস্বীকার করতে চাচ্ছেন। কী করে ভুলে যান যে, আজকে আমরা যারা আছি তারা জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে এসেছি!

মাননীয় স্পীকার, যেদিন আমরা আন্দোলনের মাধ্যমে বলেছিলাম যে, এরশাদ সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে এবং আমার মনে আছে আমিই প্রথম ৬ই নভেম্বর, ১৯৯০ সালে পান্থপথে (জনসভায়) সংবিধানের ধারা উল্লেখ করে বলেছিলাম যে জেনারেল এরশাদকে এই ধারায় পদত্যাগ করতে হবে এবং এভাবে বলেছিলাম এ কারণে যে, আমাদের ব্যারিস্টার মওদুদ সাহেব আর শাহ মোয়াজ্জেম সাহেব বলেছিলেন যে, আজকে যেমন ওনারা (বিএনপি) বলেছেন যে, গণআদালতের কোন ভিত্তি নাই সংবিধানে, মওদুদ সাহেবও বলেছিলেন যে, সংবিধানে এইরকম কোনো বিধান নাই যে, কোনো নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার গঠন হতে পারে। এ কথাও বলেছিলেন যে, ক্ষমতায় কি আমরা জিরো পয়েন্টে দিয়ে আসব'?

এমনকি ৪ঠা ডিসেম্বর বায়তুল মোকাররমে দাঁড়িয়ে বিকেলবেলা মিটিংএ আমি এই কথা বলেছিলাম যে সংবিধানের এই এই ধারা মতে পদত্যাগ করতে হবে— ক্ষমতা কোথায় দেবেন, আমরা দেখিয়ে দিচ্ছি— এখানে দেবেন। দরজা খুলে দিচ্ছি, এই সিঁড়ি দিয়ে পার হয়ে জেনারেল এরশাদকে ক্ষমতা থেকে নেমে যেতে হবে। সেটা ছিল জনগণের রায়। জনগণের রায়েই সেদিন জেনারেল এরশাদকে আমার নির্দেশিত পথেই সেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হতে হয়েছিল। কিন্তু সেই দিনও জাতীয় পার্টি বলেছিল, এটার কোন ভিত্তি আছে? এটা কীভাবে হয়? কীভাবে হয় সেটা কিন্তু আমরা দেখিয়ে দিয়েছি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধকে রক্ষা করব ঃ

মাননীয় স্পীকার, আজকেও যারা গণআদালতকে অস্বীকার করতে চায়, আমি তাদের একটি কথাই বলতে চাই, আমরা আন্দোলন সংগ্রামের সময় বারবার অঙ্গীকার করেছি, এমনকি তিন জোটের যে-রূপরেখা সেই রূপরেখায়ও আমরা উল্লেখ করেছি যে, আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমূহ রাখব, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মূল্যবোধকে আমরা রক্ষা করব। আমরা আন্দোলন সংগ্রাম করেছি জনগণের রায় নিয়ে। জনগণকে সামনে নিয়ে। জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে এবং সেই রায়ের ফলে আজকের এই সংসদ। এই সংসদে আজকে যদি প্রশ্ন ওঠে যে গণআদালত বৈধ না অবৈধ, তা হলে জনগণকেই অস্বীকার করা হয়। কিন্তু ক্ষমতার মোহে পড়ে জনগণকে অস্বীকার করলে এর যে ভয়াবহ পরিণতি হবে তার দায়দায়িত্ব আজকে যারা ক্ষমতায় আছেন তাদেরকেই নিতে হবে।

মাননীয় স্পীকার, একে তো এই বিষয়, তার উপর দেশের অবস্থা অবশ্যই অত্যন্ত নাজুক সেকথা বলার অপেক্ষা রাখে না, যেমন আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা, দ্রব্যমূল্যের অবস্থা, মানুষের না খেয়ে উপবাসে মৃত্যুবরণ, ডায়রিয়ায় মৃত্যুবরণ। নানা জটিলতা এদেশে আছে। এই সমস্যার দিকে আমরা অবশ্যই লক্ষ রাখছি। তার উপর কয়েক দিন আগে পার্বত্য চট্টগ্রামে খাগড়াছড়িতে যে-গণহত্যা চলেছে সে খবরও আমি জানি। আমাদের মাননীয় সদস্য কল্পরঞ্জন চাকমার বক্তব্য আপনি শুনেছেন। তাঁর বক্তব্যকে বিভিন্নভাবে পত্র-পত্রিকায় দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। নানা জটিল সমস্যা আমাদের রয়েছে। সেই সমস্যার সাথে সাথে আজকে যাদের ওকালতি সরকার করছেন, তাদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপে আজ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নাজুক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও সারা বাংলাদেশে এদের সন্ত্রাসী আঘাতের ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মীরা মৃত্যুবরণ করছে, আঘাতপ্রাপ্ত হচ্ছে এবং তারা আরও বেশি সন্ত্রাসী তৎপরতা সৃষ্টি করবে যখন দেখবে যে সরকারি দল তাদেরই পক্ষ হয়ে ওকালতি করে যাচ্ছে। আজকে আমার ভাই মেজর হাফিজ সাহেব অত্যন্ত চমৎকারভাবে বলেছেন যে, যখন আমাদের ব্যারিস্টার সাহেবরা ওকালতি করছিলেন তখন জামায়াতে ইসলামীর কিছু কিছু এমপি সাহেব অত্যন্ত উৎফুল্ল ছিল। ফলে তাদের আর কিছু বলার নাই তাদের (জামায়াত) হয়ে ওকালতি তো তারা (বিএনপি) করেই যাচ্ছেন।

সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতিনীতি মানা হচ্ছে নাঃ

মাননীয় স্পীকার, আমরা ঠিক এই পরিবেশ চাইনি। এই সংসদে আমরা একাদশ-দ্বাদশ সংশোধনী পাস করেছি। সংসদের প্রথম অধিবেশনে আমরা যখন সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা বলতাম, এর বিরুদ্ধে অনেক বক্তব্য এসেছে, নানাভাবে কেতাব খুলে আমাদেরকে আইন দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার, নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে, আবার ভেতরে বাইরে জনগণ এবং আমাদের সংসদ-সদস্যদের আন্দোলন তাঁরা কিন্তু মানতে রাজি হয়েছেন এবং আমি বিশ্বাস করি যদিও একথা আমি বলব যে, আমরা সংসদীয় গণতন্ত্র কায়েম করলেও ঠিক গণতান্ত্রিক ধারা সঠিকভাবে অনুশীলিত হচ্ছে না বা সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতিনীতি তাও সঠিকভাবে এখানে মানা হচ্ছে না। এখানে অনেকটা স্বেচ্ছাচারিতার ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। তার পরেও দীর্ঘদিনের একটা অনভ্যাস বা একটা চর্চার অভাব ছিল বলে আমরা মনে করি যে, ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি ঘটবে এবং তাঁদের উপলব্ধি হবে এবং আপনিও মাননীয় স্পীকার, ধীরে ধীরে উপলব্ধি করবেন যে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চা করতে গেলে ঠিক কীভাবে রীতিনীতি মেনে চলতে হয়, আপনার কাছ থেকেও সেটা আমরা আশা করব।

আসুন, জনগণের রায়কে সম্মান করি ঃ

আপনি শুনেছেন, আমি একটা কথা বলেছি যে, জনগণের রায়কে আমরা সম্মান করি এবং এই গণআদালত যে রায় দিয়েছে তাতে তারা কিন্তু আইন নিজের হাতে তুলে নেয়নি, মাননীয় স্পীকার। যেহেতু তারা আইন নিজের হাতে তুলে নেয়নি সেহেতু

নিশ্চয়ই তাদেরকে বেআইনি বলার কোনো অধিকার নেই, কোনো অবকাশ নেই। তারা কী বলেছেন? বলেছেন যে, গোলাম আজম একজন যুদ্ধাপরাধী। এই যুদ্ধাপরাধীর অপরাধগুলি এখানে (গণআদালতের রায়ের কাগজ দেখিয়ে) লিপিবদ্ধ আছে এবং এই সকল অপরাধে যিনি অপরাধী তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ডতুল্য। আমরা গণঅভ্যুত্থ্যানের মধ্য দিয়ে, সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, জনগণের ম্যান্ডেটের মধ্য দিয়ে এই সংসদে এসেছি। আমি মনে করি, গণআদালতের যে রায়, সেই রায়ে তাঁরা বলেছেন যে, এই অপরাধ মৃত্যুদণ্ডযোগ্য। আজকে এই সংসদে যাঁরা আছেন, যাঁরা আমার সামনে বসে আছেন, তাদের মধ্যে অনেকেই বিগত মুক্তিযুদ্ধে স্বামী হারিয়েছেন, ভাই হারিয়েছেন, মা - বোনেরা লাঞ্ছিত হয়েছেন। যাঁরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তারা দিনের পর দিন না খেয়ে রাইফেল হাতে লড়াই করেছেন। যাঁরা নয়টি মাস অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে নিজের জীবনকে বাজি রেখে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এই দেশ স্বাধীন করেছেন, আপনার মাধ্যমে আজ তাঁদের কাছেও আমার আবেদন যে, আজকে দলমত নির্বিশেষে সমস্ত তর্ক-বিতর্কের উর্ধ্বে উঠে আসুন, আমরা সকলে মিলে জনগণের এই রায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি। এখানে কে কতটুকু করেছেন, না করেছেন, সে বিতর্ক করে আজকে কোনো ফল হবে না। আপনারা যদি মনে করে থাকেন যে, আওয়ামী লীগ করেনি, তা হলে আমার প্রশ্ন যে মার্শাল ল Proclamation (ঘোষণা) দিয়ে সেই আইনগুলিকে তুলে না দিয়ে আপনারাই বা কেন বিচার করেননি? আপনারা কেন এদেরকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন? আজকে এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে স্বাধীনতার ২১ বছর পর সমগ্র জাতিকে কেন আপনারা এই বিতর্কের ভিতর ঠেলে দিলেন? তাই আমার আবেদন মাননীয় স্পীকার, এখনও সময় আছে দলমত নির্বিশেষে সব কিছুর উর্ধ্বে উঠে আসুন, যেভাবে ঐকমত্য হয়ে আমরা একাদশ সংশোধনী, দ্বাদশ সংশোধনী পাস করেছি, আসুন, সেভাবে কাজ করি। যারা স্বজন হারিয়েছেন, স্বজন হারানোর বেদনায় যাঁদের হৃদয় এখনো ব্যথিত, আসুন আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিই। এই রায়কে বাস্তবায়ন করার জন্য মাননীয় স্পীকার, আমরা মনে করি যে প্রচলিত আইনই (আন্তর্জাতিক ক্রাইম অ্যাক্ট,'৭৩) যথেষ্ট। তবু যদি আপনি মনে করেন যে, আইনের কোনো ঘাটতি আছে, সেই ঘাটতিটুকু এই মহান সংসদ অবশ্যই পূরণ করতে পারে।

গোলাম আজম ও সহযোগীদের বিচার করতে হবেঃ

এই মহান সংসদের সে অধিকার রয়েছে। জাতি সেই অধিকার দিয়েছে। এই সংসদ সার্বভৌম সংসদ। সেই লক্ষ্যে—একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ, যুদ্ধ ও গণহত্যাসহ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধসাধন, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার পরও পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধারের সাথে জড়িত থেকে বাংলাদেশের বিরোধিতা, বিদেশি নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে বেআইনি রাজনৈতিক তৎপরতায় লিপ্ত পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে ১৯৯২ সালের ২৬শে মার্চ জনগণের যে মতামত প্রতিফলিত হয়েছে তাকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ

জাতীয় সংসদ আন্তর্জাতিক ক্রাইম অ্যাক্ট ১৯৭৩ (Act of XIX of 1973) অনুসারে ট্রাইবুন্যাল গঠন করে, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সম্পর্কে বিচারের জন্য আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আমি আপনার মাধ্যমে এই সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে গোলাম আজম ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে মামলা দায়ের ও বিচারের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব রাখছি। একই সঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে জনগণের ঐ মতামত প্রতিফলনকারী গণআদালতের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে জারিকৃত অসম্মানজনক মামলা দায়ের করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ঐ মামলা প্রত্যাহারের জন্য আমি আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

সরকার মুক্তিযুদ্ধের উপর কলঙ্কজনক অধ্যায় লেপন করেছেনঃ

আমি আগেই আপনাদের কাছে নাম বলেছি, এদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা আনা হয়েছে। জাহানারা ইমাম একজন মুক্তিযোদ্ধার মা, যিনি নিজের সন্তানকে বলেছিলেন — 'যাও তোমাকে কোরবানী করে দিলাম মুক্তিযুদ্ধের জন্য'— এই কথা বলে তিনি নিজের সন্তানকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। তিনি স্বামী হারিয়েছেন। তিনি অসুস্থ, ক্যান্সার তাঁর শরীর আজ কুরে কুরে খাচ্ছে। তার পরেও সেই অসুস্থ শরীর নিয়ে গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে আজকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন শত শহিদের, শত লাঞ্ছিত মা-বোনের কান্না যেখানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আজকে তাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা, এটা বাঙালি জাতি মেনে নিতে পারে না। আমি মনে করি, তাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে বর্তমান সরকার স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের উপর একটা কলঙ্কজনক অধ্যায় লেপন করেছেন।

কাজেই, আপনার মাধ্যমে তাঁদের কাছে আমার আবেদন থাকবে যে, এই মামলা তাঁরা অচিরেই যেন প্রত্যাহার করে নেন। যারা যুদ্ধাপরাধী তাদের বিরুদ্ধে সরকার রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা করেনি,— আর করল কিনা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে! এটা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। এটা আমি আজকে প্রস্তাবাকারে উপস্থাপন করলাম এবং আপনার কাছেও আমি এই কপি প্রস্তাবাকারে প্রেরণ করছি।

গোলাম আজম সংক্রান্ত সাধারণ আলোচনার প্রেক্ষিতে বিরোধী দলীয় নেত্রীর উত্থাপিত প্রস্তাব ঃ

"একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ, যুদ্ধ ও গণহত্যাসহ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ সাধন, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার পরও পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধারের নামে বাংলাদেশের বিরোধিতা, নিবন্ধিকৃত বিদেশি নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে বেআইনি তৎপরতায় লিপ্ত পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আজমের বিরুদ্ধে ১৯৯২-এর ২৬শে মার্চের গণআদালতে জনগণের যে মতামত প্রতিফলিত হয়েছে, তাকে প্রতিফলন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ আন্তর্জাতিক ক্রাইম (ট্রাইবুনাল) অ্যাক্ট ১৯৭৩ অনুসারে ট্রাইবুনাল গঠন করে গোলাম আজমের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ বিচারের আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সরকারের

প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। এই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় গোলাম আজম ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে প্রসিকিউশান ও বিচারের ব্যবস্থা করবে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ জনগণের মতামত প্রতিফলনকারী গণআদালতের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অসম্মানজনক মামলা দায়েরের জন্য দুঃখ প্রকাশ করছে এবং ঐ মামলা প্রত্যাহারের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।"

আমি আশা করি,আর কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বে না থেকে শত শহিদের আত্মার প্রতি সম্মান জানিয়ে লাখো লাঞ্ছিত মা-বোনের ইজ্জতের প্রতি সম্মান জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও লক্ষ্যকে প্রতিষ্ঠিত রেখে একটা নরঘাতক গোলাম আজমের বিচারের প্রশ্নে আর কোনো দ্বিমত কেউ রাখবেন না। এই আশা পোষণ করে আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

১৬-৪-৯২ তারিখে গোলাম আজম ও গণআদালত প্রসঙ্গে জাতীয় সংসদে প্রদত্ত ভাষণ

জনগণের কল্যাণ সাধনই আমাদের লক্ষ্য

মাননীয় রাষ্ট্রদূতবৃন্দ, ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ,

সম্মানিত এই সভায় বক্তব্য রাখার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এর পূর্বেও আপনাদের অনেকের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কিন্তু আজকের অনুষ্ঠিত ফোরামে আপনাদের নিকট বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক দর্শন উপস্থাপনের দুর্লভ সুযোগ আমার এবং পার্টির জন্য এক স্মরণীয় ঘটনা। কিছু বলার পূর্বে, সবার আগে আজকে আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ ও আমার প্রতি যে আতিথেয়তা প্রদর্শন করা হয়েছে তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি —যা আমার স্মৃতিতে জাগরূক থাকবে।

সম্মানিত অভ্যাগতবৃন্দ,

দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের কষ্টার্জিত পথে বাংলাদেশ আজ যে রাজনৈতিক প্রত্যাশায় উপনীত হয়েছে তা বিগত ১৯৭৫-এর ১৫ই অগাস্ট হতে ১৯৯০ সন পর্যন্ত -- এই দীর্ঘ পনের বছর কতিপয় স্বৈরশাসক কর্তৃক অবরুদ্ধ ছিল। জাতীয় এই প্রত্যাশার প্রেক্ষিতে আমাদের অবশ্যই বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে এই অর্জিত সুযোগ আমরা কত সুন্দর ও সার্থকভাবে কাজে লাগাতে পারি। বর্তমানে বিরাজমান অবস্থায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ইতিবাচক অবদান রাখবে এবং ভবিষ্যতেও রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য ইদানীং অর্জিত বহুদলীয় সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অপরিহার্য। একই সাথে আমরা এও বিশ্বাস করি যে, শুধুমাত্র জাতীয় পর্যায়ের উপরিস্তরে সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চাই যথেষ্ট নয়—নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক বিভিন্ন স্থানীয় স্বশাসিত সরকারগুলোর সঙ্গে এর সম্পৃক্তিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে হবে। দেশের প্রধান বিরোধী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের এই লক্ষ্য অর্জনে অনির্বাণ আকাঙ্ক্ষা ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টের ভেতরে এবং বাইরের কিছু রাজনৈতিক দলের মতো বিশেষ কোনো গোষ্ঠী বা সরকারি এজেন্ট দ্বারা তাদের অর্থে, আনুকূল্যে বা নির্দেশে কিংবা ভিন্ন মতাদর্শগত বৈপরীত্যশীল রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের প্রলুব্ধকরণের মাধ্যমে তৈরি হয়নি।

আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে আদর্শে উদ্বুদ্ধ উৎসর্গীকৃত, আত্মনিবেদিত কতিপয় ব্যক্তি যারা স্বৈরতন্ত্র, ধর্মান্ধ মৌলবাদ ও গণবিরোধী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সংগঠিত করেছিলেন। আওয়ামী লীগ একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল হিসেবে সর্বদাই জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জনগণের সামনের কাতারে থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশ্নে আওয়ামী লীগ পুনঃ পুনঃ জনগণের

দ্ব্যর্থহীন রায় ও ম্যান্ডেট পেয়েছে, কিন্তু স্বার্থান্বেষী চক্র বহু ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে সেই পবিত্র রায়কে বানচাল করেছে। আমাদের দলের রাজনৈতিক দর্শন হল জনকল্যাণ এবং এ ক্ষেত্রে জনগণ সরাসরি ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে। কিন্তু আমাদের আদর্শগত অঙ্গীকার প্রায়োগিক বাস্তবতার সঙ্গে সমন্বিত। আমাদের নিকট এটাও অপরিহার্য বিবেচ্য বিষয় -- আমরা যেন জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে শুধুমাত্র অধিবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে না পড়ি। পাকিস্তানি শাসনের নিগড় ছিন্ন করে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জ্যাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই অবস্থায় যথার্থভাবেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার মাধ্যমে রক্তে অর্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সংহত করা সম্ভব। এটা ছিলো সময়ের দাবি। সেই সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে সেদিন অর্থনৈতিক নৈরাজ্য ও ধ্বংস থেকে জাতিকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল।

স্বাধীনতার বিশ বছরের জাতীয় ইতিহাসের সচেতন ব্যক্তিবর্গ নিশ্চয় অবগত আছেন যে, আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে আমরা পূর্ণাঙ্গ সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী গ্রহণ করিনি। কেননা ঐ সময়ে আমরা প্রধানত শিল্প ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে রাষ্ট্রায়ত্ত করেছিলাম। এর বাইরে কৃষি ও বাণিজ্যখাত ছিল ব্যক্তিমালিকানায়। এমনকি, শিল্পখাতেও ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ও ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ছিলেন একজন প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। একই সাথে রাষ্ট্রশাসনে সময়ের প্রয়োজন সম্পর্কে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন।

সকল পরিকল্পনারই একটি নিজস্ব যুক্তি ও দর্শন রয়েছে। সেই বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য বা বিচার করার পূর্বে এর জন্য পূর্ণ সময় প্রদান বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাংলাদেশে এটা ঘটতে দেয়া হয়নি। রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার মধ্য দিয়ে জাতির আকাঙ্ক্ষিত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন রুদ্ধ করা হয়েছে। সংবিধান বহির্ভূত শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় আজ জাতীয় অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ব্যাপক নৈরাজ্য, অনিয়ম ও সংশয় সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের পার্টিকে গত বিশ বছরে বহু চড়াই উৎরাই ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। কিন্তু মৌল লক্ষ্যের পরিবর্তন হয়নি। আমাদের সদ্য-ঘোষিত অর্থনৈতিক নীতিমালায় পূর্ব অনুসৃত ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে। অভিজ্ঞতা ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের মনে এই প্রতীতি জন্মেছে যে, বর্তমান প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক কর্মোদ্যম রাষ্ট্রীয় মনোপলির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বিধায়, ঐ দিক নির্দেশনা ও ব্যবস্থায় আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হবে না। দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন ও উৎপাদশীলতার লক্ষ্যে ব্যক্তি-উদ্যোক্তাদের সার্বিক উৎসাহ প্রদান আমাদের বর্তমানের অঙ্গীকার। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য হল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে তাদের সাহায্য করা, মানবেতর জীবন থেকে তাদের উদ্ধার করা। এই লক্ষ্য অর্জনে

অনুৎপাদনশীল খাতের বরাদ্দ সংকুচিত করে উদ্বৃত্ত অর্থ-সম্পদ, দারিদ্র্য বিমোচন, শিক্ষা ও প্রযুক্তি উন্নয়নের মতো কর্মসূচীতে বিনিয়োগ করতে হবে। নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে সরকারের বিভিন্ন স্তরের নীতিমালা ও পরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়িত করা হবে। স্বেচ্ছামূলক আর্থসামাজিক প্রতিষ্ঠানকে গ্রাম ও জাতীয় পর্যায়ে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। আমি পুনরায় উল্লেখ করতে চাই যে, এটা তখনই সম্ভব হবে যখন আমাদের জাতীয় বাজেটে, অর্থনৈতিক ও রাজস্ব নীতিমালায় জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক হিসেবে অনুৎপাদনশীল খাতের বাজেট বরাদ্দ হ্রাস করে উৎপাদনমুখী খাতে যথেষ্ট ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি সম্ভব হবে। আমরা জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবশ্যই জাতীয় সম্পদ বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনায় গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও রূপান্তর কার্যকরি করব।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক গতিশীলতা ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে আজকের দুনিয়ায় আন্তর্জাতিক সাহায্য-সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। বাংলাদেশে বিগত ২০ বৎসর বিদেশি সাহায্য এসেছে এবং তা বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগের সাড়ে তিন বছর শাসনামলে যে সাহায্য এসেছে তা একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে, উদ্দেশ্যে ও নীতিমালার ভিত্তিতে জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ৭৫ পরবর্তী সরকারগুলো সাহায্যের সঠিক ব্যবহারে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ জনগণের কাছে তাদের কোনো রাজনৈতিক অঙ্গীকার ছিল না। প্রাপ্ত সাহায্য কতিপয় ব্যক্তি বা লোকের স্বার্থে ব্যবহার না করে সামগ্রিক জনকল্যাণে বিনিয়োজিত করাই আওয়ামী লীগের প্রধান লক্ষ্য। সাহায্যগ্রহণের ক্ষেত্রে দেশের চাহিদা ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দাতাগোষ্ঠীর সাথে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে চাহিদা ও সরবরাহের স্বরূপ নির্ধারণ করা হবে।

সম্মানিত অভ্যাগতবৃন্দ,

আমাদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা অর্জন প্রয়াসে বিদেশি বন্ধুবর্গ, বিশেষ করে আপনাদের সংস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। উন্নয়নের সাথে আমাদের প্রয়োজন বিদেশি পুঁজি, উন্নত প্রযুক্তি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা। এতদঞ্চলে আপনাদের সংস্থা ঐতিহ্যগতভাবে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান ক্ষেত্রে আপনাদের ভূমিকাকে স্বাগত জানাই এবং আশা করি আগামী দিনেও আপনাদের এই ভূমিকা অব্যাহত থাকবে। উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে সাহায্য গ্রহণকারী ও সাহায্য প্রদানকারী সংস্থার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও সহযোগিতাপূর্ণ দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনার মাধ্যমে বর্তমান বৈষম্যমূলক ব্যবধান হ্রাস করতে হবে। স্বাধীন দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিরাজমান বৈষম্য থেকে এভাবেই কেবলমাত্র নিস্তার পাওয়া সম্ভব।

বর্তমান অবস্থায় আমি খোলাখুলিভাবে অত্যন্ত উদ্বেগের সঙ্গে বলতে চাই,

সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি শিরোনামে বর্তমান সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তাব্যক্তি বলেছেন, দাতাগোষ্ঠী চাচ্ছেন যে সরকার নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করুন। এটা কি কোনো বিদেশি সরকারের খবরদারির বিষয়? নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকারের একজনই প্রভু—তা হল নির্বাচকমণ্ডলী, জনগণ এবং স্বজাতি। কিন্তু বর্তমান ক্ষমতাশীন সরকার এর বিপরীত আচরণ করছে। রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের অদক্ষতা ও অব্যবস্থার দায়ভার দাতাগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দিতে চায়।

আমাদের দলের নীতি অত্যন্ত পরিষ্কার, আর তা হল দূরের হোক বা প্রতিবেশীই হোক আমরা সমতা ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সকল রাষ্টপুঞ্জের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই। একথা সকলেরই স্মরণ আছে যে, স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণের পরপরই আমরা পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের জন্য বন্ধুত্বের দ্বার খুলে দিয়েছিলাম এবং সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছিলাম। অধিকাংশ দেশই যথাসময়ে এ বিষয়ে যথার্থভাবেই সাড়া দিয়েছিল। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রচনার এই নীতি অব্যাহত রাখতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।

পৃথিবীর বহু দেশ, বিশেষ করে আপনাদের সংস্থার দেশসমূহ আমাদের জাতীয় ইতিহাসের সংকটপূর্ণ এবং অন্ধকারময় দিনগুলোতে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, আমাদের নৈতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়েছে, একথা আমি এই মুহূর্তে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। আমাদের স্বাধীনতার প্রথম প্রহর থেকে আপনাদের সঙ্গে আমাদের যে নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে তা সমতা, সার্বভৌমত্ব এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে আগামী দিনে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এই কামনা করি।

সম্মানিত রাষ্ট্রদূতবৃন্দ, ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ,

আমি এতক্ষণ ধরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আর্থসামাজিক কর্মসূচী ও দর্শনের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করেছি। বলতে গেলে আওয়ামী লীগের মতো একটি তৃণমূলভিত্তিক প্রধান দলের ক্ষেত্রে এই বর্ণনা অকিঞ্চিৎকর মাত্র। আজকের এই বন্ধুত্বপূর্ণ, উষ্ণ আতিথেয়তা ও আনন্দময় পরিবেশে আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেবার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশেষ করে এই বৈঠক আয়োজন করার জন্য আমার ও দলের পক্ষ হতে আমি ফরাসি রাষ্ট্রদূত ও তদীয় পত্নীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সকলের প্রতি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। খোদা হাফেজ। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

৩.৫.৯২ তারিখে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সংস্থার (ই. ই. সি.) দেশসমূহের রাষ্ট্রদূতদের সভায় ভাষণ

বিএনপি সরকারের প্রতি জনগণের আস্থাহীনতাই এই অনাস্থা প্রস্তাব

মাননীয় স্পীকার,

আমি প্রথমেই স্মরণ করছি ১৯৫২ সাল থেকে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন, আমি স্মরণ করছি ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, আমি স্মরণ করছি '৭৫-এর ১৫ই অগাস্টে নিহত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার এবং জাতীয় চার নেতাকে। বিগত ১৫ বছর যাবৎ সামরিক স্বৈরাচারকে উৎখাত করবার জন্য, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য, মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন আমি তাঁদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

মাত্র একটি বছর আগে এই সংসদে আমরা একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলাম। সে ইতিহাস হল আমরা বিরোধী দল উদ্যোগ নিয়েছিলাম, এই দেশে ১৯৭৫-এর ১৫ই অগাস্ট জাতির জনককে হত্যা করার পর সামরিক স্বৈরাচারের যে শাসন এদেশে প্রচলিত হয় এবং দীর্ঘ ১৫টি বছর যাবত এদেশের রাজনীতি, এদেশের অর্থনীতি, এদেশের সামাজিক ক্ষেত্রে যে নৈতিকতাহীনতা দেখা দেয়, যে অর্থনৈতিক অবক্ষয় ঘটে এবং হত্যা, ক্যু, ষড়যন্ত্রের যে রাজনীতি শুরু হয়, তার চিরঅবসান ঘটিয়ে একটি গণতান্ত্রিক ধারা প্রতিষ্ঠিত করব— তারই জন্য সামরিক স্বৈরাচার প্রবর্তিত যে শাসন এদেশে চলছিল তারই অবসান ঘটিয়ে আমরা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন করব।

নিশ্চয় আপনার মনে আছে আমরা প্রথম যখন সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠার বিল পেশ করি, তখন আমাদের সামনে যাঁরা বসে আছেন, আজকের সরকারি দল তার বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু একটি পর্যায়ে তারা বুঝতে পেরেছিলেন অথবা হিসাব কষেছিলেন অথবা অঙ্ক কষেছিলেন, ঠিক এই পদ্ধতিতে এলে পরে ক্ষমতার স্থায়িত্বকাল দীর্ঘায়িত হবে। তাই তারাও আমাদের সঙ্গে ঐকমত্যে পৌঁছেছিলেন এবং ৬ই অগাস্ট '৯১তে এই সংসদে আমরা Parliamentary system অর্থাৎ সংসদীয় পদ্ধতির সরকার এনেছিলাম।

প্রতিটি ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য, গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য আমরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলাম— মাননীয় স্পীকার, কিন্তু এক বছর যেতে না যেতেই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের অযোগ্যতা, অদক্ষতা, দলীয়করণ এবং সন্ত্রাস এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, সরকারকে সহযোগিতা করতে গিয়ে যেন জনগণের কাছে আমরা আমাদের স্থান হারিয়ে ফেলেছি। জনগণ আমাদেরকেও দোষারোপ করতে শুরু করেছে।

বিরোধী দল হিসেবে আমাদের স্থান জনগণের কাছে— আমাদের রাজনীতি জনগণের জন্য। আমি বারবার বলেছি আমাদের রাজনীতি ক্ষমতামুখী নয়—

জনতামুখী। কাজেই জনগণ যখন আস্থাহীনতায় ভুগছে, জনগণ যখন সরকারের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করছে, তখন তারই প্রতিফলন ঘটাবার জন্য এই সংসদে আমাদের পক্ষ থেকে সাত-সাতজন সদস্য আজ অনাস্থা প্রস্তাব এনেছেন।

এই অনাস্থা প্রস্তাব আনার সময় কিছু কিছু কথা এসেছে। যেমন আমাদের কার্যপ্রণালী বিধি— এই বিধির ১৫৯ ধারা অনুযায়ী আমরা দেখি, এর ৪ ধারায় স্পষ্ট আছে ঃ " প্রশ্নোত্তর শেষ হবার পর এবং দিনের কার্যসূচীতে প্রবেশের পূর্বে প্রস্তাবটি উত্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতে হইবে। তবে এই পর্যায়ে কোন বক্তৃতার অনুমতি দেয়া যাইবে না।"

দুর্ভাগ্য এই বিধি কিন্তু লংঘন করা হয়েছিল। কারণ আপনি অনুমতি দেবার বা এই প্রস্তাব উত্থাপন করবার সঙ্গে সঙ্গে, আপনি কেন এই বিধি লংঘন করেছিলেন আমি জানি না, মাননীয় স্পীকার। আপনি একজন ব্যারিস্টার সাহেবকে বক্তৃতা দিতে দিয়েছিলেন এবং তিনি এই প্রস্তাবের কোথায় কি খুঁত আছে, সেটা তিনি ব্যাপকভাবে দীর্ঘ আধ ঘন্টা ধরে বক্তৃতা দিয়ে, কিতাবের পর কিতাব খুলে দিয়ে দেখালেন যে এটা defective -- আমার প্রশ্ন যদি defective-ই হবে, তবে এটা আপনারা সংসদে আনলেন কেন, আপনারা এটা ফেরত দিয়ে দিতেন। আমাদের তরফ থেকে আবার সেটা এই সংসদে submit করা যেত। এ ধরনের বহু সংসদীয় রীতি আছে, অনাস্থা প্রস্তাব একবার কেন, একাধিকবার আনা যেতে পারে।

আজকে যদি প্রশ্ন করি এই Defective বিল আনার অভ্যাসও আছে, যেমন উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে·হয়েছে। তেমনি Defective প্রস্তাবও আপনারা গ্রহণ করলেন। আজকে যে অনাস্থা প্রস্তাব আপনারা Defective হিসাবে বর্ণনা করলেন আবার তা উত্থাপন করতে দিলেন, তা হলে আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে প্রশ্ন— আপনারা কি ক্ষমতার অপব্যবহার করলেন না? এটা মেনন সাহেব অত্যন্ত চমৎকার ভাবে বলেছেন ঃ এটাও কি এক ধরনের ক্ষমতার অপব্যবহার নয়?

তবু আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, আপনি এনেছেন, আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছেন। আসুন আমরা দেখি, এতে কী আছে ঃ এই অনাস্থা প্রস্তাবে আজকে জনগণের যে আহাজারি, সেই আহাজারিই কিন্তু এই অনাস্থায় প্রতিফলিত হয়েছে। কারণ, আজকে দেখা যাচ্ছে যে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে সরকার সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

মাননীয় স্পীকার,

আমরা চেষ্টা করেছি, বারবার চেষ্টা করেছি— যখন আমরা সংসদীয় পদ্ধতি আনি তখনও চেষ্টা করেছি— সরকার সঠিকভাবে চলুক, সঠিক পথে চলুক। জনগণের মনের আশা পূর্ণ করুক। আমরা যখন সংসদীয় পদ্ধতি নিয়ে এলাম, আমরা বিরোধী দল থেকেই আপ্রাণ চেষ্টা করেছি এবং আমাদের আশা ছিল যে, সংসদীয় পদ্ধতির রীতি-নীতি অনুযায়ী এই সরকার চলবে এবং এই সংসদ চলবে। সরকার কিন্তু প্রথমে রাজি হননি, মাননীয় স্পীকার, কোনো মতেই রাজি হননি।

মাননীয় স্পীকার,

এ প্রসঙ্গে একটি গল্প আমি বলতে চাই। সে গল্পটি হল ঃ একদিন প্রবল বর্ষণ হচ্ছে, প্রচণ্ড বর্ষণ। খেয়াঘাটে নৌকা পারাপার হবার জন্য বহু মানুষ একত্রিত হয়েছে। যেহেতু প্রবল বর্ষণ, আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা, এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে— সকলেই উদ্বিগ্ন কত দ্রুত পারাপার হওয়া যায়, কত দ্রুত নদী পার হওয়া যায়। কিন্তু, খেয়াঘাটে নৌকা সীমিত— খুব স্বাভাবিকভাবে সেখানে খুব ধাক্কাধাক্কি চলছে, কার আগে কে নৌকায় চড়বে, কার আগে কে ঘাট পার হবে? মাননীয় স্পীকার, এই ধাক্কাধাক্কিতে একটি শিশু পানিতে পড়ে যায়। খুব স্বাভাবিকভাবে পানিতে পড়ে যাবার পর দেখা যায় যে সেখানে সকলে চিৎকার করছে 'পানিতে নাম' 'পানিতে নাম' 'তোল তোল তোল'— কিন্তু কেউ নামছে না। হঠাৎ দেখা গেল যে, একটি লোক পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং শিশুটিকে উদ্ধার করল। তখন সকলেই তাকে বাহবা দিতে শুরু করল। তবে লোকটি সৎ ছিল— তাই স্বীকার করল যে সে ইচ্ছা করে পানিতে নামেনি, পিছন থেকে কেউ তাকে ধাক্কা দিয়েছে— আর ধাক্কা দিয়েছে বলেই সে নেমেছে আর শিশুটিকে উদ্ধার করেছে। মাননীয় স্পীকার, এ সঙ্গে বলতে চাই আমরাও দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করবার জন্য এই সরকারকে ধাক্কা দিয়েই ঐ সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করেছিলাম।

ঠিক তেমনিভাবে আজকে যে অনাস্থা প্রস্তাব আমরা এনেছি, এই অনাস্থা প্রস্তাবে যে যে বিষয়গুলি আমরা উল্লেখ করেছি, আমাদেরও আশা আছে যে ধাক্কা মেরে মেরে, ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে আমরা এদের সচেতন করব এবং জনগণের জন্য কাজ করতে বাধ্য করব।

আজকে দেখুন, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে সরকার সমর্থ হয়েছে কি না? আজকে বিকেলেরই একটি ঘটনা ঃ জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে জাতীয় শোক দিবস পালন কমিটি আয়োজিত একটি মিছিল সোহরাওয়ার্দী উদ্যান থেকে বঙ্গবন্ধু ভবন অভিমুখে যাত্রা করেছিল। কিন্তু মিছিলটি এলিফেন্ট রোড দিয়ে যাবার সময় সেখানে জিয়া হল থেকে ঢিল ছোঁড়া হয়, গুলি ছোঁড়া হয়, বোমাবাজি করা হয় এবং মিছিলকারীদেরকে, বহু মানুষকে আহত করা হয়, পুলিশ সেখানে নীরব ভূমিকা পালন করে। সন্ত্রাসী যারা, হল থেকে যারা গুলি করেছে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে উল্টো মিছিলকারীদের উপরেই টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করা হয়। এর থেকে লজ্জা ও দুঃখের আর কী থাকতে পারে!

মাননীয় স্পীকার,

আজকে জানমালের নিরাপত্তা দিতে সরকার যে কী দারুণভাবে ব্যর্থ, তার বহু চিত্র আজ আমাদের কাছে রয়েছে। আসুন, আমরা পত্রিকার পাতা খুলি। আমি শুধু একটি মাসের হিসাব দেব, কারণ বিষয়টি এতো ব্যাপক— একটি মাসের হিসেব দেয়াও মুশকিল, অনেক সময় লেগে যাবে, তবু কিছু কিছু উদাহরণ দিচ্ছি।

৪/৭/৯২ দৈনিক দিনকাল ঃ "৪ মাসে ৪,৬৬০ জন আত্মহত্যা করেছে।" ৬/৭/৯২ দৈনিক ইত্তেফাক ঃ "রাতের বাহিনীর তৎপরতা।" আসুন আমরা দেখি, রাতের বাহিনীর তৎপরতায় কী আছে। যশোর জেলার অভয়নগর, কেশবপুর, মনিরামপুর থানার বিভিন্ন এলাকায় রাতের বাহিনীর তৎপরতা সাম্প্রতিককালে বাড়িয়া গিয়াছে। এই বাহিনীর সদস্যরা অস্ত্রের মুখে জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া আসিতেছে, ইত্যাদি। জনসাধারণ প্রাণের ভয়ে টুঁ শব্দ করিতে সাহস পাইতেছে না। প্রশ্ন— সেখানে কি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ নাই ? তা হলে কার ইশারায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী, তিনি কোন ক্ষমতাবান যার নির্দেশের কারণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী—টুঁ শব্দটি করতে পারে না, মাননীয় স্পীকার?

৬/৭/৯২ আজকের কাগজ, "সাড়ে তিন কোটি মানুষ গৃহহীন বাহিনী।" ২০/৭/৯২ দৈনিক লাল সবুজ, "ঢাকায় মাফিয়া চক্রের রাজত্ব।" ২৮/৭/৯২ দৈনিক খবর, "ভাত ছিনতাই"— আসুন দেখি সেখানে কী হচ্ছে? "আসছে সামনে শুভ দিন, ধানের শীষে ভোট দিন"— সেই শুভ দিনে আজ আমরা কী দেখছি? 'জনগণ ক্ষুধার তাড়নায় ভাত ছিনতাই করছে, মাননীয় স্পীকার, এবার ভাতভর্তি টিফিন-বক্স ছিনতাই হয়েছে, গতকাল সোমবার আলুবাজারের ব্যবসায়ী মোতাহার হোসেন এবং নবাবপুরের ব্যবসায়ী আফজাল হোসেনের দুপুরের খাবার নিয়ে কাজের ছেলে বাচ্চু মুগদাপাড়া থেকে গুলিস্তান ফলপট্টিতে পৌঁছালে শার্ট-প্যান্ট পরিহিত তিনজন ছিনতাইকারী তার পথরোধ করে দাঁড়ায়। তারা তাকে হত্যার হুমকি দিয়ে খাবারভর্তি টিফিন-বক্স দুটি ছিনতাই করে নেয়। প্রকাশ্য নগরীতে ভাত ছিনতাইয়ের ঘটনা এই প্রথম মাননীয় স্পীকার, এই প্রথম।

মাননীয় স্পীকার,

৩১/৭/৯২ দৈনিক ইত্তেফাক, 'অভিভাবক মহলে আতঙ্ক'। মাননীয় স্পীকার, Scholastica School থেকে পাঠানো একটি চিঠি। স্কুল-কলেজ বিভিন্ন জায়গায় আজকে গার্জিয়ানদের চিঠি দেয়া হচ্ছে, ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তার জন্য। Scholastica-র চিঠিতে লেখা হয়েছে ঃ 'In view of recent reports of kidnapping threats received by some school in this area, you are all requested to take extra precautions when dropping or picking up your wards from school.' অতীতে কোনো দিন, এমনকি ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫, সেটা তো ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ—১৯৭২ থেকে ১৯৭৫, সে সময় '৭১ সালে গেরিলা যুদ্ধ হয়েছিল, অস্ত্র ঘরে ঘরে ছিল, তখনও কিন্তু স্কুল থেকে এই ধরনের নোটিস গার্জিয়ানদের দেয়া হয়নি। আজকে 'ধানের শীষের শুভ দিনের' এই হচ্ছে নমুনা। ১২/৮/৯২ তারিখে ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে প্রাপ্ত আরেক চিঠিতে ' ৩ লক্ষ টাকা না দিলে ছাত্রদের kidnap করা হবে'— এই ঘটনা আজ অহরহ চলছে।

নিরাপত্তাহীনতায় শুধু যে দেশবাসী ভুগছেন তা নয়, আজকে আমাদের এই সংসদের আইনমন্ত্রী, আইনের রক্ষক, তিনি কী বলেছেন আমরা একটু দেখি।

৩১/৭/৯২ আজকের কাগজ ঃ 'একান্ত সাক্ষাৎকারে আইন, বিচার ও সংসদীয় মন্ত্রী মীর্জা গোলাম হাফিজ— "আপনি সাংবাদিক, আপনার যেমন জীবনের নিরাপত্তার অভাব, আমি মন্ত্রী, আমারও।" ঠিক এমনিভাবে ১১/৮/৯২ বাংলাবাজার পত্রিকা ঃ 'যৌতুকের দাবী মেটাতে না পেরে ৭০০ গৃহবধূ তালাকপ্রাপ্ত'। ১৬/৪/৯২ খবর ঃ 'ছাত্রাবাসে আটক করে তরুণীকে বলাৎকার'। ৮/৭/৯২ সংবাদ ঃ এ বিষয়ে অবশ্য আমি আগেই বলেছি। ঐ যে 'একজন নারীর বদলে ৬টি গরু', এ বিষয়ে আমি আসছি। শুধুমাত্র চোরাকারবারিরা একটি নারীর বদলে ৬টি গরুই নয় মাননীয় স্পীকার, আজকে নারী পাচার, শিশুপাচার যেভাবে হচ্ছে তার যে করুণ চিত্র আমরা পাচ্ছি, তার বহু documents আমার কাছে আছে। বাংলাদেশের শিশুদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের কোনো দেশে, সেখানে camel race-এ সেইসব শিশুদের ব্যবহার করা হচ্ছে।

বহু শিশু আজ India-র বোম্বাইতে, তাদের ধরে সেখানে রাখা হয়েছে। বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকে বারবার খবর দেওয়া হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি এসেছে, তার পরেও সেই শিশুদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসার কোনো ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত হয়নি। আপনি যদি documents চান, আমার কাছে সেই documents আছে, আমি আপনাকে দেব।

'৭০ হাজার দুঃস্থ মহিলার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত'। 'Children for Export', 'বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যপ্রাচ্যে উট দৌড় খেলায় ব্যবহার করা হয়', 'Strangely, the escorts and their cohorts insist they were not aware that the children would be used in camel racing'— এটা হচ্ছে Front Line, July 31, 1992.

এই কাগজ আমি আপনার কাছে দেব। কারণ এখানে বহু শিশু ৩ বছর থেকে তার উর্ধ্বে—তাদের উটের পিঠে বাংলাদেশের শিশুদের বেঁধে দেয়া হয়। শিশুরা আতঙ্কে চিৎকার করে আর সেই চিৎকার শুনে উট উর্ধ্বগতিতে ছোটে। আমার দেশের শিশুকে এভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, জানতে চাই সরকারের কাছে আপনার মাধ্যমে মাননীয় স্পীকার— এর জন্য কী ব্যবস্থা তারা নিয়েছেন?

মাননীয় স্পীকার,

'গরুর বদলে নারী'— এটা আমি এই সংসদে আগেই বলেছি। এর আর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় আমি যাচ্ছি না।

শুধুমাত্র এই নয়, আজকে সন্ত্রাসের আরও চিত্র ঃ 'ইসলামী ছাত্র শিবিরের বর্বর হামলার ফলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ আড়াই মাস বন্ধ থাকার পর ১লা জুলাই ক্লাশ শুরু হলে, সেদিনই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসী গ্রুপ ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসেবে দু' গ্রুপ গুলি বিনিময় করে এবং কয়েকজন মারাত্মক আহত হয়।

'সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন পিতাকে দেখতে গিয়ে ছাত্রলীগ নেতা

জরীফ ছাত্রদলের সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়।' পবিত্র ঈদুল আজহার পূর্বের রাত্রে বিএনপির সশস্ত্র খুনীচক্র বাড়িতে হামলা চালিয়ে নৃশংসভাবে ফরিদপুর শহর আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক আজিজুল ইসলাম রাজুকে নির্মমভাবে হত্যা করে। গত ১২ই জুলাই ঈশরদির দাশুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা সরদার আবদুর রবকে নিজ বাসভবনে বিএনপি'র সশস্ত্র খুনীরা গুলি করে হত্যা করে। আসামীরা প্রকাশ্য দিবালোকে এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। সিরাজগঞ্জ সরকারি মনসুর আলী কলেজের ছাত্র সংসদের জি এস নজরুল ইসলাম বকুলের হাত প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্র দলের সন্ত্রাসীরা কেটে ফেলে। ঈশ্বরদি থানার ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক আবুল বাশারের চোখ ছাত্রদলের গুণ্ডারা তুলে ফেলে। চট্টগ্রাম হালিশহর ছাত্রলীগ কর্মী বাদলকে ছাত্রদলের খুনীচক্র গুলি করে হত্যা করে।

৪ঠা জুলাই বিএনপি খুনীচক্র হত্যা করে আদমজী নগর ছাত্রলীগ নেতা সেলিমকে। ২০শে জুন কমলগঞ্জ থানা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মহিউদ্দিনের হাতের আঙুল কেটে নেয় ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনী। ২৭শে জুন জাতীয় সংসদ সদস্য জননেতা আবদুর রাজ্জাকের গ্রামের বাড়িতে হামলা চালান হয়। দিনাজপুরে ছাত্রলীগ নেতা অজয়কে প্রকাশ্য দিবালোকে নৃশংসভাবে হত্যা করে ছাত্রদলের খুনীচক্র।

এ ছাড়া এর আগে কবে কত তারিখে কতজনকে হত্যা করা হয়, তার একটা কপিও আপনাকে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি দিয়েছেন। আজকে শুধু হত্যা নয়, ছিনতাই হচ্ছে— এই সংসদের ৩৩০ জন সংসদ সদস্যের মধ্যে অন্ততঃ ১০ জন সংসদ সদস্যের, হয়তো সংসদ সদস্য অথবা তাদের স্ত্রী-কন্যার স্বর্ণ অলঙ্কার ছিনতাইয়ের ঘটনা আপনি অবহিত আছেন। পাশাপাশি মন্ত্রীর গাড়ি হাইজ্যাক, ত্রাণমন্ত্রীর গাড়ি হাইজ্যাকের ঘটনা আপনি অবহিত আছেন। আরও অনেক গাড়ি হাইজ্যাকের ঘটনা আপনি জানেন।

পঙ্গু হাসপাতালের সিঁড়িতে, ঐ হাসপাতালের এনেশথেসিয়া বিভাগের প্রধান ডাঃ নূরজাহানের হাতের বালা ছিনতাইকারীরা অস্ত্র ঠেকিয়ে ছিনিয়ে নেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডীন ডঃ এরশাদুল বারীর স্ত্রীর স্বর্ণের চেন, হাতঘড়ি, আংটি ছিনতাইকারীরা ছিনতাই করে নেয়। এরকম বহু ভূরিভূরি নমুনা আমার কাছে রয়েছে। সব বলে আমি শেষ করতে পারব না। তার পরও কিছু-কিছু এ ব্যাপারে না বললে নয় এবং আপনার কাছে লিস্ট দেওয়া হয়েছে। যেমন, ২/৭/৯২ ঃ গাবতলি টার্মিনালের দখল নিয়ে গুলি, বোমাবাজি, সংঘর্ষে দু'জন নিহত। টার্মিনাল দখল, চাঁদা আদায়, শাসক দল সমর্থক বিএনপি কর্মীরা বাংকার তৈরি করে ভারী অস্ত্রশস্ত্রসহ অবস্থান নিয়েছে— এ কথা আমি এই সংসদে তুলতে চেষ্টা করেছি। যুব কমান্ডের কালো দিবস, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ, গুলি, কাঁদুনে গ্যাস, বোমা। ৫/৭/৯২ ঃ হালিশহরে দুষ্কৃতকারীর গুলিতে নিহত।

এত বড় লিস্ট আর পড়তে চাই না। বেশি দূর যেতে হবে না, এই সংসদে উপস্থিত

আছেন, আমি আপনার সামনে তাকে হাজির করছি— নেত্রকোনার পূর্বধলা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মোশাররফ সাহেব, আজকে তার দিকে তাকিয়ে দেখুন, তিনি যখন মিছিল নিয়ে যাচ্ছিলেন— তাও আবার দূর্নীতির বিরুদ্ধে— তাকে এই বিএনপি'র সশস্ত্র গুণ্ডারা হামলা করে। কয়েকদিন আগে তার অপারেশন হয়েছে। আপনি দেখতে পারেন— তার জিহ্বা, কপাল, মুখে গুলী ছিল, সেগুলো বের করা হয়েছে। বেশি দূরে যাবার দরকার নেই, বিএনপি'র সশস্ত্র সন্ত্রাসের নমুনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।

আজকে শিশুদের কথা আমি বলেছি। এবার নারীদের কথা আমি বলি, যে, আমার দেশের মা-বোনেরা আজকে কোথায় আছে? এদেশের নারীদের পাচার করা হচ্ছে। এই যে আমার কাছে একটি বই ' The Flesh Trade : Report on Women and Children's Trafficking in Pakistan, 1991, Published by Lawyers for Human Rights and Legal Aid— এই বইতে বলা হয়েছে মাননীয় স্পীকার ঃ 80 women in Karachi Jail, 20 women in Larkana Jail, 2000 women in different Jails of the country and 200,000 women have been sold whose whereabouts are to be confirmed.

বাংলাদেশের দু'লক্ষ মহিলা বিক্রি হয়ে গেছে, কোথায় গেছে কেউ জানে না। তার মানে, আমার বাংলাদেশের মা-বোনেরা আজ পাকিস্তানের পতিতালয়ে স্থান পাচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা অতীতে ঘটেছে কি না জানি না, কিন্তু বর্তমানে অনেক এ জাতীয় ঘটনা ঘটছে। আমরা আপনার মাধ্যমে সরকারের কাছে এর জবাব চাই।

মাননীয় স্পীকার,

একটি ছবি, বিএনপি'র পতাকা, হাতে অস্ত্র নিয়ে— মনে হচ্ছে কোনো-একটা যুদ্ধক্ষেত্র। ছাত্রদল ছাত্রাবাস দখল করছে পতাকা নিয়ে, অস্ত্র হাতে নিয়ে। পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় নির্মম ও বর্বরোচিত নির্যাতনে ছাত্রলীগ নেতা মানিক নৃশংসভাবে নিহত হন। মাদারীপুর-শরিয়তপুরে বিএনপি আজকে সর্বহারা পার্টিকে মদদ দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করছে, জিম্মি করে লক্ষ লক্ষ টাকা আদায় করছে। যখন এর আগে বিএনপি ক্ষমতায় ছিল, তখন এ ঘটনাও ঘটেছিল। বিএনপি যখন ক্ষমতাচ্যুত ছিল, সেখানে সর্বহারাদের দৌরাত্ম্য কমেছিল। আজকে আবার যখন বিএনপি ক্ষমতায় গেছে, সেখানে এখন আবার সেই সর্বহারা পার্টিকে মদদ দিচ্ছে সরকার। এবং এখন আবার মানুষ জানমালের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে।

আজকে দলীয়করণ কী পর্যায়ে গেছে? আর একটা কথা আমি উল্লেখ করতে চাই সেটা হল এই সংসদে প্রশ্নোত্তরেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে, চার থেকে পাঁচ হাজার মানুষ ডিটেনশনে রয়েছে। বিএনপি সরকারবিরোধী দলের উপর নির্যাতন চালিয়ে, জেলে পুরে ডিটেনশন দিয়ে আজকে বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ করতে চায়। আর সব জায়গা তারা দখল করতে চায়। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আজকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমস্ত ছাত্র সংগঠন নির্বাচন বর্জন করেছে। কারণ, সেখানেও দলীয়করণ চলছে, সেখানেও সন্ত্রাসী

তৎপরতা চলছে। আজকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা দল থেকে যাদের বহিষ্কার করেছি, তারা মদদ পায় পুলিশের, সরকারের। পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে তারা হলে ঢোকে, সরকার তাদেরকে মদদ যোগায়। এর চেয়ে লজ্জা আর কী থাকতে পারে? আসুন বাস টার্মিনালে, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন ফেডারেশনের ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে গত ২২শে জুন দেশব্যাপী অনির্দিষ্টকালের জন্য হরতাল হয়। এই হরতাল চলাকালীন বিএনপি সরকারের যে 'ভাগ কর, শাসন কর নীতি', সে নীতি অবলম্বন করে ২৪শে জুন ফুলবাড়িয়ার টার্মিনাল দখল করে অস্ত্রধারীদের নিয়ে। পুলিশ তাদের পাহারা দেয়। ২৭শে জুন গাবতলি বাস টার্মিনাল বিএনপি'র অস্ত্রধারীরা দখল করে পুলিশের পাহারায়। ৩০শে জুন মহাখালী বাস টার্মিনাল দখল করে অস্ত্রধারীরা পুলিশের পাহারায়। ৩১শে জুন দয়াগঞ্জ ট্রাক টার্মিনাল বিএনপি দখল করে। এখানে পুলিশ, বিডিআর, তাদের ছত্রছায়ায় বিএনপির গুণ্ডাবাহিনী দখল করে রাখে। সেখানে যাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তাদের নামও রয়েছে। সেখানে ফরিদপুর খুলনা বাস টার্মিনালসহ সমস্ত জায়গায় - আদমজীনগর, ঢাকা বাজুতে মধ্যরাতে সন্ত্রাসী দিয়ে হামলা করে হাজার হাজার শ্রমিককে বের করে দিয়ে জায়গা দখল হচ্ছে। খুন করা হয় আদমজী মিলে, আপনি জানেন।

আজকে জনগণের জানমালের নিরাপত্তার অভাব, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্য, ব্যবসায়ী খুন, সরকারের দলীয়করণ— এই দলীয়করণ এবং ট্রেড ইউনিয়ন হাইজ্যাক, টার্মিনাল ও শিল্পাঞ্চল দখল এবং সাংবাদিকদের উপরও আঘাত এসেছে, সে ঘটনা সকলেই অবহিত। এ ধরনের ঘটনার অতীতে কোনো নজির নাই। বহু বক্তা বলে গেছেন, আমি আর বাড়াতে চাই না।

আজকে মুক্তিযোদ্ধারা কী অবস্থায় আছে— মুক্তিযোদ্ধাদের উপরও কম আঘাত আসছে না। বিএনপি কার সঙ্গে আঁতাত করছে? জামাতে ইসলামের সমর্থন নিয়ে তারা সরকার গঠন করেছিল। আজকে সুন্দর সুন্দর কথা অনেকে বলছেন, কিন্তু একটি কথা আমি জানতে চাই। ছিয়াশিতে আমরা পার্লামেন্টে এসেছি, আমাদের কটাক্ষ করা হয়। কিন্তু আমার প্রশ্ন, ১৯৮৮ সালের নির্বাচন আমরা সকলে মিলে বয়কট করেছিলাম, বিএনপিও বয়কট করেছিল। আমরা বয়কট করেছি, এরশাদ সরকারকে অবৈধ বলেছি। তা হলে অবৈধ সরকার যে অবৈধ নির্বাচন করেছে, সেই পার্লামেন্টে যে অবৈধ আইন প্রণীত হয়েছে, সেই আইনও অবৈধ। সংবিধানে যে সংশোধনী আনা হয়েছে, সেই সংশোধনীগুলোও অবৈধ। ৮ম, ৯ম, ১০ম সংশোধনী— তাও অবৈধ। আজকে বিএনপি যদি এরশাদকে অবৈধ মনে করে তা হলে এরশাদ প্রণীত আইন, তাও অবৈধ। তা হলে, বিএনপি কেন এই ৮ম, ৯ম, ১০ম সংশোধনী পরিহার করে নাই? দশম সংশোধনীর ফসল— এই সংসদের ত্রিশজন মহিলার রিজার্ভ সীট। ত্রিশজনের এই সীট জামাতের সঙ্গে ভাগ বাটোয়ারা করে নিয়ে আজকে তারই বদৌলতে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে মাননীয় স্পীকার। এরশাদ সাহেবের অনুদান গ্রহণ করে আজকে তারা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, এ কথা নিশ্চয় বিএনপি ভুলে যায়নি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা বারবার বলেছি, আমার কাছে documents আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে কবে এই গণ্ডগোল সৃষ্টি করা হয়েছে? আমি জানি, আপনি এদিক-ওদিক চাইছেন, অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে। আপনি অস্থির। কিন্তু তার পরেও আজ পার্বত্য চট্টগ্রামে যে অশান্ত অবস্থা— আমরা বারবার বলেছি, এই অশান্ত অবস্থার সমাধান করতে হবে এবং এখানে যাতে করে আর কোনো জানমালের ক্ষতি না হয় । কারণ, আমরা জানি যে পার্বত্য চট্টগ্রামে এক দিকে পুলিশ মারা যাচ্ছে, সেনাবাহিনী মারা যাচ্ছে, সেখানে যারা settler বা অপাহাড়ী মারা যাচ্ছে, পাহাড়ীরাও মারা যাচ্ছে। আমরা চেয়েছি সেখানে রাজনৈতিক সমাধান। আজকে যখন শান্তিবাহিনী তাদের অস্ত্র সংবরণ করেছে, আমরা দাবি করছি সব দল মিলে একটা সংসদীয় কমিটি গঠন করে এই সমস্যার সমাধান করা হোক। কিন্তু সেখানেও দেখা গেছে বিএনপি সরকার, তারা দলীয়করণে বিশ্বাসী। তাঁরা এ সমস্যার সমাধান করতে চান না। কেন চান না, সেখানে নিশ্চয় কোনো রহস্য নিহিত রয়েছে। সেই রহস্যটা কী? কী উদ্দেশ্য আছে সে প্রশ্নটা আমার রয়ে গেল। আজ আমার কাছে বহু রিপোর্ট রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের রিপোর্ট, সময় নেই বলে আমি কোট করতে পারছি না, 'Life is not ours', আপনি যদি চান, এর কপি আপনাকে পাঠাতে পারি, সেখানে দেখবেন কী অবস্থা বিরাজ করছে।

আজকে রোহিঙ্গাদের ব্যাপার এসেছে। এই রোহিঙ্গাদের ক্যাম্প খুলে দেশের ভেতর কারা এনেছে? আমি যদি বলি, সরকারই তাদের উৎসাহিত করেছে এদেশে প্রবেশ করতে— তার কারণ কী ছিল? এর উদ্দেশ্য দুটি হতে পারে। সরকার যখন দেশের ভেতরে রাষ্ট্র-পরিচালনায় চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে, জনগণের দৃষ্টি অন্য দিকে সরিয়ে দিয়ে, রোহিঙ্গাদের নিয়ে এসে সেখানে একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করে, এই সমস্যা দেখিয়ে হয়তো একটা যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা। আরেকটি হতে পারে, রোহিঙ্গাদের দেখিয়ে বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ, রিলিফসামগ্রী এনে তা আত্মসাৎ করা। যেমন করা হয়েছে ২৯শে এপ্রিল ঘূর্ণিঝড়ের পর, যেখানে ১০% ভাগও পুনর্বাসন কাজ হয়নি। যদি আমেরিকান টাস্ক ফোর্স এসে সেখানে কাজ না করত, তা হলে সেখানে যে করুণ চিত্র হত তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

ঘূর্ণিঝড়ের পর দেখা গেছে মানুষ ও গরুসহ জীবজন্তুর লাশ একই সঙ্গে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। কোনো কাফন-দাফনের ব্যবস্থা হয়নি। মানুষের লাশ কঙ্কাল হয়ে গেছে, আমি নিজে সেখানে দেখে এসেছি।

আজকে রোহিঙ্গা সমস্যার জন্য আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন যে, তিনি silent diplomacy দিয়ে সমাধান করবেন। যে আশ্বাস তিনি দিয়েছিলেন তা আজ পাহাড় প্রমাণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোনো সমাধান তো করতে পারেননি? আমরা জানি তাদের নিরাপত্তার অভাব। কিন্তু মায়ানমার সরকারের সঙ্গে যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী চুক্তি করলেন, কেন সেখানে জাতিসংঘের প্রতিনিধি রাখা হয়নি? আজ যদি জাতিসংঘের

প্রতিনিধি রেখে সেদিন চুক্তি করা হত, আমরা বিশ্বাস করি জাতিসংঘের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে, তাদের তত্ত্বাবধানে এই শরণার্থীরা দেশে ফিরে যেত - দেশে ফিরে যেতে তখন তারা ভয় পেত না। কী রহস্য আছে এর পেছনে যে, মায়ানমার সরকারের সঙ্গে আজকে বাংলাদেশ সরকার চুক্তি করলেন? সেখানে তো মিলিটারি ডিকটেটর, আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও একজন অবঃ, অবসরপ্রাপ্ত— হয়তো আত্মার মিল আছে, ভাবের আদান-প্রদান আছে, সেজন্য বোধহয় তাঁরা একে অপরকে বন্ধু মনে করেছেন।

কিন্তু কই শরণার্থীদের তো ফিরিয়ে দিতে পারেননি? এটা পররাষ্ট্রনীতিতে চরমভাবে পরাজয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা চাই না শরণার্থীদের কোনো জায়গায় ঠেলে দেয়া হোক। কিন্তু আজকে সেখানে অস্ত্রের খেলা চলছে, সেখানে আজকে ট্রেনিং চলছে। এদেশকে আজ গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া, আত্মঘাতী সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়ার একটা চক্রান্ত চলছে, যে চক্রান্ত আমরা কোনোমতে বরদাস্ত করতে পারি না। তাই আমরা মনে করি, আজকে যত দ্রুত হোক, জাতিসংঘের প্রতিনিধিসহ এই সমস্যার সমাধানে সরকার উদ্যোগী হবে— এটাই আমরা কামনা করি।

এখানে মন্ত্রীরা অনেক বক্তব্য দিয়েছেন। কর্নেল আকবর সাহেব (অবঃ) বলেছেন যে, 'এখন ফ্রন্ট লাইন খেলছেন'। আমরাও বলি তাই, ফ্রন্ট লাইন খেলছেন, তবে খেলায় তাঁরা পারদর্শিতা দেখাতে পারেননি। খেলায় ফেল করেছেন, তাঁরা পাস করেননি। এবার সেকেন্ড লাইনে আসুন, কেমন খেলা জমে আমরা দেখতে চাই। কর্নেল আকবর সাহেব ঠিকই বলেছেন, ফ্রন্ট লাইন এখন খেলতে পারছে না। তাঁদের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছি। কাজেই তাঁদের পদত্যাগ করতে হবে।

মাননীয় স্পীকার,

এখানে কোনো কোনো মন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর আমলের কথা তুলেছেন। একটি কথা তাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, বঙ্গবন্ধুর আমলে ছিল একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। যে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে, এখানে নিশ্চয়ই স্মরণ রাখতে হবে যে, সেটা ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান, প্রাদেশিক সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার মতো পুলিশবাহিনী ছিল না, সেনাবাহিনী ছিল না, বিডিআর ছিল না, কিছুই ছিল না।

তারপর আপনি তো জানেন যে, বাঙালিদের কোথাও কোনো স্থান ছিল না। কোনো বাঙালি সেক্রেটারি পদ পর্যন্ত পেত না। সেনাবাহিনীতে একমাত্র কর্নেল ওসমানী সাহেব ছিলেন। বাঙালিরা কোনো প্রশাসন পেত না। এমনকি প্রশাসনে, ডিসি, এস.পি.'র পদও না; অবাঙালিরা পেত, বাঙালিরা পেত না। তেমনি অবস্থায় বঙ্গবন্ধু ক্ষমতা হাতে নিয়েছিলেন। কিন্তু আজকে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, তখনও এমন হয়নি। আজকে যেখানে দেখা যায়, যে-কোনো ক্ষেত্রে মানুষের জানমালের নিরাপত্তা তো নেইই, তার পরেও এই সরকারের আমলে সন্ত্রাস বেড়েই চলেছে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে উল্লেখ করে বলেছেন যে, আমি নাকি তাঁকে বলেছি বন্দিদের ছেড়ে দিতে। অন্যায়ভাবে আমার দলের কর্মীকে যদি গ্রেফতার করা হয়, নিশ্চয় আমি

তার প্রতিবাদ করব। অস্ত্র হাতে নিয়ে যারা সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালাবে, আপনারা তাদের গ্রেফতার করবেন না, আর যেহেতু পুলিশের একজন আসামী ধরতে হবে, সেহেতু সন্ত্রাসীদের ছেড়ে দিয়ে নিরীহ একজনকে গ্রেপ্তার করে আসামী বানিয়ে তাকে নিয়ে আসবেন—এই অন্যায়-অবিচার আমরা মানতে পারি না।

মাননীয় স্পীকার,

'Quest for Democracy' এই বইটিতে দেখবেন, ১৯৭৬ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমানের আমলে ৬২ হাজার রাজনৈতিক বন্দি ছিল, এটা স্মরণ রাখতে হবে।

শুধু তাই নয়, আজকে ক্ষমতার কথা বলেন। একটি কথা স্মরণ করিয়ে দিই। ১৯৮২ সালের ২৪শে জানুয়ারি জেনারেল এরশাদ মার্শাল ল আনে। তার পূর্বে যখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়, বিদেশে একটি পত্রিকায় জেনারেল এরশাদ ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন, 'Satter is my candidate.' সাত্তার সাহেব এরশাদ সাহেবের candidate হয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেছিলেন। তখন বিএনপি সরকারের সঙ্গে আমাদের একটা ডায়লগ হয়েছিল। সেই ডায়লগে আমি সাত্তার সাহেবকে বলেছিলাম যে, নির্বাচনটা অবাধ, নিরপেক্ষ হতে দিন। কোনো অশুভ শক্তির সহযোগিতা নেবেন না। যদি কোনো বিশেষ শক্তির সহযোগিতা নেন, তিন মাসের বেশি ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না। এ কথা আমি বলেছিলাম মাননীয় স্পীকার। যা বলেছিলাম তা-ই ঘটেছিল। ঐ অশুভ শক্তির সঙ্গে আঁতাত করে নির্বাচন করে ক্ষমতায় গিয়েছিল। বিএনপি সরকারের দুর্নীতির কারণে সাত্তার সাহেব তাঁর মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়েছিলেন। আজকের সংসদ নেত্রীও সেই সাত্তার সরকারের বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ কথা আজ তাঁদের আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই।

আজ কতগুলো কথা এসেছে, যেগুলি ব্যক্তিগত পর্যায়ে পড়ে। আমি আশা করিনি, একজন শহিদ পরিবারের সম্পর্কে কেউ এ ধরনের কথা বলবে। আজকে শেখ কামাল সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। 'সত্তুর থেকে নব্বই, বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট'—লেখক আবদুল ওয়াহেদ তালুকদার,—তাঁর বইতে আছে, "ডালিম বেগম মুজিবকে 'মা' বলে সম্বোধন করতো। প্রায়শঃ বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে যাতায়াত করতো। ডালিম, ডালিমের স্ত্রী এবং স্ত্রী'র মা হেনা বেগম ঘন ঘন বেগম মুজিব ও শেখ হাসিনার নিকট যেত।" কথাটা মিথ্যা নয়, মাননীয় স্পীকার। ডালিমের স্ত্রী বা ডালিমের শাশুড়ি, আমরা যখন কলেজে পড়তাম, তখন একসঙ্গে ছাত্র রাজনীতি করতাম। তাদের সঙ্গে আমাদের সব সময় পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। পঁচাত্তরের পনেরই আগস্টের ঘটনাকে, যেখানে ডালিমের বোনের বিয়ে এবং গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলের ঘটনা বলে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে তথ্য সঠিক নয়। তা এই বইতেও আছে যে ঃ 'ডালিমের বোনের বিয়েতে গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলে তাকে উত্যক্ত করলে ডালিম উক্ত ছেলেকে চড় মারে। তখন ডালিমকে ঐ ছেলের বন্ধু-বান্ধবরা ঘেরাও করে রাখে। গাজী এ কথা জানতে পেরে, পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পেরে ডালিম ও তার স্ত্রীকে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে নিয়ে আসে। বঙ্গবন্ধুর

মধ্যস্থতায় বিরোধের নিষ্পত্তি হয় এবং গাজী ও ডালিম পরস্পর হাত মেলায়, এক সঙ্গে মিষ্টি খেয়ে মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধুর বাসা হতে বিদায় নেয়।'

আজকে শেখ কামালকে জড়িয়ে এই সংসদে যে সমস্ত কথা একজন সদস্য বলেছেঃ বরকত, কামাল একসঙ্গে গুলি খেয়েছিল। আজকে আমি তাকেই জিজ্ঞাসা করি, যদি বরকত বন্ধু হয়ে থাকে, যদি কামালের সঙ্গে একদিনের বন্ধুত্ব থেকে থাকে, তো উনি বলুন, রাত্রি ১২টার সময় কোনোদিন কোনো ব্যাংকে ব্যাংক ডাকাতি করা যায় কি না। তাও আবার স্টেট ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক কীভাবে তার ভোল্ট রক্ষা করে, তা যাদের সামান্য কান্ডজ্ঞান আছে, তাঁরাও জানেন। আর একটা কথা মনে রাখা উচিত। একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছেলের টাকার জন্যে ব্যাংক ডাকাতির প্রয়োজন হয় না, মাননীয় স্পীকার, এ কথা মনে রাখতে হবে।

শেখ কামালকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে চেনে, আমি বেশি বলতে চাই না, তা হলে মনে করবেন আমি bias, কিন্তু শেখ কামাল এমন একটি ছেলে যে প্রতিটি ক্ষেত্রে, বিশেষত বিশ্ববিদ্যালয়ে, মুক্তিযুদ্ধে, গান-বাজনায়, নাটকে, খেলাধুলায় তার যথেষ্ট অবদানও রয়েছে। আজকে যারা তার নামে মধ্যরাতে ব্যাংক ডাকাতির কথা বলে, আজকে তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে বলে। এ কথা সত্য নয়। এ-জাতীয় কথা এ সংসদে কখনোই উত্থাপন করতে দেয়া উচিত নয়।

আমার ভাই শেখ জামাল যখন Sandhurst পড়তে যায়, প্রধানমন্ত্রীর ছেলে হয়েও লন্ডনে একটি দোকানে সেলসম্যানের চাকুরি করে লেখাপড়ার খরচ নিজেই সে যুগিয়েছিল। আজকে অনেক প্রধানমন্ত্রীর ছেলেরা বিদেশে থেকে পড়াশুনা করে, কী ধরনের জীবন-যাপন করে, আমি প্রশ্ন রাখতে চাই, আমি কারুর বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না। মাননীয় স্পীকার, শুধুমাত্র আমি এজন্য বললাম যে, এ সমস্ত নোংরা অসত্য কথা বলা ঠিক নয়।

মাননীয় স্পীকার,

আজকে আমরা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি। এই অনাস্থা প্রস্তাব খণ্ডন করতে না পেরে অসত্য অতীত নিয়ে ঘাটাঘাটি করা হচ্ছে। অতীত নিয়ে ঘাটাঘাটি করলে অনেক কিছু ঘাটাঘাটি করা যায়, আমরা সেদিকে যেতে চাই না। আমরা বর্তমানকে চাই জানতে। আজকে দেশের মানুষের যে জানমালের নিরাপত্তা নেই, আজকে অর্থনৈতিক অবস্থার যে চরম অবনতি ঘটছে, আজকে সারা দেশে যে সন্ত্রাস চলছে - বিএনপি শান্তি আনবে? কেমন শান্তি আনবে, সমস্ত জায়গা যখন দখল শেষ করে বিরোধী দলের কণ্ঠরোধ করবে, যখন বিরোধী দলকে টুটি চেপে, গলা চেপে হত্যা করবে, বিরোধী দলকে বিএনপি সরকার যখন Shut down করে রেখে কবরের শান্তি আনবে— যেমনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আনছে, টার্মিনালগুলিতে অস্ত্রধারী বসে আছে— ঠিক তেমনি তারা কবরের শান্তি চায়। কিন্তু এই দলীয়করণ, এই দখলীকরণ-এর পরিণতি কখনই ভালো হয় না।

মাননীয় স্পীকার,

আজ দলীয়করণ সকল ক্ষেত্রে। কয়েকদিন আগে একটি চিঠি পেলাম ঈ.ও.ও. থেকে। সেখানেও দলীয়করণ হয়েছে। আমি ক্ষমা চেয়ে নিয়েই আপনাকে বলছি, দলীয়করণ করতে করতে আপনাকেও কিন্তু ছাড়েনি মাননীয় স্পীকার। কারণ ঐ চেয়ারটায় যখন বসেন, তখন স্পীকার কিন্তু কোনো দলের থাকতে পারেন না। স্পীকারকে সব সময় নির্দলীয় থাকতে হয়। এটাই নিয়ম। আমরা কাউলের 'Practice and Procedure of Parliament' বইতে দেখি, সেখানে কী আছে? 'Speaker's Seat' সম্পর্কে বলা হয়েছে "In India, the presiding officers follow more or less the traditions and conventions established by the Speakers of the British House of Commons. Even during the tenure of Sir Frederick Whyte who was only a nominated presiding officer, the British model of Speakership was generally followed. The presiding officer kept himself completely aloof from party politics.

Speaker Patel disasociated himself from the Swarajist Party of which he was an active member prior to his election and during his entire term of office he kept himself aloof from party interest."

প্রস্তাব উত্থাপন করার সময় মনে হয়েছিল যে সেদিন আমাদের অনেক সদস্য কথা বলতে উঠেছিল, কিন্তু সুযোগ পায়নি মাননীয় স্পীকার। অনেক সময় আমরা এটা দেখি যে, আমাদের নেতারা সুযোগ পায় না। তার ওপর আরও একটি খবর শুনলাম যে, আপনি স্পীকার—এই সংসদের ৩৩০ জন সদস্যের কাস্টোডিয়ান। আমাদের সকলের অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার। আপনি কখনও একতরফা হতে পারেন না। তারপর যখন শুনি আপনি খুলনা বিএনপি'র প্রেসিডেন্ট, মাননীয় স্পীকার এতে পার্লামেন্ট প্র্যাকটিস কি ক্ষুণ্ন হয় না? কথাটা কি সত্য? আপনার কাছ থেকে তো আমরা এটা আশা করি না। আপনি দলমত নির্বিশেষে সব কিছুর উর্ধ্বে থেকে এই সংসদে সকল সদস্যের অধিকার রক্ষা করবেন, সকল সদস্যের আস্থা-বিশ্বাস আপনার ওপর থাকবে, আমরা এটাই চাই।

মাননীয় স্পীকার,

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই, একটি চুক্তি হয়েছিল আমাদের - সে চুক্তিমালায় সই করেছিলেন সংসদের উপনেতা ও চীফ হুইপ এবং আমাদের উপনেতা ও চীফ হুইপ। বলা হয়েছিল সংসদের ভেতরে-বাইরে সর্বক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি বজায় রাখা হবে। সেটা কি কার্যকর হয়েছে মাননীয় স্পীকার?

আজকে সারা দেশে সংসদ সদস্য মোশাররফের মতো আমার কর্মীরাও নির্যাতিত। আজকে প্রশাসনকে দলীয়করণ করা হচ্ছে, যে প্রশাসন প্রজাতন্ত্রের অধীনস্থ কর্মচারীদের কেউ ক্ষমতায় গেলেই দলীয়করণ করতে পারে না। আজকে যারা আওয়ামী লীগের

আমলের কথা তোলেন, তাদের একটি কথাই বলতে চাই যে তখন আর কোন দল ছিল? আওয়ামী লীগ দেশ স্বাধীন করেছিল। প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে হয়েছে আওয়ামী লীগকে, সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হয়েছে আওয়ামী লীগকে, বিডিআর গড়ে তুলতে হয়েছে আওয়ামী লীগকে। তখন তো বিএনপি'র জন্মই হয়নি।

মাননীয় স্পীকার,

অবশ্যই আমাদের অতীত আছে। অতীত ইতিহাস আছে। যাদের অতীত নাই, যাদের ইতিহাস নাই, যাদের ঐতিহ্য নাই—তাদের তো অতীত ইতিহাস নিয়ে কিছু বলার নেই।

আমাদের আওয়ামী লীগের অতীত ইতিহাস আছে, অতীত ঐতিহ্য আছে। আমরা বাংলাদেশের মানুষকে কিছু দিতে পারি আর না পারি, এদেশের মানুষকে আমরা স্বাধীনতা তো দিয়েছি। এ দেশের মানুষ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, আপনারা স্বীকার করেন আর না করেন, সারা বিশ্বের মানুষ স্বীকার করে যে তিনি এদেশের মানুষকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, আত্মপরিচয়ে বাঙালি জাতি হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচয় করেছেন। বাংলাদেশের পতাকাকে বিশ্বের দরবারে উড়িয়েছেন। বাংলাদেশকে মানচিত্রে স্থাপন করেছেন।

আজকে যারা যা কিছু হয়েছেন, বিদেশে যান, এদেশে প্রমোশন পান, এদেশে মন্ত্রী হন, প্রধানমন্ত্রী হন, যারা যা কিছু হয়েছেন—বাঙালি জাতি যদি স্বাধীনতা না পেত তা হলে কেউ ঐ জায়গায় উঠতে পারতেন না। যে যেখানে আছেন, সেখানেই থাকতেন। বলা হয় একদলীয়, বলা হয় বহু কথা। আজকে বলা হয়েছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ে, অবশ্য তোফায়েল সাহেব বলেছেন, রিপিট করতে চাই না। স্বাধীনতা যে ছিল মন্ত্রীরা তো বিভিন্ন সংবাদপত্র কোট করে বিভিন্ন কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে। আর আওয়ামী লীগের দলের অভ্যন্তরেও সবসময় স্বাধীনতা ছিল, তাতে দলের সদস্যদের উক্তি থেকেই সেটা প্রমাণিত হয়।

আমরা এদেশে গণতন্ত্রকে লালনপালন করছি, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যে গণতন্ত্রে উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে আপনি জানেন যে, আমাদের দল 'জনকল্যাণমুখী নতুন অর্থনৈতিক নীতিমালা' ঘোষণা করেছে। আমরা জানি ঐ ধাক্কা মেরে মেরে, ঝাঁকি মেরে মেরে, যেমন সংসদীয় গণতন্ত্র এনেছি, আমরা যে অর্থনৈতিক নীতিমালা দিয়েছি—যে নীতিমালার মাঝে বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি রয়েছে, আমরা আশা করি যে এক দিন বিএনপিও ঐ নীতিমালার আলোকে নীতিমালা গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এই সরকারও ঐ নীতিমালার আলোকে নীতিমালা গ্রহণ করে বাংলার মানুষের মুক্তি আনবে।

আমরা চাই এদেশের মানুষের অধিকার। আজকে যারা অনাস্থা প্রস্তাব এনেছি, তারা এ কথা বলতে চাই যে দেশের মানুষ যেখানে আস্থা হারিয়েছে, দেশের মানুষ যেখানে অনাস্থা দিয়েছে, সেখানে আমরা তো চুপ করে থাকতে পারি না।

আজকে এ কথা ঠিক নয় যে, একটি সরকারের পতন হলে গণতন্ত্র খোয়া যাবে। বিএনপি সরকার অপকর্ম করলে, বলতে গেলেই 'গণতন্ত্র গেল', 'গণতন্ত্র গেল' বলে চিৎকার করবে - গণতন্ত্র কি এতোই ঠুনকো জিনিস, মাননীয় স্পীকার? অনেক রক্ত দিয়ে, অনেক আন্দোলন করে, অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্র এনেছি। আমি একথা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি, সরকারের পতন হলে গণতন্ত্র নস্যাৎ হবে না।

১৯৯০ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর, ৫ই ডিসেম্বর, ৬ই ডিসেম্বর যেভাবে মার্শাল ল ঠেকিয়ে গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করেছি, গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছি, ঠিক সেভাবে আমরা গণতন্ত্রকে রক্ষা করব।

মাননীয় স্পীকার,

বিএনপি সরকারের ক্ষমতায় থাকা না থাকার সঙ্গে গণতন্ত্রের স্থায়িত্বের কোনো সম্পর্ক নেই, এটা আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলতে চাই। আজকে জাতিকে বিভ্রান্ত করা, জাতির মনে সন্দেহ সৃষ্টি করার যে প্রয়াস চালান হচ্ছে, যে, সরকারের পতন হলে গণতন্ত্র যাবে, এটা ঠিক নয়। বিএনপি গণতন্ত্র শিখল কবে? মার্শাল লর মধ্য দিয়ে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসেছিল, মার্শাল লর মধ্য দিয়ে এরশাদ সহেব ক্ষমতায় এসেছিল। মার্শাল লর মধ্য দিয়ে বিএনপি'র জন্ম, মার্শাল লর মধ্য দিয়েই তাদের অগ্রযাত্রা। কাজেই সেখানে গণতন্ত্রের ভাষা যদি শিখিয়ে থাকি, আমরাই শিখিয়েছি, এতে কোনো সন্দেহ নাই।

কিন্তু আজকে আমরা চাই—বিএনপি গণতন্ত্র শিখুক, গণতন্ত্রের প্র্যাকটিস করুক এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতির তারা অনুশীলন করুক। গণতন্ত্রের যে মূল কথা সহনশীলতা, সমঝোতা—তারা শিখুক। কিন্তু আমরা সহযোগিতা করেছি, সহযোগিতার মধ্য দিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তন করে তাদের ক্ষমতার স্থায়িত্বকাল দীর্ঘায়িত করতে সহযোগিতা করেছি।

মাননীয় স্পীকার,

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আজকে ঘোষণা করছি যে বিএনপি'র ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব, আমরা বিরোধী দল থেকে নিতে পারি না। কাজেই আজকে রাষ্ট্র পরিচালনায় তাদের অযোগ্যতা, অদক্ষতা, অব্যবস্থা, দলীয়করণ ও সন্ত্রাস করে জনজীবনে যে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং আজকে জনগণের মাঝে যে আস্থাহীনতা এসেছে সেখানে আমরা কোনো দিনই তাদের সহযোগিতা করতে পারি না। কোনো দিনই তাদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারি না। তারই কারণ হিসেবে জনগণের যে অভিমত, সেই অভিমতের প্রতিফলন ঘটিয়ে আজ আমরা এই অনাস্থা এনেছি। আমরা আশা করব, জনগণের এই রায় বিএনপি সরকার মেনে নেবে।

আপনাকে ধন্যবাদ, মাননীয় স্পীকার।

খোদা হাফেজ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

জাতীয় সংসদে বিরোধী দল আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের উপর গত ১২ই অগাস্ট ১৯৯৩ প্রদত্ত ভাষণ

বাংলাদেশ-ভারত যুক্ত ইসতেহার দেশ ও জাতির স্বার্থ পরিপন্থী

মাননীয় স্পীকার,

প্রথমে একটি বিষয়ে উল্লেখ করতে চাই, জাতীয় সংসদের কার্য উপদেষ্টা কমিটিতে যে সভা হয় সে সভা অনুসারে কথা ছিল তিন ঘণ্টা আলোচনা হবে। সরকারি দলের পক্ষ থেকে এক ঘণ্টা ও বিরোধী দলের পক্ষ থেকে দু'ঘণ্টা আলোচনায় অংশ নেয়া হবে। কার্য উপদেষ্টা কমিটিতে যে সিদ্ধান্ত হয়, সে অনুসারে সংসদ চলে, সংসদ চলা উচিত। লক্ষ করলাম যে কালকের আলোচনা দীর্ঘ হল, কিন্তু একটি পর্যায়ে আপনি সংসদ মুলতবি করে চলে গেলেন কী কারণে— কালকে শেষ হল না, বিষয়টি এখনও বিরোধী দলের কাছে বোধগম্য নয়। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

মাননীয় স্পীকার, যে-বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি— ভারতীয় ভাষায় 'অপারেশন পুশ ব্যাক', বাংলাদেশের ভাষায় 'পুশ ইন'। আজকে বাংলাদেশের সীমান্তে একটা অশান্ত এবং উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এটা শুধু ভারতীয় সাইডে নয়, আমাদের সারা বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা, সেটা বার্মা সীমান্ত ও ভারত সীমান্ত, উভয় দিকেই একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি রয়েছে। সেজন্য আমরা সত্যই অত্যন্ত চিন্তিত এবং উদ্বিগ্ন। ভারতে বসবাসকারী বহু নর ও নারীকে বাংলাদেশের সীমান্ত দিয়ে জোর করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ফেরত পাঠাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা শুধু অযৌক্তিকই নয়, অমানবিকও বটে। এবং সে কারণে আমরা মনে করি যে আজকে আমাদের উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। এটা দু'প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে যে বন্ধুত্বসুলভ সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে পারত, এ পরিস্থিতি তার পরিপন্থী বলে আমরা মনে করি।

মাননীয় স্পীকার, আজকে জনাব বদরুদ্দোজা চৌধুরী সাহেব, তাঁদের পূর্ববর্তী সরকার অর্থাৎ এরশাদ সরকারের আমলের একটা যুক্ত ইশতেহারের কথা এখানে উল্লেখ করেছেন। তবে সেখানে একটু ভাষা ও শব্দের তারতম্য আছে, কারণ সেখানে বলা হয়েছে 'ইললিগ্যাল মুভমেন্ট', আর আমাদের বর্তমান সরকার যে যুক্ত ইশতেহারে স্বাক্ষর দিয়েছেন তাতে তারা ব্যবহার করেছেন 'ইললিগ্যাল ইমিগ্রান্ট'। 'ইললিগ্যাল ইমিগ্রেশন' আর 'ইললিগ্যাল মুভমেন্ট' এক নয়।

মাননীয় স্পীকার,সেই ১৯৪৭ সাল থেকেই উভয় দেশে মানুষের আসা-যাওয়া চলেছে। বহু নরনারী বাংলাদেশ থেকে ভারতে, ভারত থেকে বাংলাদেশে চলাচল করেছে। উভয় দেশে স্থায়িভাবে বসবাসও করেছে।

মাননীয় স্পীকার, আপনি নিশ্চয় স্মরণ করবেন এবং আমি বর্তমান সরকারকেও

স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, ১৯৭১ সালে যারা শরণার্থী হয়ে গিয়েছিল, দেশ স্বাধীন হবার পর আওয়ামী লীগ সরকার ঘোষণা দিয়েছিল যে, ২৬শে মার্চের পূর্বে যারা ভারতে গমন করেছে আমরা তাদেরকে গ্রহণ করব না। ২৬শে মার্চে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের ফলে যারা দেশত্যাগ করেছে, শরণার্থী হয়েছে তারা কেবল বাংলাদেশের নাগরিক হবে। আমরা মনে করি, যারা শরণার্থী হয়েছিল তারা দেশে ফিরে এসেছে এবং এর পর থেকে এদেশে একটা স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করছিল। এই ভারতীয় 'পুশ ব্যাক' বা বাংলাদেশের 'পুশ ইন' ঘটনার পূর্বে অবৈধভাবে বা বেআইনিভাবে কোন অনুপ্রবেশের কথা সরকার আমাদের জানায়নি। আমরাও এ বিষয়ে কিছু জানতে পারিনি। ভারতে এভাবে এত অনুপ্রবেশ ঘটেছে সে কথাও আমরা জানিনি। আজকে সেটা যদি হয়ে থাকে আমার প্রশ্ন থাকবে ভারত সরকারের কাছে, যে তাদের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী আছে, যদি বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ করে থাকে তা হলে তাদের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী নিশ্চয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত। তারা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে একতরফাভাবে হাজার হাজার নরনারীকে বলপূর্বক বাংলাদেশে প্রেরণের চেষ্টা কেন করছে এবং এটাকে আমরা কখনোই সঙ্গত বলে মনে করি না। বরং এই পরিস্থিতি আজকে একটা অশান্ত অবস্থা ও সীমান্তে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করছে। তবে এ বিষয়ে একটি ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে গতকাল পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে ভাষণ দিয়েছেন, তার ভাষণের পঞ্চম নং প্যারাটি আমি উল্লেখ করতে চাই।

মাননীয় স্পীকার আপনিও লক্ষ করবেন এবং বর্তমান সরকারকেও আমি বিষয়টি লক্ষ করতে অনুরোধ করব, এখানে তিনি বলছেন যে, "বাংলাাদেশের স্বাধীনতার পরে সত্ত্বরের শেষার্ধে ...." আজকের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, তিনি কি স্বাধীন বাংলাদেশের মন্ত্রী? বাংলাদেশের স্বাধীনতা কবে হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ কবে হয়েছে তা কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানেন না ? আজকে তিনি লিখেছেন "স্বাধীনতার পরে সত্তুরের শেষার্ধে" অথচ ১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্বাধীনতায় আদৌ বিশ্বাসী কি না, অবশ্য তিনি তো মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন না। বোধহয় দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন কি না, সে প্রশ্ন আজকে আমি রাখছি। আজ আমার দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র হচ্ছে কিং না, এই কথার মধ্যেও আমরা সেই ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার, আজকের বর্তমান বিএনপি সরকার ভারতের এই 'পুশ ব্যাক অপারেশন' বা বাংলাদেশের 'পুশ ইন' নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। বদরুদ্দোজা চৌধুরী সাহেব নিজেই বলেছেন যে ভারতের বহু পত্র-পত্রিকা এ বিষয়ে উল্লেখ করেছে। এটা বাস্তব। আমরাও জানি যে ভারতের বহু পত্র পত্রিকা যতদূর সম্ভব শুরু থেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

আমিও তা হলে প্রশ্ন করি যে, ভারতের পত্র-পত্রিকা যখন উদ্বেগ প্রকাশ করল,

যখন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় (বদরুদ্দোজার ভাষায়) এডিটরিয়াল লিখল, তখন বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং দিল্লিতে আমাদের যে কূটনৈতিক মিশন রয়েছে, তারা কি ঘুমিয়ে ছিলেন? সেটাও সরকারের কাছে জিজ্ঞাসা করি। তখন কেন তাঁরা পদক্ষেপ নেননি? তখন তাঁদের কোনো উদ্বেগ আমরা কেন দেখিনি? সে প্রশ্ন আমিও রাখছি। আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতির এই ১১ নং প্যারাতে আছে যে, 'ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে বিরাটাকারে বিরূপ প্রচারণার মধ্য দিয়ে গত ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৯২ তারিখে ১৩২ জন ভারতীয় বাংলাভাষী নাগরিককে ভারত থেকে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া হয়। এবং এই ১৩২ জনকে বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে কিন্তু বাংলাদেশ সরকার অস্বীকার করেনি।

মাননীয় স্পীকার, আজকে যে যুক্ত ইশতেহার নিয়ে কথা হচ্ছে, তার ১১ নং অনুচ্ছেদে লেখা আছে "Taking into account the problems being caused due to large scale illegal immigration of people across their borders they expressed their determination to stop illegal movement of people across the border" এখানে লক্ষ করবেন, "across their borders" আর এখানে চলে আসছে "across the border by all possible means including the strengthening of existing arrangements and mutual cooperation in this regard".

আমি প্রশ্ন করি, আজকে প্রধানমন্ত্রী নেই, আমি আশা করেছিলাম আজকে প্রধানমন্ত্রী এখানে থাকবেন। কারণ, আমার প্রশ্ন আমি তাকেই করতে পারি। এবং কেন তিনি উপস্থিত নেই সে প্রশ্নও আমি রেখে যাচ্ছি। আমার প্রশ্ন এই যে, 'Large Scale' এটা বলতে তাঁরা কী বোঝান? এবং 'ইললিগ্যাল ইমিগ্রেশন'-এর ব্যাখ্যা তার কাছে চাই। এবং এই যে 'Large Scale' তারও ব্যাখ্যা চাই। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা বলেছেন যে, 'arrangement',এই 'arrangement' তাঁরা কী করে এসেছেন? এই ১১ অনুচ্ছেদে যে বিষয়টি লক্ষণীয় যে, তারা কিন্তু কোনো সময় নির্ধারন করেনি। যেখানে আমরা দাবি করছি স্বাধীনতার এই ২০ বছরে, যারা শরণার্থী হয়ে গিয়েছিল বা ফেরত আসছে, এ ধরনের কোনো পরিস্থিতি আজ ছিল না। আজকে এই ১১ অনুচ্ছেদে আপনি লক্ষ করবেন, যেখানে কোনো সময় নির্ধারণ করা হয়নি। তা হলে প্রশ্ন সেই আটচল্লিশ সাল থেকে এ পর্যন্ত সময় তারা ধরেছেন কি না। সেটাও আমাদের একটা প্রশ্ন রয়ে গেল। সরকারের কাছে প্রশ্ন, আজকে জাতি এই উদ্বেগজনক অবস্থায় পড়েছে কেন? এবং এই অবস্থা কেন সৃষ্টি হল? এই অবস্থা যে সৃষ্টি হয়েছে এখানে বাংলাদেশ সরকার কেন সময়মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি?

আজকে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর করলেন, যুক্ত ইশতেহার হল, এবং সেখানে কী লেখা হয়েছে আপনারা দেখেছেন এবং তার পরই এই সমস্যার সৃষ্টি হল। এটা অত্যন্ত রহস্যজনক বলেই আমরা মনে করি। আজকেও

প্রধানমন্ত্রী অনুপস্থিত, কাজেই তাঁর সফরের পরই এই পরিস্থিতি যে তীব্র আকার ধারণ করেছে এবং এই কার্যকলাপ সম্পর্কে আমরা সংসদকে জানাতে চাই যে প্রধানমন্ত্রী সংসদে উপস্থিত না থেকে এই পরিস্থিতির কোনো গুরুত্বই দিচ্ছেন না, আজ জাতির কাছে এটাই প্রতীয়মান হচ্ছে। আমি আশা করব বিএনপি'র পররাষ্ট্রমন্ত্রী, যেহেতু প্রধানমন্ত্রী নেই, সেহেতু এই যে বিপুল সংখ্যক লোক অনুপ্রবেশ করেছে, এবং এই Large Scale-এর ব্যাখ্যা তঁারা সংসদকে দেবেন।

এই বিপুলসংখ্যক লোক প্রবেশ করেছে এর কী তথ্যাদি, কী প্রমাণাদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে আছে, তার ব্যাখ্যা আমি সংসদে দাবি করছি। এবং এটা সংসদের একটা দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরকালে স্বীকার করে এসেছেন যে 'ইললিগ্যালি মুভমেন্ট' হয়েছে— তার প্রমাণ বিবিসির সাউথ এশিয়া সার্ভের ভাষ্য ৩০/৯/৯২ তারিখে স্পষ্ট, "The Bangladesh authority say that very few of its national are living, illegally in India." অর্থাৎ বিএনপি সরকার নিজে স্বীকার করে এসেছেন যে, বাংলাদেশি ন্যাশনাল ভারতে অবৈধভাবে বসবাস করছে। এটা বাংলাদেশ সরকারই স্বীকার করে এসেছে। আমাদের প্রশ্ন, দেশের ভেতরে এসে তারা অস্বীকার করছেন, আর ভারতে গিয়ে তারা স্বীকার করে এসেছেন কেন? রহস্যটা কী?

মাননীয় স্পীকার, বাংলাদেশ একটা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। কিন্তু আমার মনে হয় এই স্বাধীনতার ২০ বছরে আজকের বিএনপি সরকার বাংলাদেশকে একটা কূটনৈতিক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এ ধরনের কূটনৈতিক বিপর্যয় বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কোনোদিন ঘটেনি। এই সঙ্গে আমি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করি, তিনি যে স্বীকার করে এসেছেন কবে কত তারিখে কীভাবে কারা গিয়েছে তার কোনো তথ্য তাঁর কাছে আছে কি না? ভারতে গিয়ে কূটনৈতিক চাপের মুখে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী নতি স্বীকার করে এসেছেন এবং বাংলাদেশের সম্মান ক্ষুণ্ন করে এসেছেন। শুধু তাই নয়, এই বিপুলসংখ্যক অনুপ্রবেশকারী বা লোক ভারতে রয়েছেন, তাদের ফেরত পাঠাবার ব্যাপারে এই ১১ নং অনুচ্ছেদে পাওয়া যায় যে প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকারকে আশ্বাসও দিয়ে এসেছেন। এই আভাসটাও আমরা ১১ অনুচ্ছেদে ভালোভাবে পড়লে দেখতে পাই। আজকে আমরা লক্ষ করছি যে ভারত সরকার (অবশ্য সংবাদপত্রে যে রিপোর্ট পেয়েছি) আমাদের সীমান্ত বরাবর ভারতীয় এলাকায় ২৮৮৪ কিলোমিটার সীমান্ত সড়ক নির্মাণ এবং ৮৮৬ কিলোমিটার কাঁটাতারের বেড়া তৈরি করবে এবং আরও অনেক ধরনের বাধা সৃষ্টি করবার তারা চেষ্টা করছে। আজকে আমার প্রশ্ন যে, এই সড়ক এবং কাঁটাতারের বেড়া—এটা প্রধানমন্ত্রীর সম্মতিক্রমে ভারত সরকার করছে কি না? এসব ব্যাপারে এই যুক্ত ইশতেহারে একটা সহযোগিতার আভাস রয়েছে, যা বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী বলে আমরা মনে করি। সেইসঙ্গে আমি বিএনপি সরকারের কাছে প্রশ্ন রাখছি যুক্ত ইশতেহারে যা করেছেন আর পত্রিকায় যা দিয়েছেন, গোপনে

আর কী কী চুক্তি আপনারা করে এসেছেন, আর কত কনসেশন দেবেন? কনসেশন দেবার আভাস বা স্বীকারোক্তি দিয়ে এসেছেন, আজকে বাংলাদেশের জনগণ তা আপনাদের কাছে জানতে চায়। যে কারণে আজকে বাংলাদেশ সীমান্তে এই অশান্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা এই সরকারের কূটনৈতিক ক্ষেত্রে যে চরম একটা ব্যর্থতা তার নজির হচ্ছে রোহিঙ্গা সমস্যা।

মাননীয় স্পীকার, আপনার মনে আছে, এই সংসদে যখন রোহিঙ্গা সমস্যা শুরু হয়, শরণার্থী আসতে শুরু করে, তখনই আমরা বিষয়টা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলাম এবং এর সমাধান করার জন্য আমরাও ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলাম। তখন আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন, উনি বিষয়টি Silent diplomacy দিয়ে সমাধান করবেন। Silent diplomacy হল একেবারে নীরব কূটনীতি অর্থাৎ কবরের শান্তি নিয়ে তিনি সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু Quiet deplomacy-র কথাটা ব্যবহার করেননি। পরে আমরা বলার পর তিনি বলেছিলেন। কাজেই উনি এমনই Silent হয়ে গেলেন মাননীয় স্পীকার, যখন পরে দু'লক্ষ আশি হাজার শরণার্থী আমাদের ঘাড়ে চেপে বসল, তখন উনি আবার তড়িঘড়ি করে মায়ানমার সরকারের সঙ্গে একটা চুক্তি করলেন। তখন আমরা বলেছিলাম যে, এই চুক্তি করবার সময় জাতিসংঘের কোনো প্রতিনিধির সামনে করা উচিত। কারণ মায়ানমারে তখন মিলিটারি ডিকটেটর ক্ষমতায় রয়েছে, যার কারণে শরনার্থীরা দেশে ফিরে যাবার মতো আশ্বস্ত বোধ করে না। তাদের বিশ্বাস ও আস্থা আনার জন্য জাতিসংঘের একজন প্রতিনিধির এখানে থাকা উচিত। কিন্তু জাতিসংঘের কোনো প্রতিনিধি না নিয়ে আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী চুপকে চুপকে মায়ানমারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এমনই এক চুক্তি করলেন যে, আজ পর্যন্ত কোনো শরণার্থীকে সেখানে ফেরত পাঠাতে পারলেন না। সংবাদপত্রে এবং প্রচারযন্ত্রে যতই তিনি প্রচার করুন না কেন, যেখানে প্রায় তিন লক্ষ শরণার্থী সেখানে আজ বিশ জন, কাল চল্লিশ জন, পরশু পঞ্চাশ জন এইভাবে যদি ফেরত পাঠানোর ঘোষণা হয়, তা হলে যে কত বছর লেগে যাবে এই শরনার্থী ফেরত পাঠাতে সেই প্রশ্ন আমি এই সংসদের মাধ্যমে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে রেখে গেলাম। শুধু তাই নয় আজ সেখানে যে অবস্থা কী সৃষ্টি হয়েছে! মাননীয় স্পীকার, আপনি জানেন, সেখানে শরনার্থী শিবিরে অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা যাচ্ছে। সেখানে গোলাগুলিতে অনেক শরনার্থী মৃত্যুবরণ করেছে। সেখানে আমাদের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষাকারী সংস্থার সঙ্গে গোলাগুলি চলছে। এই এলাকা নিয়ে একটা ষড়যন্ত্র, একটা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে একটা ষড়যন্ত্র চলেছে, যেজন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আমরা উদ্বিগ্ন। কারণ আমরা জানি সেখানে জামাত-শিবিরসহ সাম্প্রদায়িক দল এবং আর. এস. ও. (R.S.O.) চরমপন্থীদের যোগসাজসে একটা সশস্ত্র গেরিলাযুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে, যা কিনা তথাকথিত সেই আরাকান রাজ্য, আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনির অংশসহ আরাকান রাজ্য সৃষ্টির

এক পরিকল্পনা নিয়ে চরম ষড়যন্ত্র চলছে। আমিজানি না, যেখানে অবস্থা এই রকম উদ্বেগজনক সেখানে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়বা আমাদের প্রধানমন্ত্রী বা আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কী পদক্ষেপ গ্রহণকরছেন— যেখানে আমার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন আজ বিরাট হুমকির সম্মুখীন।

এই মায়ানমার চুক্তির সময় জাতিসংঘের প্রতিনিধি না রেখেইউ এন এইচ সি আর (U.N.H.C.R.)-এর সঙ্গে যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টিহয়েছে, ফলে জাতিসংঘের যে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা আমাদের দেশ পেত, আমি মনে করি এই জটিল অবস্থায় সেই শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা থেকে আমাদের জাতিকে এই সরকার বঞ্চিত করেছে বলে আমরা মনে করি মাননীয় স্পীকার তাদের ভুলের এই খেসারত একদিন আমাদের এই বাঙালি জাতিকেই দিতে হবেএবং দিতে হচ্ছেও। আজকে যে চুক্তি তারা মায়ানমারের সঙ্গে করেছে, সে-চুক্তি তারা বাস্তবায়নকরতে পারনি। এ চুক্তি ছিল Premature. যে কারণে আজ তা পূর্ণ বাস্তবায়ন করবার মতোদক্ষতা বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেখাতে পারেননি। আজ এই দু'সীমান্তে যে অশান্ত পরিবেশ,এটা কী করে তারা মোকাবেলা করবেন সেটাই আমাদের প্রশ্ন।

মাননীয় স্পীকার, আজ কথা বললে বহু কথা আসে, তিন বিঘা করিডোরের কথা সরকার বলেছেন। তিনবিঘা করিডোর আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ইন্দিরা গান্ধী যে চুক্তি করেছিলেন তাতে ছিল তিন বিঘা করিডোরের একটা স্থায়ী সুবন্দোবস্ত হবে। কিন্তু আজকে সেখানেসেই চুক্তি অনুযায়ী স্থায়ী সুবন্দোবস্ত হয়নি। আপনি জানেন, সেখানে কয়েকটি ঘণ্টা নির্দিষ্ট করা আছে, সেই ঘণ্টানুযায়ী লোকজন যাতায়ত করতে পারে। সেখানে পূর্ণ অধিকার বাংলাদেশ পায়নি। কাজেই এটা নিয়ে খুব বেশি বড়াই করবার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না।

আজকে ফারাক্কার পানি নিয়ে কথা। এই যুক্ত ইশতেহারেআমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে কথা বলেছেন আমি মনে করি সেখানে ফারাক্কা অর্থাৎ গঙ্গার পানি বণ্টনের ক্ষেত্রেও যতটুকু গুরুত্ব পাওয়া উচিত ছিল সেই গুরুত্ব তাঁরা দিতে পারেননি। বরং তার সঙ্গে তিস্তা এবং অন্যান্যনদী মিলিয়ে ফেলে গঙ্গার পানি বণ্টনের গুরুত্ব তাঁরা নষ্ট করেছে। শুধু তাই নয়, বঙ্গবন্ধুর সময় এই ফারাক্কা নিয়ে যে চুক্তি হয়েছিল সেখানে ছিল ৪৪ হাজার কিউসেক পানি বাংলাদেশ পাবে। শুধু তাই নয়, শুষ্ক মৌসুমে যদি পানি কমও হয়, তা হলে তার ৮০ ভাগ পানি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাংলাদেশ পাবে। ভারত পাক আর না পাক, বাংলাদেশ তার ৮০ ভাগ পাবে, অগ্রাধিকারভিত্তিতে পাবে, এই সেফটিক্লজ সেই চুক্তিতে ছিল যা বর্তমানে নেই মাননীয় স্পীকার। আমরা ৪৪ হাজার কিউসেক পানি এনেছিলাম, তাঁরা ২৫ হাজারের জন্য কান্নাকাটি করেও একফোঁটা পানিও আনতে পারেননি। দিল্লি থেকে প্রধানমন্ত্রী একঘটি গঙ্গার জলও আনেননি বাংলাদেশের মানুষের জন্য।

মাননীয় স্পীকার, আজকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, তার জন্মলগ্ন থেকেই বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে। বাংলার মানুষের যে কোনো দুঃসময়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। এই আওয়ামী লীগ সংগঠনই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এদেশের স্বাধীনতা এনেছে। আজ বাংলাদেশের দু'টি সীমান্তে যখন অশান্ত পরিবেশ, এবং যার কারণ হচ্ছে বর্তমান সরকার, আজ তাদেরই অযোগ্যতা, অদক্ষতা, অব্যবস্থার কারণে এই জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

আজ আরও একটি বিষয় বদরুদ্দোজা চৌধুরী সাহেব বলেছেন, পাবর্ত চট্টগ্রামে যে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে সেটা নাকি ১৯৭৩-৭৪-এর । আজ আমি স্পষ্টভাবে বলতে চাই '৭৩-৭৪ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে কোনো শরণার্থী সীমান্ত অতিক্রম করে যায়নি। গিয়েছে ১৯৭৭-৭৮ সালে যখন জেঃ জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় ছিলেন, তখনই এই জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। '৭৩-৭৪ সালে সেটা ছিল তখন উপজাতীয়রা উপজাতীয় হিসেবে স্বীকৃতি চেয়েছিল। তারা তাদের কালচারাল অটোনমি চেয়েছিল। সেটা পরবর্তী কালে মানবেন্দ্র লারমার সঙ্গে চুক্তি হয় এবং আমাদের সরকারের সঙ্গে তিনি যোগদান করেন। তাদের সঙ্গে একটা সমঝোতা হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার পর সামরিক শাসন জারি হয় এবং মিলিটারি ডিকটেটর ক্ষমতায় এসে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে জটিল অবস্থার সৃষ্টি করে, অশান্ত পরিবেশ সৃষ্ট করে। সেখান থেকেই বহু চাকমা দেশ ছেলে অন্য দেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়, এটা নিশ্চয় বর্তমান সরকার স্বীকার করবেন। এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাবার জন্য মাননীয় স্পীকার আমরা এর রাজনৈতিক সমাধান করতে চেয়েছি। আমরা বারবার দাবি জানিয়েছি, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে একটা রাজনৈতিক স্থায়ী সমাধানে আসতে হবে। কিন্তু সেখানে আমরা জানি নানা জটিলতা, নানা খেলা এবং এখনও বহু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, সেটা সুপরিকল্পিতভাবে ঘটানো হচ্ছে যার দৃষ্টান্ত 'লোগাং হত্যাকাণ্ড', যে হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট একতরফাভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। আজ উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের দোষ ঢাকার চেষ্টা আর যাই হোক বাংলাদেশের সচেতন মানুষ কোনো দিনই মেনে নেবে না। কাজেই উপনেতা বদরুদ্দোজা চৌধুরী সাহেব যা বলেছেন মোটেই তা সঠিক তথ্য বলে মেনে নেওয়া যায় না।

আজকে আমি একটি কথাই বলতে চাই যে, এই যুক্ত ইশতেহারের ১১ অনুচ্ছেদ, সম্পূর্ণভাবে আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের স্বার্থের পরিপন্থী। তাই আমার সুস্পষ্ট প্রস্তাব থাকবে এই ১১ অনুচ্ছেদ যে-কোনোভাবে হোক বাতিল করতে হবে। সীমান্তে ভারত থেকে আর একটি নাগরিকও যেন 'পুশ ব্যাক' করা না হয়, বা বাংলাদেশের সীমান্ত দিয়ে 'পুশ ইন' করা না হয়, তার জন্য সরকারকে যথাযথ বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির

সঙ্গে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে তা দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সম্মানজনক সমাধান করতে হবে। সরকার যদি এটা করতে ব্যর্থ হয় তার দায়-দায়িত্ব বর্তমান সরকারকে নিতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা এনেছি, বিএনপি সরকারের বালখিল্যতা বা তাদের রাষ্ট্র চালানোর অব্যবস্থা ও অযোগ্যতার কারণে বাংলাদেশের মানুষ তার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হারাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তা কোনো দিন মেনে নেবে না।

বাংলাদেশের জনগণ কোনো দিন তা মেনে নেবে না। মেনে নিতে পারে না। আপনাকে ধন্যবাদ মাননীয় স্পীকার ।

জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা'র প্রস্তাব

"যেহেতু আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লংঘন করে ভারতের একতরফা 'পুশ ব্যাক' অপারেশনের কারণে বাংলাদেশ সীমান্তে এক জটিল ও অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এবং হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিককে বাংলাদেশে 'পুশ ইন' করার ফলে নারী-পুরুষ-শিশুদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে— সেহেতু এই সংসদ এহেন আচরণের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছে।

যেহেতু গত ২৮শে মে ১৯৯২ ইং বাংলাদেশ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের স্বীকৃত যুক্ত ইশতেহারের ১১নং অনুচ্ছেদ বাংলাদেশ স্বার্থের পরিপন্থী ও দেশের জন্য অসম্মানজনক এবং উক্ত অনুচ্ছেদ বর্তমানে সৃষ্ট পরিস্থিতির মূল কারণ, সেহেতু এই সংসদ যুক্ত ইশতেহারের ১১ নং অনুচ্ছেদ এই সংসদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয় বলে অভিমত ব্যক্ত করছে।

এই সংসদ দ্বিপাক্ষিক আলোচনার ভিত্তিতে সম্মাজনকভাবে এই সমস্যা সমাধান করার অভিমত ব্যক্ত করছে। ভারত যাতে আর কোনো বাংলাভাষাভাষী নাগরিককে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে 'পুশ ইন' করাতে না পারে তার জন্য বাংলাদেশ সরকারকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবার জন্য এবং ভারতকে পুশ ব্যাক বন্ধ করবার আহ্বান জানাচ্ছে।

২০.১০.৯২ তারিখে জাতীয় সংসদে ভারতীয় 'পুশ ব্যাক' বিষয়ে সরকারের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত ভাষণ

অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে আমরা জাতির নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

আওয়ামী লীগের কাউন্সিলর, ডেলিগেট, কর্মী ভাই ও বোনেরা—

আপনারা আমার সংগ্রামী অভিনন্দন ও আন্তরিক অভিবাদন গ্রহণ করুন।

১. জাতীয় জীবনের বিশেষ এক মুহূর্তে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এই কাউন্সিল অধিবেশনে আজ আমরা সমবেত হয়েছি। চার দশকের অধিক কাল ধরে বাংলার মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনগণের সঙ্গে আওয়ামী লীগের সম্পর্ক হচ্ছে অবিচ্ছেদ্য। জাতীয়জীবনের সকল ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এদেশের সর্বস্তরের দেশপ্রেমিক জনগণের একক রাজনৈতিক সংগঠন—জনগণের স্বার্থরক্ষায়, জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনে ও বাস্তবায়নে আওয়ামী লীগের কোনো বিকল্প নেই। জনগণের প্রত্যাশা, এবারের কাউন্সিল অধিবেশনও জাতিকে সঠিক ও নবতর দিক নির্দেশনা দিতে সক্ষম হবে।

২. বাঙালির হাজার বছরের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যকে সামনে রেখে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর সমগ্র জীবনের শ্রম, মেধা ও সাধনা দিয়ে, জীবন ও যৌবনের সযত্ন পরিচর্যায় গ্রামের তৃণমূল পর্যায় হতে আওয়ামী লীগ গড়ে তুলেছিলেন। বাঙালির জাতিসত্তা গঠনে, জাতীয় বিমূর্ত চেতনাকে রাজনৈতিক আদর্শের কাঠামোয় দাঁড় করানোর ক্ষেত্রসমূহে, জাতির ভাষা, কৃষ্টি ও আত্মপরিচয়ের বিভ্রান্তি অপনোদনে, স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির পথনির্ণয় ও নির্দেশনার প্রতিটি পর্যায়ে সংগ্রামে-সাহসে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব ছিল তুলনারহিত, অনন্যসাধারণ। সংগ্রামের পথে সকল প্রলোভন, ক্ষমতার মোহাচ্ছন্নতাকে অতিক্রম করে জনগণ—শুধুমাত্র জনগণের জন্যই নির্বিচার, নির্যাতন, আত্মত্যাগ ও আত্মবলিদানের নব নব সোপান অতিক্রমের লক্ষ্যাভিসারী অগ্রযাত্রা আওয়ামী লীগকে মহিমান্বিত করেছে যুগ যুগ ধরে। এ রক্তাক্ত সোপানের ধারায় জানা-অজানা লাখো শহিদের প্রতি জানাই অযুত শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা জানাই বিগত পনের বছরের স্বৈরাচারী শাসনকালে নিহত ও নির্যাতিত জনতা, নেতা ও কর্মীদের।

সর্বোপরি, শ্রদ্ধা নিবেদন করি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের এবং ঐ একই রাতে নিহত অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে। শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতা মরহুম সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, এম. মনসুর আলী এবং এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান-এর প্রতি, যাঁদের নির্মমভাবে জেলখানায় হত্যা করা হয়েছিল। পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালার নিকট সকল শহিদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতা কেবলমাত্র নয় মাসের যুদ্ধের মধ্য দিয়েই অর্জিত হয়নি—এই স্বাধীনতার জন্য জাতিকে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে সুদীর্ঘ চব্বিশ বছরের সংগ্রামের পটভূমি তৈরি করতে হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকদের সৃষ্টি সাম্প্রদায়িক বিষবৃক্ষের ফল দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গড়া পাকিস্তানের শাসকরা তাদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রথমেই আঘাত করেছিল বাঙালির ভাষার উপর—বায়ান্নর একুশের মহান শহিদরা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে প্রাণ দিয়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।

বাঙালি জাতিসত্ত্বা নির্মাণে অকুতোভয় সংগ্রামের পাশাপাশি গণমানুষের স্বার্থের একমাত্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লগিকে গড়ে তোলেন। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে হাজার বছরের লালিত স্বপ্ন, শত সংগ্রামে অগণিত মানুষের মহান আত্মদান, অপরিসীম কষ্ট ও লাঞ্ছনা, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ৬-দফা আন্দোলনই ছিল যথার্থভাবে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম সর্বাত্মক সংগ্রাম। পাকিস্তানি শাসকরাও বুঝতে পেরেছিল যে, জাতীয়তাবাদের দুর্জয় চেতনাকে ধ্বংস করতে হলে শেখ মুজিবকে ফাঁসির রশিতে নিঃশেষ করতে হবে। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজিয়ে তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু সেদিন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও মাথা নত করেননি তিনি। বাঙালির স্বার্থে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করেছিলেন। ঊনসত্তুরের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানে সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ফাঁসির কাঠগড়া থেকে ছিনিয়ে এনেছিল তাদের প্রিয় নেতাকে। আপন অন্তরঙ্গতায় 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। বাংলার মানুষের সেই দুর্বার গণসংগ্রামে পতন ঘটেছিল স্বৈরাচারী আইয়ুবশাহীর। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছিল সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট।

গণআন্দোলনের মুখে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া সত্তুর সালে নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। সত্তুরের নির্বাচনে সারা পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার পরও পাকিস্তানের সামরিক শাসকরা সেদিন আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা দিতে চায়নি। ষড়যন্ত্রের পথ ধরেই সেনাশাসক ইয়াহিয়া একাত্তরের পহেলা মার্চ তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ১লা মার্চ থেকে সমগ্র বাঙালি জাতি পাকিস্তানি শাসনযন্ত্রকে অচল করে দিয়ে সর্বাত্মক অসহযোগিতার পথে নেমে আসে। মুক্তি ও স্বাধীনতার লক্ষ্যে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলার জনগণকে একটি সর্বাত্মক গেরিলা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেন। ১৯৭১-এর মার্চ মাসে বাংলাদেশ ছিল কার্যত স্বাধীন। একের পর এক ইয়াহিয়া কর্তৃক সামরিক শাসন বিধি জারি হলেও তা ছিল অকার্যকর, বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৩২ নম্বর বাড়ি হতে ঘোষিত ও নির্দেশিত পথেই পরিচালিত হয়েছে সেদিন বাংলার রাষ্ট্রযন্ত্র —মূলত স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২৫শে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানি

হানাদার নরপশুরা জনগণের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা নির্বিচারে চালাল গণহত্যা। আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হল। আওয়ামী লীগকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য সমগ্র দেশব্যাপী চলল নির্বিচারে আক্রমণ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জাতির পিতা ঘোষণা করলেন বাংলার স্বাধীনতা। নির্দেশ দিলেন—"পুলিশ হোক, সেনাবাহিনী হোক, আওয়ামী লীগ হোক, ছাত্র হোক, যে সেখানে আছে পশ্চিমাদের বাংলা থেকে খতম না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাও। বাংলাদেশ স্বাধীন।" ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করল। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে, নেতৃত্বে ও নির্দেশে বাংলার জনগণ স্বাধীনতার জন্য মরণপণ লড়াই করেছে। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতা।

৪. দীর্ঘদিনের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, বঞ্চনা-বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ও নির্দেশে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা অর্জন করে।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তার দোসররা শুধুমাত্র ৩০ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা ঘৃণ্য পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করে দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে। দেশের ভৌত অবকাঠামো ছিল বিধ্বস্ত। কলকারখানা ছিল অচল। আর্থিক কাঠামো বলতে কিছু ছিল না। পাকিস্তানিরা বহু কলকারখানা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া করে ফেলে রেখে গিয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সরকারকে এ সব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিতে হয়। ব্যাংক, বীমা এবং শিল্পের কয়েকটি গুরুত্বপুর্ণ খাত জাতীয়করণ করা হয় যার অধিকাংশই ছিল পাকিস্তানিদের মালিকানাধীন। তৎকালীন পরিস্থিতিতে এ ছিল জনগণের কাঙ্ক্ষিত চাহিদা ও সময়ের দাবি।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন সরকার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পরিচালিত করেছিলেন দুটি ভাগে—প্রথমত, পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন এবং দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন।

তিন কোটি ছিন্নমূল মানুষ, এক কোটি শরণার্থীর প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন সমস্যা, দেড় কোটি অগ্নিদগ্ধ ঘরবাড়ি, অনাবাদী জমি, অচল বন্দর, ডুবন্ত নৌযান, শূন্য খাদ্য গুদাম—তখনকার অবস্থা ছিল এমনি ভয়াবহ। চারদিকে ধ্বংসস্তূপ। তদুপরি জাতিসংঘের স্বীকৃতি-প্রতিবন্ধকতা, মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধজনিত কারণে তেলের মূল্যবৃদ্ধির অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ ছড়ানো-ছিটানো অস্ত্র, স্বাধীনতা বিরোধীদের অন্তর্ঘাত ও নাশকতামূলক তৎপরতায় জনজীবন ছিল বিপর্যস্ত। এমনি অবস্থায় সদ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত অগ্নিদগ্ধ দেশে, প্রকট সমস্যাজর্জরিত দেশে বৈরী পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্র-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের বিষয়টি ছিল বঙ্গবন্ধুর সরকারের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। বঙ্গবন্ধু সরকার সে চ্যালেঞ্জ সাফল্যজনকভাবে মোকাবিলা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ ও ভৈরব সেতুসহ ৫৬৭টি সেতু নির্মাণ ও মেরামত, ৭টি

নতুন ফেরি, ১৮৫১টি রেলওয়ে ওয়াগন ও যাত্রীবাহী বগী, ৪৬০টি বাস, ৬০৫টি নৌযান ও ৩টি পুরাতন বিমান চালু করে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ছাড়া, মাইন উদ্ধার করে অচল বন্দরসমূহ সচল করা হয়।

পাকিস্তানিদের পরিত্যক্ত ব্যাংক, বীমা ও ৫৮০টি শিল্প ইউনিট যা ছিল সম্পূর্ণরূপে দেউলিয়া ও প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত সেগুলো জাতীয়করণ ও উৎপাদনক্ষম করে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন নতুন শিল্প কলকারখানা গড়ে তোলার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

'জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস' এই ঘোষণা দিয়ে ১৯৭২ সালের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন, মদ-জুয়া-হাউজি-ঘোড়দৌড়সহ সমস্ত ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড কার্যকরভাবে নিষিদ্ধকরণ, ইসলামী ফাউন্ডেশন গঠন ও মাদ্রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা, পবিত্র হজ্বব্রত পালনে সরকারি অনুদান প্রদান, ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদ লাভ ইত্যাদি ছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

কৃষক ও কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল পাকিস্তান আমলের বকেয়া খাজনাসহ ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা চিরতরে মওকুফ, কৃষিঋণের কয়েক লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহারসহ ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ, চাষীদের জন্য সহজ শর্তে কৃষি ঋণদানের ব্যবস্থাকরণ, বিনা মূল্যে কীটনাশক ঔষধ, স্বল্পমূল্যে সার, বীজ ও যৎসামান্য ভাড়ায় পাওয়ার পাম্প ও গভীর নলকূপ সরবরাহ ইত্যাদি।

ভারত হতে প্রত্যাবর্তনকারী ১ কোটি লোকের পুনর্বাসন ও দেশের অভ্যন্তরে ৩ কোটি ছিন্নমূল মানুষের জন্য খাদ্যসংস্থান, ৩ মাসের মধ্যে ভারতীয় সৈন্যদের ফেরত পাঠানো ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ফিরিয়ে নেয়া, মুক্তিযুদ্ধে নিহত ৩০ লাখ শহিদ পরিবারকে আর্থিক সাহায্য ও ২ লাখ নির্যাতিতা মা-বোনের দায়িত্ব গ্রহণ, পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য বিদেশ প্রেরণ, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট ও নারী পুনর্বাসন বোর্ড গঠন, শিক্ষকদের সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দান, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গণতান্ত্রিক অধ্যাদেশ প্রণয়ন, ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন, জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে এবং সরকারি কর্মকাণ্ডে বাংলা ভাষা প্রচলন, ১১ হাজার নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনসহ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ পুনর্নির্মাণ, প্রতি থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ও হাসপাতাল নির্মাণ এবং অস্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীদের স্থায়ী চাকুরের মর্যাদা দান, জাতীয় সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীসহ প্রতিরক্ষা বাহিনীকে জাতীয় মর্যাদায় পুনর্গঠন এবং কুমিল্লায় দেশের প্রথম সামরিক একাডেমী স্থাপন, পুলিশ, বি.ডি.আর. আনসার ও বেসামরিক প্রশাসনের অবকাঠামো গড়ে তোলা, পাকিস্তানে আটক প্রায় ৪ লক্ষ বাঙালিকে দেশে ফিরিয়ে এনে পুনর্বাসিত করা, ৭ লক্ষ পাকিস্তানি ফেরত পাঠানো, বাঙালি জাতি ও বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি এবং জাতিসংঘে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলায় প্রথম

ভাষণদান, জাতিসংঘের সদস্যপদ ও ১৪০টি দেশের স্বীকৃতিলাভ এবং প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সীমান্ত চুক্তি ও ফারাক্কার পানির বণ্টন চুক্তিতে বাংলাদেশের জন্য ৪৪ হাজার কিউসেক পানির ব্যবস্থা—মাত্র সাড়ে তিন বছরে এসব কার্যক্রম ছিল অনন্য সাফল্যের উদাহরণ।

পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন কাজ সম্পন্ন করে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলে অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু যখন দ্বিতীয় বিপ্লবের যুগান্তকারী কর্মসূচী ঘোষণা করেন, তখন স্বাধীনতাবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে।

৫. রাজনৈতিক অবস্থা ঃ বর্তমান প্রেক্ষাপট

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবিধান বহির্ভূতভাবে হত্যা করে স্বাধীনতা, প্রগতি, মানবতাবিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল ঘাতকচক্র রাষ্ট্র ক্ষমতাদখল করে এবং মার্শাল ল জারি করে। দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক রাজনৈতিক ধারার পরিবর্তে সামরিকতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়। জনগণের সকল অধিকারকে অস্ত্রশক্তির মাধ্যমে পদানত করা হয়—জনগণ হয় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বারবার ক্ষমতার পরিবর্তন হতে থাকে, আর তার অশুভ ফলাফল দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে থাকে। সশস্ত্রভাবে ক্ষমতা দখল ও সেই ক্ষমতাকে কুক্ষিগত রাখার লক্ষ্যে নানা চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রে প্রাণ দিতে হয় দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী এবং বহু সেনা-আফিসার ও সদস্যদের। অদম্য ক্ষমতা লিপ্সা ও গোষ্ঠীগত স্বার্থরক্ষা, দেশকে আত্মঘাতী সংঘাতে লিপ্ত রাখা, সর্বোপরি 'জাতিকে বিভক্ত করো, জনগণকে বিভক্ত করো, দলকে বিভক্ত করো'—এই 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতির কৌশলে ক্ষমতা কুক্ষিগত ও ভোগ করার নীতি দেশকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দেয়—।

ক্ষমতা দখল করে সেনা ছাউনি হতে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দল গঠন শুরু হয়। লোভ, লালসা ও অনুগ্রহ বিতরণের মাধ্যমে রাজনীতির অঙ্গনকে কলুষিত করার নীতি ও দেশে নীতিবিবর্জিত আদর্শহীন ও অসৎ রাজনীতির গোড়াপত্তন শুরু হয়।

দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে স্বাধীনতা ও সমাজপ্রগতির শত্রুরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ ও রাষ্ট্রীয় চার মূল নীতিকে ধ্বংস করেছে। স্বাধীনতার ধারাকে উল্টে দিয়ে পাকিস্তানি ধারার ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িকতা ও স্বনির্ভর অর্থনীতির পরিবর্তে বিদেশি নির্ভরশীলতা এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যেখানে আমাদের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বিপন্ন। পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের আদলে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের বিভ্রান্তি আজ বাঙালি জাতিসত্ত্বাকে বিভক্ত ও বিপন্ন করে তুলেছে। মৌলবাদের হিংস্র আগ্রাসন ও নিষ্ঠুরতা বাংলাদেশে নব শক্তিতে ও মাত্রায় উজ্জীবিত। তাদের সঙ্গে বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতার ভাগাভাগিতে উলঙ্গ নীতিবিবর্জিত আঁতাত সমগ্র বাঙালি জাতিকে পুনরায় শঙ্কিত করে তুলেছে। সাম্প্রদায়িক শক্তির পুনর্বাসন ও

সর্বব্যাপী উত্থানে '৭৫-পরবর্তী শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ মদদ দেশকে আজ পুনরায় পাকিস্তানি প্রেতাত্মাদের হিংস্র থাবায় আবৃত করেছে। বাঙালি জাতি ও জাতিসত্ত্বা এবং আত্মপরিচয়ের প্রশ্নটি আজ পুনরায় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে পড়ছে।

বাংলাদেশের রাজনীতি আজ দুটি মৌল ধারায় বিভক্ত ঃ স্বাধীনতার ধারা ও পাকিস্তানি ধারা। '৭১-এর এবং '৭৫-এর ঘাতকরা আজ একই মঞ্চে সংগঠিত। এ অবস্থায় এবারের কাউন্সিলের কর্তব্য হবে জাতিকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান এবং সেই লক্ষ্যে জাতিকে পরিচালিত করা।

এই অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মূল্যবোধ, শোষণমুক্ত সমাজ ও জনকল্যাণমূলক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বিজয়ী করতে হলে প্রাথমিকভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারাকে উজ্জীবিত করতে হবে। সেই লক্ষ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারায় জাতিকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করা, সাম্প্রদায়িক চেতনা ও শক্তিকে নির্মূল করা এবং দেশকে স্বাধীনতার ধারায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার নিরলস সংগ্রাম চালাতে হবে।

প্রিয় কাউন্সিলার ও ডেলিগেট ভাইবোনেরা,

৬. ১৯৮১ সালের ১৭ই মে প্রিয় মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তনের পর হতে সেনাশাসনের শৃঙ্খলে জনমনে সৃষ্ট হতাশা, নৈরাজ্য দূরীকরণ এবং আর্থসামাজিক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং মানবিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সর্বস্তরের ও সকল শ্রেণী-পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে নব উদ্দীপনার জোয়ার সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল। সামরিক অভ্যুত্থানে জেনারেল জিয়া নিহত হলে বিশেষ গোষ্ঠীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ও আঁতাত করে বিচারপতি আবদুস সাত্তার ক্ষমতায় আসীন হলেও দুর্নীতি, অদক্ষতা ও অব্যবস্থার কারণে তার পক্ষে ক্ষমতায় থাকা সম্ভব হয়নি।

১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ জেনারেল এরশাদের ক্ষমতাগ্রহণের একদিন পরে ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে গণতন্ত্রকামী জনগণের পক্ষে জাতীয় স্মৃতিসৌধে এক সমাবেশে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের আহ্বান জানিয়েছিলাম। তারপর হতে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও সামরিক শাসনের অবসানের লক্ষ্যে দেশে ও বিদেশে সামরিক ফরমান ও স্বৈরাচারের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে আমরা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করি।

আপনারা জানেন, ১৯৮৩ সনের মধ্য ফেব্রুয়ারিতে গণবিরোধী শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ ছাত্র মিছিলের উপর গুলিবর্ষণ করে অর্ধ শতাধিক ছাত্র-জনতাকে হতাহত করা হয়। ঐদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে শহিদের লাশকে সামনে রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ঃ "শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না—সামরিক শাসনের পতন না ঘটানো পর্যন্ত আন্দোলন-সংগ্রাম চলবেই।" এই ঘোষণার পর ক্রুদ্ধ সামরিক চক্র সকল সভ্য আচরণের বিপরীতে চোখ বেঁধে আমাকে ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যায় এবং ১৫ দিন বন্দি করে রাখে।

আওয়ামী লীগ এমন এক সংগঠন, যে সংগঠন কোনো স্বৈরাচারী ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের রক্তচক্ষুর নিকট মাথা নত করতে জানে না। স্বৈরাচারী এরশাদবিরোধী আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৪ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২৯শে ফেব্রুয়ারি এবং ১৯৮৫ সনের ২রা মার্চে আমাকে বারবার গৃহবন্দি ও অন্তরীণ করা হয়। আমি বারবার বলেছি যে, অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলকারী সামরিক স্বৈরাচারের অবৈধ কার্যক্রম আমরা মানতে বাধ্য নই। ১৯৮৬ সালে অক্টোবর মাসে বগুড়ায় সামরিক আইন বিধি ভঙ্গ করে বিশাল জনসভা করলে আমাকে আবারো বন্দি করা হয়। ১৯৮৭ সনের ১০ই নভেম্বর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের 'সচিবালয় ঘেরাও' কর্মসূচী পালন উপলক্ষে যখন গুলি ছোঁড়া হয়, তার এক পর্যায়ে শহিদ হন আমাদের প্রিয় সন্তান নূর হোসেন, বাবুলসহ আরো অনেকে।

৭. স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনের অংশ হিসেবে সাংবিধানিক ধারায় গণবিচ্ছিন্ন স্বৈরশাসক এরশাদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া মোকাবিলা করার লক্ষ্যে ১৫ দলীয় ও ৭ দলীয় জোটের দুই নেত্রী ১৫০টি করে জাতীয় সংসদের আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এমনকি, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরকারও নিষেধাজ্ঞা জারি করে। এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রীট করা হয়। নীতিগতভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত করে জোটগতভাবে ১৮০টি ও ১২০টি আসন ভাগ করে সম্মিলিতভাবে নির্বাচনে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

কিন্তু রাতের অন্ধকারে স্বৈরশাসন দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য সামরিকচক্রের ইঙ্গিতে ৭-দলীয় জোট নির্বাচন হতে আকস্মিকভাবে সরে দাঁড়ায়। জনগণের ঐক্যবদ্ধ মানসিকতায় ফাটল ধরিয়ে কোন অদৃশ্য শক্তির ইঙ্গিতে সেদিন ৭-দলীয় জোট নির্বাচনে কেন অংশগ্রহণ করেনি, দেশবাসীর কাছে তা আজ পরিষ্কার। সেদিন সম্মিলিতভাবে একযোগে নির্বাচনে অংশ নিলে স্বৈরশাসনের পতন যে অনিবার্য ছিল এ কথা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। জনগণের স্বার্থ, গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার যাবতীয় অঙ্গীকারের সঙ্গে বিশ্বাসভঙ্গ করে অকস্মাৎ তারা নির্বাচন হতে সরে দাঁড়াল। অথচ জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এরশাদের পতন ত্বরান্বিত করা। আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস, সেদিন সকল জোট ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলে স্বৈরাচারের দীর্ঘস্থায়ী নির্বিচার লুটপাট, দুঃশাসন, সন্ত্রাস এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা থেকে ঐ সময়েই দেশ ও জাতিকে উদ্ধার করা সম্ভব হত।

১৯৮৬ সনে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনকারী দলগুলোর বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচারের মুখেও জনগণ স্বৈরতন্ত্রের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের লক্ষ্যে নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করে। কিন্তু স্বৈরাচার সেই বিজয়কে ভোট ডাকাতি, ছিনতাই ও কারচুপির মাধ্যমে সর্বোপরি ভোট গণনা আকস্মিকভাবে বন্ধ করে 'মিডিয়া ক্যুর' মাধ্যমে জনগণের আকাঙ্ক্ষিত বিজয়কে ছিনিয়ে নিলে এরশাদের স্বৈরাচারী মুখোশ এবং

স্বৈরশাসকদের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের নমুনা দেশ ও বিদেশে উন্মোচিত হয়ে পড়ে।

যারা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে বলে থাকে যে ১৯৮৬ সনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ ১৫ দলীয় জোট নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে এরশাদের পতন হত—তাদের কাছে প্রশ্ন, ১৯৮৮ সনের নির্বাচনে কোনো জোট অংশগ্রহণ না করার পরেও কেন স্বৈরাচারী এরশাদের পতন ঘটেনি?

আমি বারবার বলে এসেছি —'এক জেনারেলের পরিবর্তে আমরা অন্য কোনো জেনারেলের শাসন চাইনে।' আমরা চাই সাংবিধানিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাক এবং ক্ষমতা পরিবর্তনের মূল শক্তি হিসাবে জনগণকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছি।

প্রিয় কাউন্সিলার ও ডেলিগেট ভাইবোনেরা,

৮. আমরা চেয়েছিলাম বাংলার মাটিতে যেন আর কোনোক্রমেই সংবিধান বহির্ভূতভাবে ক্ষমতার হাতবদল না ঘটে। সেজন্য আমরা স্বৈরশাসক এরশাদের শাসনামলের সকল অসাংবিধানিক পন্থা, হত্যা, ক্যু ও চক্রান্তের রাজনীতির চির-অবসানে জাতীয় সংসদে দৃঢ় ও বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করি। ১৯৮৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদে আমি বলেছিলাম, "জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কোনো সামরিক জান্তা বা সামরিক স্বৈরশাসক প্রবর্তিত আইন কখনো পাস করতে পারে না। অস্ত্রের মাধ্যমে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীদের বৈধতা দেবার জন্য আমরা সংসদে আসিনি—এসেছি গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও জনগণের হৃত অধিকার আদায়ের জন্য।"

আন্দোলনের অংশ হিসেবে আমরা নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলাম। সংসদের ভেতরে ও বাইরের রাজপথে গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে আমরাই স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের নতুন ধারা সৃষ্টি করি। জাতীয় সংসদে ও সংসদের বাইরে সামরিক আইন বাতিল এবং প্রশাসন সামরিকীকরণের জন্য আনীত জেলা পরিষদ বিলসহ কতিপয় গণবিরোধী বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। সেদিন অনেকেই জনগণের এই আন্দোলনে শরীক বা আন্তরিক ছিলেন না, বরং ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলে সক্রিয় ছিলেন।

১৯৮৭ সালের ৩রা জানুয়ারি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কাউন্সিল দলকে সুসংহত ও সুসংগঠিত করে স্বৈরশাসন উৎখাতের ও সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ঘোষণা করে। সেই লক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশা, বুদ্ধিজীবী-আইনজীবী, ছাত্র-শ্রমিকদের নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা হয়। সংসদে প্রতিরোধ ও রাজপথের আন্দোলনে দিশেহারা স্বৈরাচারী এরশাদ ১৯৮৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর সংসদ বাতিল করতে বাধ্য হয়। তার পূর্বেই ১১ই নভেম্বর হতে দীর্ঘ ১ মাস আমাকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়।

১৯৮৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি চট্টগ্রামের লালদিঘীর জনসভায় যোগদানকালে লক্ষ জনতার মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে প্রায় শতাধিক ব্যক্তি নিহত হয়। স্বৈরতন্ত্রের পতন

ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এই ঘটনা অনাগত কালের ইতিহাসে একটি মাইল ফলক হিসেবেই উল্লিখিত থাকবে। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে গণআন্দোলন একটি বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হলে আমরাই 'এক দফা এক দাবি' স্লোগান দিয়ে আন্দোলনকে সামনে এগিয়ে নিই। আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানের পর্যায়ে উপনীত হয়।

সাংবিধানিক ধারাবাহিকতায় জোটসমূহ হতে দাবিকৃত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার বিষয়ে জনমনে ব্যাপক সংশয় দেখা দেয়। জাতি হয়ে পড়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। সেই অবস্থায় একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের উপর স্বৈরাচারের পতন শর্তাধীন হয়ে পড়ে। জাতির ইতিহাসের এই ক্রান্তিলগ্নে স্বৈরাচারের সকল বাধা-নিষেধ সন্ত্রাস উপেক্ষা করে ঐতিহাসিক জাতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনে জনগণের পক্ষে আমি ১৯৯০ সনের ৬ই নভেম্বর ঢাকার পান্থপথে এক বিশাল জনসভায় সংবিধানের ৫১ ও ৫৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরের রূপরেখা ঘোষণা করি। জনগণ স্বৈরাচার পতনের দিকনির্দেশনা পেয়ে আন্দোলনকে ব্যাপকতর ও দুর্বার করে তোলে।

আন্দোলনের তীব্রতায় ১৯৯০ সালের ২৭শে নভেম্বর জেনারেল এরশাদ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলে পুনরায় আমাকে বঙ্গবন্ধু ভবনে অন্তরীণ করা হয়। এই অন্তরীণের প্রতিবাদে জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং ঢাকাসহ সমগ্র দেশে আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপ লাভ করে। আওয়ামী লীগের নেত্রী হিসেবে আপনাদের ঐতিহাসিক গৌরব এই যে, আমার ঘোষিত রূপরেখা অনুযায়ী জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়।

৯. দীর্ঘ ১৫ বছরের স্বৈরশাসকদের দুঃশাসনে নিষ্পেষিত জনগণ বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শত অপপ্রচার, কালো টাকার খেলা, অশুভ আঁতাত এবং সূক্ষ্ম কারচুপির মধ্যেও আওয়ামী লীগকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমর্থন দান করলেও সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করতে পারেনি। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের শতকরা ৩৮% ভাগ পেয়েও ক্ষমতায় যেতে পারেনি। অপর দিকে, বিএনপি শতকরা মাত্র ৩১% ভোট পেয়ে সদস্যসংখ্যা বেশি হওয়ায় আজ ক্ষমতাসীন।

বিগত এক বছরের মধ্যে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, বিএনপি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মূল্যবোধের অঙ্গীকার ও তিন জোট ঘোষিত রূপরেখার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। রাজনীতি আজো ক্যান্টনমেন্টে বন্দি। স্বয়ং বেগম খালেদা জিয়া, যিনি একজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী হিসেবে দাবি করে থাকেন, তিনি নির্বাচনের পূর্বে এবং নির্বাচনের পরে সরকার গঠনের প্রশ্নে লক্ষ শহীদের রক্ত মাড়িয়ে কুখ্যাত নরঘাতক স্বাধীনতাবিরোধী জামাত প্রধান গোলাম আজমের সঙ্গে দেখা করে নির্বাচনী আঁতাত ও ক্ষমতা ভাগ-বাঁটোয়ারার সমঝোতা করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

স্বাধীন বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন এই সরকারের সঙ্গে স্বাধীনতাবিরোধী জামাত শিবিরের এই অশুভ আঁতাত ও সমঝোতা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের উপর এক

বিরাট আঘাত। স্বাধীনতাবিরোধী জামাত শিবির আজ সরকারি মদদে, উৎসাহে, পৃষ্ঠপোষকতায় মুক্তিযোদ্ধাদের উপর আঘাত হানছে, আধুনিক স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নিয়ে সমগ্র দেশে ঘাতকবাহিনী গঠন করেছে ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

১০. শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার উদগ্র বাসনা ও চক্রান্তের পরিণতিতে বর্তমান সরকার স্বাধীনতাবিরোধীদের হাতের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করছে। ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে আঁতাতের ফলে জামাতে ইসলামী পাকিস্তানি নাগরিক গোলাম আজমকে সাংবিধানিক ধারা লংঘন করে সংগঠনের প্রধান বানানোর ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে।

আইনের শাসন এবং ন্যায়বিচারের পথ রুদ্ধ থাকায় সংবিধান লংঘন করে দেশদ্রোহী নরঘাতক গোলাম আজমের বিচারের দাবিতে জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি প্রকাশ করে। নরঘাতক যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমের বিচারের দাবিতে শহিদ-জননী জাহানারা ইমাম, দেশবরেণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর মুক্তিযুদ্ধ সংগঠকদের নিয়ে গঠিত হয় গণআদালত। ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যে স্থানে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা ও মুক্তির ডাক দিয়েছিলেন, যেখানে পরাজিত পাকিস্তানি সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করেছিল— সে স্থানে গণআদালত নরঘাতক গোলাম আজমের বিচার করে এবং জনগণ তার কৃত অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডযোগ্য রায় ঘোষণা করেন এবং সরকারের নিকট এই রায় বাস্তবায়নের দাবী জানান। কিন্তু বাঙালি জাতির নির্মম পরিহাস এই যে, স্বাধীনতার স্বপক্ষের দেশপ্রেমিক জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত এই গণরায়ের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো হল না, বরং শহিদ-জননী ও দেশবরেণ্য দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে এই সরকার সমগ্র মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে কলঙ্কের কালিমা লেপন করেছে।

বিগত জাতীয় সংসদ অধিবেশনে মুক্তিসংগ্রামী জনগণের পক্ষে আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছি, আন্তর্জাতিক ক্রাইম অ্যাক্ট '৭৩ অনুসারে বিশেষ ট্রাইবুনালে পাকিস্তানি নাগরিক স্বাধীনতাবিরোধী গোলাম আজমের বিচার করতে হবে এবং একই সাথে গণ-আদালতের সংগঠকদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ প্রত্যাহার করতে হবে।

সরকার এই কথায় কর্ণপাত করেনি। জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখার স্বার্থে সংসদ অধিবেশন বয়কট করার মতো সিদ্ধান্ত নিতে আমরা বাধ্য হই। জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে আওয়ামী লীগ কোনোপ্রকার ছাড় দেবে না। গোলাম আজমের বিচার না করে তাকে সেফ-কাস্টডিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এখন পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের করা হয়নি। মূলত সমগ্র দেশ আজ দু' ভাগে বিভক্ত —স্বাধীনতার পক্ষের ও বিপক্ষের। এই কাউন্সিলের মাধ্যমে আমি স্বাধীনতার পক্ষের সকল দল, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিসহ সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতাবিরোধী দল ও তার সহযোগীদের প্রতিহত ও প্রতিরোধ করে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা ও সুসংহত করার উদাত্ত আহ্বান জানাই।

১১. স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের পরাজয়ের প্রেক্ষিতে জাতি আশা করেছিল যে স্বৈরাচারী বিধি ও ব্যবস্থার অবসান হবে, গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু জাতি গভীর শঙ্কার সঙ্গে লক্ষ করছে যে, সত্যিকার সংসদীয় সরকার-পদ্ধতি ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলার পরিবর্তে আজ প্রশাসনকে দলীয়করণ করা হয়েছে। স্বৈরাচারী ব্যবস্থার উচ্ছেদ না করে তাকেই নব স্বেচ্ছাচারের আবরণে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছে। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির অবাধ অনুপ্রবেশ, রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনায় তাদের আদেশ-নির্দেশ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে তাদের নগ্ন হস্তক্ষেপ ও আগ্রাসন জনকল্যাণমুখী স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার পথকে অবরুদ্ধ করে গোটা জতিকে আজ্ঞাধীনতার নাগপাশে ও পরনির্ভরশীলতার শৃঙ্খলে আরো বেশি করে আবদ্ধ করা হচ্ছে।

বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় মুছে ফেলা এবং জাতিসত্ত্বাকে ধ্বংস করার সুপরিকল্পিত চক্রান্ত আজ যেখানে তীব্র, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব যেখানে বিপন্ন, এহেন অবস্থায় আমাদের প্রাথমিক ও প্রধানতম দায়িত্ব এবং কর্তব্য মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মূল্যবোধ ও স্বাধীনতার ধারাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা শোষণমুক্ত সোনার বাংলা বাস্তবায়নের বাস্তব ও বস্তুগত ভিত্তি রচনায় সমগ্র জাতিকে পুনরায় ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অগ্রণী ভূমিকা পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা।

এই বাস্তবতার আলোকে জাতীয় অস্তিত্বের প্রশ্নে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, স্বাধীনতার ধারা, শোষণমুক্ত সমাজ, গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রত্যয়ে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী স্বনির্ভর অর্থনীতি ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারকে সামনে রেখে নতুনতর রণকৌশল গ্রহণ অপরিহার্য। সেই লক্ষ্যে রাজনৈতিক সততা নিয়ে, নির্মোহ মন নিয়ে, বাস্তব অবস্থার নিরিখে রূঢ় সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই কাউন্সিল হতে জাতিকে নবতর যাত্রার দিকনির্দেশনা পেতে হবে ।

১২. সমগ্র বিশ্বসহ আমাদের দেশ, জাতি ও সমাজ বিশেষ জটিল বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বিকশিত হচ্ছে। বিবর্তনের এই ধারাবাহিকতায় সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা একটি বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এই অবস্থার আলোকে সমাজজীবনে ও মনোজগতে চিন্তা-চেতনায় ঘটছে পরিবর্তন। সমাজ বিকাশের এই সূত্রের প্রেক্ষাপটে বর্তমান বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করে গণমানুষের দীর্ঘ দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা—মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ১৯৭৮ সাল থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংসদীয় গণতন্ত্রের দাবি উত্থাপন করে আসছে। জনগণের দাবির মুখে বর্তমান সরকার সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠায় বাধ্য হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান ও কার্যকর করতে হলে এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক আলোচনা ও মত বিনিময়পূর্বক বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যমূলক পন্থার উদ্ভাবন। কিন্তু

বর্তমান সরকার সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের ক্ষেত্রে আন্তরিক নয়, বরং তাদের কার্যক্রম সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অন্তরায় সৃষ্টি করছে। যার জন্য —

(১) জাতীয় ঐকমত্য ও সমঝোতার কোনো পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উদ্যোগের অভাব;

(২) অর্থনৈতিকক্ষেত্রে বিকশিত সামাজিক শক্তিসমূহ ও শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ফলাফল সংশ্লেষ ও সমন্বয়ের দিকনির্দেশনা প্রদানে ব্যর্থতা;

(৩) রাষ্ট্রীয় কাঠামোসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও গঠন পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অভাব ও প্রশাসন ও প্রচারযন্ত্রকে দলীয়করণ ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার সর্বনাশা উদ্যোগ, কালাকানুন বহাল রাখা, এবং

(৪) প্রশাসনিক জবাবদিহিতার পরিবর্তে এক ব্যক্তির হাতে স্বেচ্ছাচারী কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ক্ষমতা গ্রহণ করার অশুভ পদক্ষেপ;

(৫) হত্যা, ক্যু ও চক্রান্তের রাজনীতি বন্ধের কার্যকরি পদক্ষেপ গ্রহণে সরকারের অনীহা,

(৬) গণতন্ত্র সুসংহতকরণ এবং উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্তকরণের সঙ্গে কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য দূরীকরণ ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা,

(৭) ন্যায়বিচার ও আইনের শাসনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা অপসারণ না করা এবং প্রশাসন হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণে উদ্যোগী না হওয়া।

১৩. উন্নয়নের স্বার্থেই গণতন্ত্র ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অপরিহার্য। এই লক্ষ্য অর্জনে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জাতীয় ঐকমত্যের ক্ষেত্রসমূহ সনাক্তকরণ এবং সমঝোতার মাধ্যমে জাতীয় দিকনির্দেশনা প্রদান। এ ক্ষেত্রে রাজনীতি ও আর্থসামাজিক স্তরে জাতীয় ঐক্য ব্যতীত বাংলাদেশে স্থায়ী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও প্রকৃত উন্নয়ন অসম্ভব।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি অর্জন, স্বাধীন জাতীয় পুঁজির বিকাশ, আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ নির্মাণ ও সুদৃঢ় জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী পরিকল্পনা এবং ঘোষণা করেছিলেন। জাতীয় ঐক্য নির্মাণে এই পরিকল্পনাতে একটি নিজস্ব, পদ্ধতিগত দিক ও দর্শন বিদ্যমান। এর পূর্ণ বাস্তবায়নের সময় ও যথার্থ সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাংলাদেশে জাতীয় ঐক্যের এই প্রক্রিয়া সফল করতে দেয়া হয়নি।

জনগণের কার্যকর সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই কেবল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি নিশ্চিত করা সম্ভব। এর জন্য জাতীয় ঐকমত্যের মূর্ত অভিব্যক্তির অনস্বীকার্যতা এবং আবশ্যকীয়তাকে সংবিধানে একই সূত্রে গ্রথিত ও কার্যকর করে তুলতে হয়। বঙ্গবন্ধু যথার্থভাবেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টির পেছনে সতত ক্রিয়াশীল থাকে দীর্ঘদিনের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক চেতনা, রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং এতদসংক্রান্ত ধারণক্ষম অভিজ্ঞতা। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ভাষা-সংস্কৃতির লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী

চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ, সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলনের বিপরীতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার, পাকিস্তানি শোষণ অবসান লক্ষ্যে শোষণমুক্ত সমাজগঠনের প্রত্যয় এবং জাতিগঠনের প্রত্যয়ে হাজার বছরের স্বাধীনতার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা এবং সর্বোপরি সশস্ত্র রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত চেতনা এবং মূল্যবোধই হচ্ছে আমাদের জাতীয় ঐক্যের মৌল ভিত্তি। এসব সূত্রসমূহকে বিসর্জন দিয়ে, উপেক্ষা করে, কৌশলে ধোঁকা দিয়ে জাতীয় ঐক্য হতে পারে না।

উন্নত রাষ্ট্রগুলোর দল ও শক্তিসমূহ সর্বদাই জাতীয় ঐক্যের পরিপূরক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। গণতান্ত্রিক দেশসমূহে মূল জাতীয় ইস্যুতে ঐকমত্য সুদৃঢ় ও প্রায় অপরিবর্তনীয়। যেমন, ব্রিটেনে প্রায় নির্দিষ্ট ধরনের অর্থনীতিক ব্যবস্থা ও কাঠামো, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র, নিয়মিত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারগঠন এবং কতিপয় কনভেনশনের পদ্ধতিগত ব্যবহার, সামরিক ও আমলাতন্ত্রকে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অধীনে ন্যস্ত —এ ব্যাপারে ঐকমত্য বজায় রেখেই উন্নয়ন-কৌশল নির্ণয় ও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মৌলিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই মৌলিক জাতীয় ঐকমত্যকে কেউ চ্যালেঞ্জ করে না বা করতে পারে না। একইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, প্রেসিডেন্সিয়াল গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের প্রাধান্য, নিয়মিত নির্বাচন অনুষ্ঠান ও সরকারগঠন, সামরিক বাহিনী ও আমলাতন্ত্রের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ইত্যাদি ব্যাপারে সেখানে জাতীয় ঐকমত্য সুদৃঢ়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঐকমত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে সাংবিধানিক ঐকমত্যের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে সাংবিধানিক ঐকমত্য হল রাজনৈতিক ঐকমত্যের মূর্ত রূপ।

কিন্তু ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবিধান-বহির্ভূতভাবে হত্যা ও ক্ষমতাচ্যুত করার পর হতেই বাংলাদেশে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে জাতীয় ঐক্যবিনাশী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেই প্রক্রিয়া এখন পর্যন্ত অব্যাহতভাবে ক্রিয়াশীল।

এখানে আমি আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটিয়ে বিগত ২.৭.৯১ তারিখে জাতীয় সংসদে যে ভাষণ দিয়েছিলাম তার অতি সামান্য অংশ তুলে ধরতে চাই। সেখানে আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিলাম, "বাংলাদেশের সংবিধানে এমন কোনো অনুচ্ছেদ সংযোজিত আছে কি যে অনুচ্ছেদের মাধ্যমে মার্শাল ল জারি করার রীতি বা নিয়ম আছে? তা যদি না থাকে, তা হলে মোস্তাক-সায়েম-জিয়া সাহেবরা কিভাবে ক্ষমতায় এলেন? একজন সেনাপতি (জিয়াউর রহমান) রাষ্ট্রপতিকে গিয়ে বললেন যে, রাষ্ট্রপতি আমাকে প্রেসিডেন্ট বানান। রাষ্ট্রপতি বললেন ঃ কেন বানাব? তিনি বললেন ঃ আমাকে বানাতে হবে, আপনি অসুস্থ। সায়েম সাহেব বললেন ঃ না, আমি তো অসুস্থ না। হাতের অস্ত্র যখন বেরিয়ে এল, সায়েম সাহেব বাধ্য হয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমি অসুস্থ। সেদিন কোন গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছিল, সেই গণতান্ত্রিক পন্থা কি '৩৮ বোর রিভলবার বা পিস্তল? আবার আরেক দৃশ্য। বিএনপি সরকারের দুর্নীতির জ্বালায় অস্থির হয়ে বিচারপতি আবদুস সাত্তার মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলেন। সেই সরকারের দুর্বলতা নিয়ে জেনারেল এরশাদ সাত্তার সাহেবকে বললেন ঃ আমাকে প্রেসিডেন্ট বানান— কারণ আপনি অসুস্থ। সাত্তার সাহেব প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে তিনি অসুস্থ নন। কিন্তু

যখন হাতের অস্ত্র বেরিয়ে এল, সাত্তার সাহেব বলতে বাধ্য হলেন, হ্যাঁ, আমি অসুস্থ, আপনিই এখন থেকে রাষ্ট্রপতি।"

গণতন্ত্রের পরিবর্তে হত্যা, ক্যু-এর রাজনীতি, সামরিক শাসন এবং ফরমানবলে দেশশাসনের প্রক্রিয়া, জনগণের সকল মৌলিক অধিকারকে ও জাতীয় ঐকমত্যের মৌল নীতি এবং মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত চেতনা ও আদর্শ মূল্যবোধকে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান রাতারাতি কিভাবে ধ্বংস করেছেন, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেবার প্রয়োজন এখানে নেই। গণতন্ত্রের পরিবর্তে সামরিকতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপরীতে পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদের আদলে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার পরিবর্তে সাম্প্রদায়িকতা এবং শোষণমুক্ত সমাজ বিনির্মাণের বদলে নীতিহীন, আদর্শহীন, গণবিরোধী লুটেরা গোষ্ঠী সৃষ্টি করা হয়েছে। লাখো শহিদের রক্তে অর্জিত জাতীয় ঐকমত্যকে কীভাবে ধ্বংস করা হয়েছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাইনে।

তবে, রূঢ় হলেও নব প্রজন্মের জন্য বলতে দ্বিধা নেই যে, সামরিক শাসক জেনারেল জিয়ার নিজের রাজনৈতিক কোনো আদর্শ ও দর্শন ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন বলে মনে হয় না। ১৯৭৭ সালে রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার, আলবদর, আলশামস, মুসলিম লীগ এবং স্বাধীনতাবিরোধী পাকিস্তানি-চীনপন্থীদের রাষ্ট্রীয়ভাবে পুনর্বাসিত করে, স্বাধীনতাবিরোধী শাহ আজিজকে প্রধানমন্ত্রী ও আলীম-হুদা-মতিন-মান্নান গংদের মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত করতেও তাঁর বাধেনি।

জেনারেল জিয়াউর রহমানই সেই ব্যক্তি যিনি মুক্তিযোদ্ধার পোশাকে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত মূল্যবোধ ও চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করে, মার্শাল ল কায়েম করে হত্যা-ক্যু-ষড়যন্ত্রের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করেন, লক্ষ শহিদের রক্তে অর্জিত স্বাধীন বাংলার রাজনীতির পরিবর্তে পাকিস্তানি ধারার প্রচলন করে বাংলাদেশের আদর্শগত ভিত্তির উপর তিনিই আঘাত হানলেন। পবিত্র ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেন। পাকিস্তানি দ্বিজাতি তত্ত্বের নব ভাষ্যে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী চেতনায় দাঁড় করিয়ে জাতীয় ঐক্য সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হল। অথচ উন্নয়ন, উৎপাদনবৃদ্ধি, প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান ও গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্তই হল জাতীয় ঐকমত্য।

১৫. জাতীয় ঐকমত্য গড়ে তোলার প্রশ্নে অন্য একটি আবশ্যকীয় শর্ত হল ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পরিবার-পরিজনসহ জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি সামরিক ফরমানবলে ইনডেমনিটি প্রদান করা হয়। অব্যাহতি দেয়া হয় আত্মস্বীকৃত খুনীদের। জেনারেল জিয়া এই জঘন্য অধ্যাদেশটিকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেন। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচার করা যাবে না, এই জঘন্য ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্সটি এমন একটি জঘন্য কালো আইন, যেখানে আইনের আশ্রয় লাভের মতো মৌলিক অধিকার রহিত, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ন্যূনতম সুযোগলাভের দ্বার রুদ্ধ এবং যে-আইনে আত্মস্বীকৃত খুনীরা রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে হয় পুরস্কৃত, যে আইন গণতান্ত্রিক সকল রীতিনীতি এবং সাংবিধানিক সকল প্রক্রিয়া ও ধারাবাহিকতার বিপরীতে সদাসর্বদা

হত্যা, খুন, ক্যুদেতা ও চক্রান্তকে উসকে দেয় —সেই জঘন্য কালো বর্বর আইন বহাল রেখে জাতীয় ঐক্য, উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা সফল হতে পারে না। গণতন্ত্র ও উন্নয়নের স্বার্থে যে মুহূর্তে আজ জরুরীভাবে প্রয়োজন জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা— সেখানে এই জঘন্য অর্ডিন্যান্স বহাল রেখে জাতীয় ঐকমত্য ও সমঝোতার পথকে চিররুদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ তুলনামূলক চিত্র

১৬. জাতীয় ঐক্য, আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার ফলে জাতীয়জীবনের সর্বস্তরে অবক্ষয়, দুর্নীতি, অব্যবস্থা, চরম নৈরাজ্যের বলয়ে দেশ আবর্তিত হচ্ছে। উন্নয়নের ধারা, প্রবৃদ্ধির হারের নিম্নগতি, অর্থনৈতিক মন্দা এবং এর স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রবৃদ্ধিহারের ক্রমাগত নিম্নগতি, ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা ও স্থবিরতা, অবনতিশীল ও পুঞ্জিভূত দারিদ্র্য, প্রকটতর দুর্বিসহ বেকারত্ব, উত্তরোত্তর পরনির্ভরশীলতা —অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়বৃদ্ধি —আজকে বাংলাদেশের অর্থনীতির রূঢ় বাস্তবতা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুর্নীতি, চোরাচালান, সম্পদের অপচয়, পুঁজি পাচার, উৎপাদনমুখী বিনিয়োগকে উৎসাহ না দেওয়া ইত্যাদি। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আমরা ইতিমধ্যেই জনকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক মূল নীতিমালা ঘোষণা করেছি।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করে, জাতীয় ঐকমত্য ধ্বংস করে, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশ সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছে। এ সম্পর্কে তথ্য ও পরিসংখ্যান দেয়া যেতে পারে। যেমন ঃ

জাতীয় আয় ঃ বিশ্বব্যাংক রিপোর্ট অনুসারে ১৯৭২—৭৫ সালে জাতীয় আয়বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল শতকরা ৫·৭ ভাগ। ১৯৭৬—৮০ সালে জাতীয় আয়বৃদ্ধির হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪·৭ ভাগে। ১৯৮১—৮৬তে ঐ রিপোর্টে অনুযায়ী আরো হ্রাস পেয়ে এই হার দাঁড়ায় ৩·৬ ভাগে।

খাদ্য উৎপাদন ঃ খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ১৯৭২—৭৩ থেকে ১৯৭৫—৭৬ খাদ্য উৎপাদন শতকরা ৮·৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৬—৮১ সাল পর্যন্ত তা ২·৯ ভাগে হ্রাস পায়। ১৯৮১—৮৬ পর্যন্ত খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ১·৭ ভাগ।

বিদেশি সাহায্য ঃ ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বিদেশি সাহায্য এসেছে ১,০৩১ কোটি টাকা। বিএনপি আমলে বিদেশি সাহায্য এসেছে ১০ হাজার ৬ শত ৮৭ কোটি টাকা এবং এরশাদ আমলে এই সাহায্য এসেছে ৩৭ হাজার ৬ শত ৪১ কোটি টাকা।

বৈদেশিক ঋণ ঃ বঙ্গবন্ধুর আমলে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৮৬ কোটি ডলার। জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদের আমলে তা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে দাঁড়ায় ৩৮০ কোটি ও ১০৩৫ কোটি ডলারে।

দরিদ্র্য ঃ বঙ্গবন্ধুর আমলে অতি দরিদ্র লোকের শতকরা হার ছিল ৫০ জন, আর জেনারেল জিয়া ও জেনারেল এরশাদের আমলে তা যথাক্রমে দাঁড়ায় শতকরা ৬৫ এবং ৮৬ জনে।

বেকারত্ব ঃ আওয়ামী লীগ আমলে বেকারের সংখ্যা ছিল শতকরা ১৫ ভাগ। বিএনপি আমলে তা শতকরা ৩০ ভাগ এবং জাতীয় পার্টির আমলে তা শতকরা ৪২ ভাগে দাঁড়ায়। সংক্ষিপ্তভাবে এসব তথ্যগুলোর মাধ্যমে বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিরাজমান দৃশ্যাবলী ফুটে উঠেছে।

১৭. কিন্তু এই অবস্থা একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের জন্য কাম্য হতে পারে না। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতাসীন হওয়ার পরে এই অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে।

বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রকাশিত ইকোনোমিক্যাল ট্রেন্ড, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো থেকে প্রকাশিত পরিসংখ্যান বুলেটিন ও বিশ্বব্যাংক-এর বিভিন্ন রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করলে বিগত এক বছরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের ব্যর্থতার দিকটি বেরিয়ে আসে। বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের কার্যকরীদিক নির্দেশনার অভাব এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অদক্ষতা ও অব্যবস্থা লক্ষণীয়। এর ফলস্বরূপ দেশের অর্থনীতিতে পড়েছে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া। দেখা দিয়েছে অর্থনৈতিক মন্দা ও বিপর্যয়। জনজীবনকে করে তুলেছে দুর্বিসহ। অভ্যন্তরীণ ও জাতীয় উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির হার বিগত বছরগুলোর তুলনায় সর্বনিম্ন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২·৬%, ২·৯% ভাগে। যেখানে আমাদের দেশের লোকসংখ্যার প্রবৃদ্ধির হার ২·৩০% সেই হিসাবে বাস্তব উন্নয়ন অবস্থায় প্রকৃত প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে মাত্র ০·৩০%, ০·৬০% ভাগ।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিভিন্ন ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী হার সরকারের নিয়ন্ত্রণের ও জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে। জীবনযাত্রার ব্যয়ভার ক্রমে বেড়েই চলেছে। এর প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা নিতে সরকার ব্যর্থ হয়েছে। তাই জনগণ এক নিদারুণ হতাশা ও চরম দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে। বর্তমান সরকারের আমলে গড়ে চাউলের দাম বেড়েছে ১৩%, আটার দাম ১৭%, ডালের দাম ১৫%, মাছের দাম ১৪%, মাংসের দাম ২০%, ডিমের দাম ১১%, শাকসবজির দাম ১৫%, তেলের দাম ২৫%, লবণের দাম ৮০%, মরিচের দাম ১০০%, পিয়াজের দাম ৮০% ও শিশুখাদ্যের দাম ৩৫%। জীবনধারণের মোট ব্যয়ভার গড়ে গ্রামীণ জীবনে বেড়েছে ১৮% এবং শহরে বেড়েছে ১৭%। এই ব্যয়ভার বহনের জন্য জনগণের বৃহত্তর কোনো অংশেরই প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি পায়নি, বরং হ্রাস পেয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে জনগণ প্রকৃত পক্ষে আরো গরিব হয়েছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শিল্পে ও শহরে নিয়োজিত শ্রমশক্তির আসল মজুরি গড়ে ৬% বৃদ্ধি পেলেও প্রকৃত মজুরি কমেছে ১৩% ভাগ। গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত শ্রমশক্তির আসল মজুরি কমেছে গড়ে প্রায় ২০% ভাগ এবং প্রকৃত মজুরি কমেছে ৩৮% ভাগ।

এমনিতেই আমাদের জনশক্তির বিরাট অংশ বেকার ও অর্ধবেকার। প্রতি বছর নতুন করে ২০ লক্ষ জনশক্তি শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। অথচ সরকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেই, বরং বিভিন্ন প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিল্পের

বিভিন্ন শাখায় নিয়োজিত শ্রমিকের হার হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান সরকারের এক বছরে মোট শিল্পে শ্রমিক কমেছে ১০% ভাগ, বস্ত্রশিল্পে ২% ভাগ, ইস্পাতশিল্পে কমেছে ৪% ভাগ, সিমেন্ট শিল্পে ৬% ভাগ, রাসায়নিক সার কারখানার ৭% ভাগ, রং ও বার্নিশ শিল্পে ৯% ভাগ। বিদেশি প্রভুদের আদেশ-নির্দেশমত তাদের খুশি করার জন্য ১ লক্ষ ২৪ হাজার শ্রমিক কর্মচারী ছাটাইয়ের পরিকল্পনা নিয়েছে। এতে করে দেশে শ্রমের বাজারের মধ্যে বিরাট দ্বন্দ্ব ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে —যাতে করে শ্রমের স্বচ্ছ ব্যবহার ও বিকাশের পথে সৃষ্টি হচ্ছে বাধা এবং উৎপাদনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ও ভারসাম্য হচ্ছে ব্যাহত।

গ্রাম, কৃষক, কৃষি এবং কৃষিসংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডই এখন এদেশের অর্থনীতির প্রাণ। কিন্তু বর্তমান সরকারের পরিচালিত কর্মকাণ্ড এদেশে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য কৃষকের জন্য নিশ্চিত করতে পারছে না। কৃষিপণ্যের বিক্রয়মূল্যের এক বিরাট অংশ চলে যাচ্ছে মধ্যস্বত্বভোগীর দখলে। কৃষকের প্রধান অর্থকরী ফসল কাঁচা পাটের দাম বেলপ্রতি কমেছে ১৫% ভাগ এবং সাথে কাঁচা পাটের ব্যবহারও কমেছে ৮ লক্ষ ম্যাট্রিক বেল (৩৮·৬০ লক্ষ মণ)। সময়মত কৃষিঋণ না দেওয়া ও সময়মত সরকারকর্তৃক কৃষিপণ্য ক্রয় না করার ফলে গ্রামীণ জীবনে নেমে আসে বিগত বছরে এক সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ। বহু লোক অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। এই সুযোগে কৃষির সাথে যুক্ত নেই এমন লোকের হাতে জমি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। অনেক ক্ষুদ্র কৃষকই বেঁচে থাকার জন্য দুর্ভিক্ষের সময় জমি বিক্রয় করে ক্ষেতমজুরে পরিণত হয়েছে। অথচ সরকার নীরব থেকে এই প্রক্রিয়াকে আরো তীব্রতর করেছে। কৃষির সাথে যুক্ত নয় এই রকম লোকের হাতে জমি চলে যাওয়ার ফলে অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কৃষি উৎপাদন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এর উপরও সরকার কৃষি উপকরণ, সার, কীটনাশক, বিদ্যুৎ, তেলের দাম কয়েক দফা বাড়িয়ে দিয়ে এদেশের কৃষি অর্থনীতি ও কৃষককে পঙ্গু করে বিদেশি প্রভুদের কৃষিপণ্যের বাজারে পরিণত করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে বর্তমান সরকার। সারের দামবৃদ্ধির ফলে কৃষকের সার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। তাই দেখা যায়, বিগত বছরগুলোতে যখন সারের ব্যবহারের বৃদ্ধির হার ছিল ১২% ভাগ, এই সরকারের আমলে গত ১ বছরে সার ব্যবহারের বৃদ্ধির হার মাত্র ৭% ভাগ।

কর্মসংস্থান, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নে কোনো উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ গত ১ বছরে বর্তমান সরকার করেনি। যদিও দেশে বিনিয়োগের চাহিদা বেড়েই চলেছে, কিন্তু সঞ্চয় বৃদ্ধির জন্য কোনো পদক্ষেপ সরকার নেয়নি। বর্তমান সরকারের বাজেট কৌশল ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড এদেশের অর্থনীতিকে করছে আমদানিভিত্তিক পরনির্ভরশীল। উৎপাদন খাত থেকে অনুৎপাদন খাতে ব্যয় হচ্ছে বেশি। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানি ও আমদানির ব্যবধান ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। রপ্তানি কমে যাচ্ছে, আমদানি বেড়ে যাচ্ছে। আমদানি ব্যবসা ও ব্যবসায়ীকে উৎসাহিত করা হচ্ছে এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিকাশকে করছে বাধাগ্রস্ত। সঠিক উন্নয়নের কোনো দিকনির্দেশনা না দিয়ে শুধু শুধু গালভরা বুলি আওড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে ক্ষমতায় থাকার ধূর্ত কৌশল সরকার গ্রহণ করেছে।

আমরা বিশ্বাস করি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংগ্রাম অনেক কঠিন এবং এ সংগ্রামে রাজনৈতিক প্রবঞ্চনার কোনো সুযোগ নেই। তাই জাতির দীর্ঘদিনের আশা অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে সময়োপযোগী নতুন উন্নয়নের দর্শন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের সামনে তুলে ধরেছে। জনগণই সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রধান শক্তি। জনগণের জন্যই উন্নয়ন । জনকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক উন্নয়নে আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১৮. বিরাজমান দুরূহ অবস্থার পরিবর্তন আমাদের ঘটাতেই হবে। আমাদের অস্তিত্ব, জাতীয় স্বাধীনতা এই অবস্থায় হুমকির সম্মুখীন হতে বাধ্য। এমনিতর অবস্থার প্রেক্ষাপটে নয়া অর্থনৈতিক দিকনির্দেশনা অপরিহার্য। বর্তমান অবস্থাকে বিবেচনায় রেখে অর্থনৈতিক গতিসঞ্চার ও জনকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মাণের জন্য অপরিহার্য বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ—

(ক) রাজনীতির ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্য ও সমঝোতা প্রতিষ্ঠা, সংসদীয় গণতন্ত্রের যথার্থ অনুশীলন, গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করা, সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক চর্চা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অনুশীলন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের পরিপূরক রাজনৈতিক ধারা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রশাসন হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ।

(খ) আমলাতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক জটিলতা দূরীকরণ, প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা, জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তোলা, প্রশাসনকে গতিশীল করা এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের নিরপেক্ষভাবে কর্মসম্পাদনের যথাযথ ব্যবস্থা ও পরিবেশ বজায় রাখা ছাড়াও অযথা সরকারি হস্তক্ষেপ রহিতকরণ।

(গ) অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের ভূমিকা হবে সহায়ক ও সম্পূরকের। রাষ্ট্রীয়খাতকে দক্ষ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও প্রতিযোগী বাজারব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত করা জরুরি।

(ঘ) দারিদ্র্য বিমোচন, দক্ষ ব্যবস্থাপনা, উপযুক্ত শিল্প-উদ্যোক্তা শ্রেণীর বিকাশ, বাজারের প্রতিযোগিতামূলক চরিত্র, পুঁজিবাজারের নির্দিষ্ট বিকাশের সঙ্গে কেবলমাত্র উৎপাদনশীল বিনিয়োগের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক গতিশীলতার লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। সেজন্য অনুৎপাদনশীল ও অপচয়মূলক খাতের ব্যাপক ব্যয়-বরাদ্দ হ্রাস করতে হবে।

(ঙ) সঞ্চয়বৃদ্ধি, পুঁজিগঠন ও সম্পদবণ্টন প্রক্রিয়া এবং বেসরকারিখাতে দ্রুত স্বাবলম্বিতা অর্জনের লক্ষ্যে বিনিয়োগযোগ্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ সমাবেশবৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। কৃষিকে উদ্বৃত্তখাতে পরিণত করতে হবে। রাজস্ব ও করনীতিকে পুনর্বিন্যস্ত করা প্রয়োজন। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও জনগণকে সঞ্চয়বৃদ্ধি ও পুঁজি সংগঠনে—একই সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে সমন্বিত হতে হবে। অপ্রয়োজনীয় সরকারি ব্যয় পরিহার, কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি করা আবশ্যক। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের সঙ্গে সম্পদ পুনর্বণ্টন প্রক্রিয়ার ন্যায়সঙ্গত সম্পৃক্তকরণ অপরিহার্য। সকলের জন্য শিক্ষা, সকলের জন্য স্বাস্থ্য, সকলের জন্য খাদ্য ও বাসস্থানের আওতায় সুনির্দিষ্টভাবে দরিদ্রের জন্য খাদ্য, দরিদ্রের জন্য শিক্ষা, দরিদ্রের জন্য স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের কর্মসূচী অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিতে হবে।

(চ) বাংলাদেশে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক প্রয়োজনীয়তাকে সনাক্ত করে অর্থনীতির গতিশীলতা অর্জনে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে হবে — যাতে উৎপাদনবৃদ্ধি ও স্বাধীন জাতীয় পুঁজি বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। এক্ষেত্রে প্রয়োজনভিত্তিক নীতিমালা তৈরি করা অপরিহার্য।

(ছ) আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঃ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতিতে সন্ত্রাস আজ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সরকারের দুঃশাসনে, প্রশ্রয়ে, আশ্রয়ে ও মদদে সন্ত্রাস আজ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এক দানবীয় রূপ ধারণ করে সমগ্র দেশের সুষ্ঠু জীবন ও নিরাপত্তাকে জিম্মি করে ফেলেছে। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। সন্ত্রাসদমনে সরকারের পক্ষপাতমূলক আচরণ স্বৈরতান্ত্রিক আমলকেও ছাড়িয়ে গেছে। রাজপথ, পাড়া, মহল্লা, শিক্ষাঙ্গন আজ সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। ব্যক্তি ও দলগত সন্ত্রাসকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের অঙ্গীভূত শক্তিতে পরিণত করার নীল নকশা কার্যকরি হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক শক্তি পরিচালিত সন্ত্রাস ও বেপরোয়া অস্ত্রবাজি জনজীবনকে বিপর্যস্ত ও স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে তুলেছে।

জনজীবনে নিরাপত্তা, শান্তি, স্থিতিশীলতা, উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে সন্ত্রাস নির্মূলে সরকারি ব্যর্থতা আজ প্রতিটি নাগরিকের নিকট পরম উৎকণ্ঠার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজ ও রাষ্ট্রীয়জীবন থেকে সন্ত্রাস উৎখাত করতে হলে আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে হত্যা ও ক্যুদেতার রাজনীতির ধারার চিরঅবসান এবং '৭১ ও '৭৫-এর ঘাতকদের বিচার এবং আইনের শাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৯. পার্টি পরিচালনা ঃ গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতা

গণতন্ত্রায়ন ও জবাবদিহিতা এই দু'য়ের সাথে গণতান্ত্রিক মতাদর্শগত ঐক্য, আচরণ ও গণতন্ত্রচর্চা এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিবিকাশের পদ্ধতিগত দিকের বিকাশ এবং নিরবচ্ছিন্ন সাংগঠনিক তদারকি এবং জবাবদিহিমূলক তত্ত্বাবধান পার্টি পরিচালনার ভিত্তি হবে। শৃঙ্খলা, সুচারু কর্মসম্পাদনা, আত্মশুদ্ধি ও আত্মসমালোচনা এবং গণতান্ত্রিকতা হবে নেতা-কর্মীদের মূল্যায়নের মাপকাঠি।

এই লক্ষ্যে, জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের সংগঠনের ঘোষণাপত্র যথাযথভাবে সংশোধন করা হয়েছে। একই সঙ্গে সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপূরক হিসেবে সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দলীয় গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

২০. আমি পূর্বেই বলেছি জনগণের সংগঠন হিসেবে বর্তমান বিরাজমান অবস্থা পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমাদেরকেই দেখাতে হবে পথ, দিতে হবে নবতর দিকনির্দেশনা। '৫২,'৬২, '৬৬, '৬৯, '৭০ এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সফল নেতৃত্বদানে এবং '৭৫-এ জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি রচনা, পুরনো সমাজ ও ঘুণেধরা প্রশাসন ভেঙ্গে ফেলার দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে এবং '৭৫-পরবর্তী দীর্ঘ পনের বছর সামরিক শাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বদানে এবং সর্বোপরি ১৯৯০ সালে আমাদেরকেই একক ও অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়েছে। দিশেহারা হতাশাগস্ত অধিকারহারা জাতিকে স্বাধীনতা ও মুক্তির লক্ষ্যে পথনির্দেশনা ও নেতৃত্ব দিতে হয়েছে। জাতির নিকট

প্রতিশ্রুতিপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হয়েছে। আওয়ামী লীগ তার প্রতিশ্রুত পথ থেকে অতীতেও বিচ্যুত হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। সকল ভয়ভীতি, সন্ত্রাস উপেক্ষা করে জাতীয় জীবনের সকল সমস্যা-সংকট, বিরাজমান ভয়াবহ রাজনৈতিক, আর্থসামাজিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এই কাউন্সিল জাতির সামনে নতুন দিকনির্দেশনা ঘোষণা করতে চায়। এই কাউন্সিল গণতন্ত্র, জাতীয় ঐক্য ও জনকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক নীতিমালা বাস্তবায়নের দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণা করছে।

গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে জনগণের মৌলিক অধিকার, ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, কালাকানুন বাতিল, প্রশাসন হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, রাষ্ট্র প্রশাসন ও প্রচারযন্ত্র দলীয়করণ রহিতকরণ, রাষ্ট্রীয়ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, হত্যা-ক্যু-চক্রান্তের রাজনীতির চিরঅবসান এবং জবাবদিহি-মূলক সংসদীয় গণতন্ত্রের অর্থবহ কার্যকারিতার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার ভিত্তি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধের বাস্তবায়ন, '৭৫-এর আত্মস্বীকৃত খুনীদের বিচারের নিমিত্তে ইনডেমনিটি বিল বাতিল, স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক শক্তি ও তার সহযোগীদের কালো থাবা হতে দেশ, জাতি, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং এর ভিত্তিতে মূল জাতীয় ইস্যুতে ঐকমত্য গড়ে তোলাই হবে আজকের করণীয় দিক।

জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতির নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আওয়ামী লীগের অর্থনৈতিক দর্শন হল জনগণের কল্যাণসাধন। সময়ের প্রেক্ষিতে ও জনগণের চাহিদা অনুসারে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নতুন উৎপাদন কৌশল অবলম্বন জাতীয় স্বার্থেই একান্ত জরুরি। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে নতুন বাস্তবতা ও পরিবর্তিত বিশ্ববীক্ষণের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, উৎপাদনবৃদ্ধি, দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন, ব্যক্তিখাতের অবাধ বিকাশ, স্বাধীন জাতীয় পুঁজি গঠন, উৎপাদনখাতে বিনিয়োগ, অপচয় রোধ, অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয়-বরাদ্দ হ্রাস, সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিখাতের প্রতিযোগিতামূলক বাজারসৃষ্টির মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল জাতিগঠনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জাতির সামনে জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক নীতিমালা ও কর্মসূচী উপস্থাপন করেছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ও নির্দেশে মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে আওয়ামী লীগের সাফল্যজনক ভূমিকা এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আমরা বিশ্বাস করি গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্য সুসংহত-সুদৃঢ়করণে ও জনকল্যাণমুখী অর্থনীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হব, ইনশাল্লাহ।

---

১৯. ৯. ৯২ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ

আমরা বাঙালি
বাঙালি হিসেবেই এদেশ আমরা স্বাধীন করেছি

আমার সংগ্রামী ভাইবোনেরা, সবাইকে আমি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজ ১৪০০ সাল। আমরা একটি শতাব্দী পার হতে চলেছি। নতুন শতাব্দীর আগমনবার্তা ধ্বনিত হচ্ছে।

এই শতাব্দীতে বাঙালি জাতি শতাব্দীর মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পেল তার স্বাধীনতা। বিশ্ব-মানচিত্রে বাংলার পতাকা, বাঙালি জাতির নিজস্ব স্বকীয়তা বিশ্বের দরবারে স্থান করে নিয়েছে। এই শতাব্দীর এটাই হল সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই বাঙালি জাতির শুভ নববর্ষ উদযাপনের জন্য আজকে এই জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি, যে-জায়গা থেকে একদিন ১৯৭১-এর ৭ মার্চ আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঘোষণা দিয়েছিলেন—'এবারেরসংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

বঙ্গবন্ধু ডাক দিয়েছিলেন, 'যার যা কিছু আছে তা নিয়েই প্রস্তুত হও।' এই জাতি সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীকে পরাজিত করেছিল। স্বাধীন করেছিল বাংলাদেশকে, বাঙালি জাতিকে। এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, যেখানে হানাদার পাকবাহিনী ঐ মুক্তিকামী মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে এবং মিত্রশক্তির কাছে পরাজয় বরণ করেছিল, সারেন্ডার করেছিল এই জায়গায়—যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, আমরা এই জায়গায় অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে, শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের এই ১৪০০ সাল উদ্‌যাপন করবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান করতে চেয়েছিলাম, আপনারা দেখেছেন।

স্বাধীন দেশে অনেক রক্ত দিয়ে, অনেক আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা স্বৈরাচারের পতন ঘটিয়েছি ও গণতন্ত্র এনেছি। আজ দুঃখের সঙ্গে এটুকু বলতে হয় যে, সরকার কথায় কথায় নিজেদের গণতান্ত্রিক বলে, তাদের আচরণ আপনারা দেখেছেন যে সারা সোহরাওয়ার্দী উদ্যান পুলিশ, বিডিআর দিয়ে ঘেরাও করে রেখেছিল, এই জায়গায় নাকি ঢুকতে দেবে না। দম্ভভরেই সরকার ঘোষণা করেছিল, এই জায়গায় কোনো অনুষ্ঠান করতে দেবে না। লজ্জা! লজ্জা! এজন্য বাঙালি জাতির পক্ষ হতে আমি ধিক্কার জানাই এই সরকারকে। আমি বলেছিলাম, আপনারা বাংলার মানুষের রুদ্ররোষ দেখেন নাই। ঐ পুলিশ-বিডিআর সেনাবাহিনী দিয়ে, এই বাঙালি জাতি যখন উত্তাল তরঙ্গের মতো জেগে ওঠে, কারও সাধ্য নাই বাঙালিকে রুখে দাঁড়ায়। আজকেও পারে নাই। এই বাঙালি জাতি সরকারের সেই ব্যারিকেড ভেঙে এই ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রবেশ করেছে। আমরা আমাদের ১৪০০ সাল উদযাপনের উদ্বোধনী ঘোষণা করছি।

আগামী তিনদিনব্যাপী আমাদের কর্মসূচী রয়েছে। আমরা আমাদের কর্মসূচী অত্যন্ত সফলভাবে পালন করব।

আমরা বাঙালি, বাঙালি হিসেবেই এদেশ আমরা স্বাধীন করেছি। আজকে পুলিশের হাতে আমাদের বহু লোক আহত হয়েছেন; দু একজন পুলিশও নাকি আহত হয়েছে। আমি তাদের সমবেদনা জানাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সরকারের এই বিরূপ আচরণ, এই বৈরী আচরণেরও তীব্র নিন্দা করি। আমরা গণতন্ত্র এনেছি। আসুন নববর্ষের এই সূচনালগ্নে আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যে-স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি এই শতাব্দীর মহামানব, যাঁর আগমনে আমরা পেয়েছি এদেশের স্বাধীনতা, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন—দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা আমরা গড়ে তুলবই তুলব, আজকের দিনে আমাদের এই শপথ।

আর আমি এটুকু বলতে চাই যে, বাঙালি জাতির সংস্কৃতি-কৃষ্টি-ঐতিহ্যকে আমরা যে-কোনো মূল্যে রক্ষা করবই করব। বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে যেকোন ষড়যন্ত্র আমরা রুখে দাঁড়াব, প্রতিহত করব। স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও চেতনাকে আমরা রক্ষা করব। স্বাধীনতার ইতিহাস-বিকৃতি কোনোমতেই আমরা মেনে নেব না। বাঙালি জাতি তার সঠিক ইতিহাস জানতে চায়। বাঙালি জাতি জানতে চায় একাত্তুরের সেই বীরত্বের ইতিহাস। জানতে চায় তেইশ বছরের সংগ্রামের ইতিহাস। আজ চক্রান্ত চলছে সেই ইতিহাস মুছে ফেলার। আসুন, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা সেই শপথ নেই, আমরা বাঙালি জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে যে-কোনো মূল্যে রক্ষা করব। একাত্তুরের ঘাতকদের স্থান এই বাংলার মাটিতে হবে না। ত্রিশ লক্ষ শহিদের আত্মত্যাগ কোনোদিন আমরা ভুলব না। দুই লাখ মা-বোনের আত্মত্যাগ কোনোদিন আমরা ভুলব না। ত্রিশ লাখ শহিদের রক্ত এবং দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে যে-স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, সেই শহিদের রক্ত ছুঁয়ে আজকে আমাদের শপথ, যে-কোনো মূল্যে স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও চেতনাকে আমরা রক্ষা করব। আজকে দুর্ভাগ্য আমাদের, বর্তমান রাষ্ট্রপতি ও সরকার প্রধান এই ২৬শে মার্চে ঐ সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাননি। শহিদের প্রতি অবমাননা করেছেন, শহীদদের রক্তের সাথে বিএনপি বেইমানি করেছে, বেইমান বিএনপি জনগণের সাথে বেইমানি করেছে। জনগণের প্রতি প্রদত্ত ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। ওয়াদা ভঙ্গ করে আজকের তারা বেইমানি করেছে। পরাজিত শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আজকে দমননীতি চালাচ্ছে। তার বিরুদ্ধে আজকে আপনাদেরকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। আজ আমাদের সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করে ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতাকে রক্ষা করে দীন-দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে জাতির জনকের স্বপ্ন শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করে সোনার বাংলা কায়েম করবই— এই শপথ নেব। আজকে সব প্রতিরোধ ভঙ্গ করে আপনারা সবাই এসেছেন, এখানে উপস্থিত হয়েছেন, এজন্য আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। রক্তিম শুভেচ্ছা জানাই।

আর একটি কথা বলতে চাই, আপনারা জানেন আঞ্চলিক সহযোগিতার কথা, আজকে সার্কের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সার্ক অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান বাংলাদেশে এসেছেন, বর্তমান সরকার সেই রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানদের শহিদ মিনারে, সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে নিয়ে যায়নি। রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান ২৬ তারিখে যায়নি, আর এই বিদেশি রাষ্ট্র প্রধান ও সরকারপ্রধানদেরকেও ঐ সাভার স্মৃতিসৌধে যেতে দেয়নি। শহিদদের রক্তের প্রতি বেঈমানি করেছে এই সরকার। এই বেঈমানির উপযুক্ত জবাব দিতে আপনারা প্রস্তুত আছেন কি না, বলুন (জনতার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন, জনতার সমস্বর বজ্রগম্ভীর উত্তর—আছি।)

আপনাদের ধন্যবাদ। এই ১৪০০ সাল বাঙালির জীবনে নতুন বার্তা বয়ে নিয়ে আসুক, শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠকু বাঙালির জীবন। এই বাঙালি জাতির যে আরাধ্য সাধনা ছিল—বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে সোনার বাংলা গড়ে তুলুন। সকলের সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি কামনা করে এখানেই শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। জয় হোক বাংলার মেহনতি মানুষের। খোদা হাফেজ।

১লা বৈশাখ, ১৪০০ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রদত্ত ভাষণ

বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে

শ্রদ্ধেয়া সভানেত্রী, সম্মানিত সুধীবৃন্দ, সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই সেমিনারে আপনাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আজ এখানে সমাজের জ্ঞানী-গুণী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞরা সমবেত হয়েছেন। আমরা তাঁদের কাছ থেকে সুচিন্তিত বাস্তবমুখী আলোচনা ও দিকনির্দেশনা চাই যা দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে বাস্তবায়ন করে আমাদের লক্ষ্য দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচী সফল করতে পারবে।

গুণীজনদের কাছ থেকে রাজনৈতিক মতবাদের চাইতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আজ বাংলাদেশ যে স্থবিরতায় নিপতিত তার থেকে কীভাবে উদ্ধার পাওয়া যাবে সেই আলোচনাই আমাদের কাম্য। বাঙালি জাতি আজ ভিক্ষুকের জাতি হিসেবে পরিচিত, স্বাধীনতার বাইশ বছর পরেও কেন আমাদের এই লজ্জাজনক অবস্থায় বাঁচতে হচ্ছে? এর থেকে মুক্তির পথ কী ? আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বারবার বলেছেন, "ভিক্ষুক জাতির কোনো ইজ্জত নাই।" আজ এই বাইশ বছর পর আমরা কি সে কথাটা উপলব্ধি করতে পারছি না ? কেন এই ভিক্ষাবৃত্তি ? দুইশত বৎসরের ঔপনিবেশিক শাসক ব্রিটিশের গোলামি আর চব্বিশ বৎসরের আধা-ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি সামরিক শাসকদের শাসন ও শোষণ বাঙালি জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছিল। সেই বাঙালি জাতিকে মুক্তির অমোঘ বাণী শুনিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। এই শাসন-শোষণের হাত থেকে বাঙালি জাতির মুক্তিসংগ্রামে অনেক জেল-জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে—তার পরও মাথা নত করেন নাই, নিরলসভাবে সংগ্রাম চালিয়ে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ অত্যন্ত দ্রুত সমাপ্ত করেছেন। স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও বিশ্ব অর্থনীতির চরম মন্দা অবস্থা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে, সেই প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করেও তিনি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে গেছেন। পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কাজ সমাপ্ত করেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি লক্ষ রেখে জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন।

আপনারা জানেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে বাংলার শোষিত বঞ্চিত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে যাচ্ছে। আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল দারিদ্র্য থেকে বাংলার মানুষকে মুক্ত করা, সুখী সমৃদ্ধিশালী একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা। দ্রুত দারিদ্র্য থেকে মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে এবং অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বিতা অর্জন, তথা দুর্নীতি দূর করে ক্ষেতেখামারে, কলে-কারখানায় উৎপাদনবৃদ্ধি, জনগণের জীবনের

ন্যূনতম চাহিদা— খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ও কাজের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন এবং বাস্তবমুখী কর্মসূচীও গ্রহণ করেছিলেন। যার শুভ ফল ও সাফল্য জনগণ পেতে শুরু করেছিল। ১৯৭৫-৭৬-এর অর্থবছরের জরিপ থেকে সে-কথা জানা যায়। কিন্তু সে-কাজ তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারেন নাই। দুর্ভাগ্য বাঙালি জাতির, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বাঙালি জাতির জীবনে নেমে আসে অমানিশার অন্ধকার। নির্মমভাবে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। কারাগারে জাতীয় নেতাদের হত্যা করা হয় এবং এই হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধকেও বুটের তলায় পিষ্ট করে বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। শুরু হয় চরম বিশৃঙ্খলা, হত্যা-ক্যু-ষড়যন্ত্রের রাজনীতি, অর্থনৈতিক বিপর্যয়। দারিদ্র্যের করাল গ্রাসে গোটা সমাজব্যবস্থা ভেঙে পড়ে, নৈতিকতাহীনতা, মানবিক মূল্যবোধের অভাব গোটা সমাজকে দীর্ঘ ১৭ বৎসর ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছে। স্বার্থান্বেষী ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ধনী থেকে আরও ধনী হচ্ছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠী দরিদ্র থেকে আরও দরিদ্র হচ্ছে। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর স্বার্থ যদি আমরা না দেখি তবে ঐ ক্ষুদ্র ধনীক গোষ্ঠী কি টিকে থাকতে পারবে?

বাংলাদেশে সমস্যার আজ শেষ নেই। অর্থনীতি স্থবির, বেকারসমস্যা বেড়েই চলেছে, বিনিয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে আছে। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি নিয়ে দেশবাসী সন্ত্রস্ত, যদিও সরকার বেশ নির্বিকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, বাসস্থান ও শিল্পোন্নয়ন — কোনো দিকেই আশার আলো দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু এসব কোনো সমস্যারই সমাধান সম্ভব হবে না যদি আমরা দেশজোড়া দারিদ্র্যের মোকাবেলা করতে না পারি। শতকরা ৮৬ ভাগ মানুষই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী গ্রাম-বাংলার প্রায় সবাই দরিদ্রের পর্যায়ে পড়ে। দারিদ্র্যের এই ভয়াবহ রূপ নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে। বক্তৃতা-বিবৃতিরও শেষ নেই। কিন্তু আমরা সবাই জানি, দারিদ্র্যের মতো অতি জটিল সমস্যা শুধুমাত্র সস্তা শ্লোগান দিয়ে এই সমস্যার সমাধান হবে না। এর জন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত কর্মসূচী ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব। সমগ্র জাতিকে এই সমস্যার সমাধানে ঐক্যবদ্ধভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা ও আলোচনা। এসবের ভিত্তিতেই আমরা সম্ভাব্য সমাধান খুঁজে পাব।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দারিদ্র্য দূরীকরণকে দেশের সর্বপ্রধান সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছে। সর্বশক্তি দিয়ে আমরা এই মৌলিক সমস্যার সমাধানে আত্মনিয়োগ করতে চাই। দেশের জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা আশা করি এই কাজে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। আজকের আয়োজিত সেমিনার এই কার্যক্রমেরই একটা প্রাথমিক পদক্ষেপ।

দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রক্রিয়া আমরা কোথা থেকে শুরু করব? আজকের সেমিনারের জন্য বেশ অনেকগুলি দিক চিহ্নিত করা হয়েছে। আমি শুধু এর মধ্যে কার্যকর বিষয়ের উপর মন্তব্য করব যদিও প্রতিটি বিষয়কেই আমি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। আমার মনে হয় দরিদ্রদের সংগঠিত করা ও উদ্বুদ্ধ করাকে আমাদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। আমরা দেখেছি উন্নয়ন কার্যক্রম চিরকাল শহর থেকে গ্রামের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়।

যাদের কল্যাণের লক্ষ্যে কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে তাদের মতামতের কোনো মূল্যই দেওয়া হয় না। ফলে এসব কর্মসূচী গ্রামের দরিদ্র মানুষের কাছে অপরিচিতই থেকে যায়। কাজেই প্রতিটি গ্রামের দরিদ্র মানুষকে নিয়ে তাদের অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজনের আলোকে কর্মপন্থা স্থির করতে হবে। আওয়ামী লীগের স্থানীয় ইউনিট এই কার্যক্রমে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে। আমরা স্থানীয় সরকারকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে ব্যবহার করতে চাই না। আমরা চাই স্থানীয় সরকার হবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি।

স্থানীয় সরকারকে কেন্দ্র করেই গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। গ্রামীণ রাস্তাঘাট নির্মাণ, বাঁধ, সেতু, বাজার, সেচব্যবস্থা, পানি-নিস্কাষণ প্রণালী, খাল পুনর্খনন ইত্যাদি কাজ গ্রামের সাধারণ মানুষ কেন্দ্রীয় সরকারের আমলাতন্ত্রের বাইরে স্বনির্ভরতার ভিত্তিতে করবে। এর জন্য তাদের সংগঠিত করা, উদ্বুদ্ধ করা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া ও ক্ষেত্রবিশেষে সাহায্য করা— এসব কাজের সঙ্গে আমরা সম্পৃক্ত হতে চাই। এই কাজ সমাধানের জন্য স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা একান্ত অপরিহার্য।

মানবসম্পদের উন্নয়ন, আমার মতে, দারিদ্র্য দূর করার সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান কার্যক্রম। মানবসম্পদ উন্নয়ন একটা বহুমুখী প্রক্রিয়া। নারীসমাজের সকল প্রকার অধিকার যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কারণ, আমাদের সমাজের পঞ্চাশ ভাগ মানুষই সব দিক দিয়ে পেছনে পড়ে আছে। সচেতনতায়, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, পুষ্টিহীনতায় তাদের দুর্দশার শেষ নেই। তাদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, কর্মসংস্থান, সম্পত্তির মালিকানা ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের যত্নবান হতে হবে। সামাজিক বিধিনিষেধ ও প্রতিবন্ধকতা দূর করে তাদের সংগঠিত করতে হবে। শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ, কিন্তু পুষ্টিহীন ভগ্নস্বাস্থ্যের শিশু হয় বিকলাঙ্গ হচ্ছে, অন্ধ হচ্ছে, না হয় অকালে মরে যাচ্ছে। সুস্থ সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী না হলে সমাজের কাজে তারা কোনো অবদান রাখতে পারবে না। বরং সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কাজেই শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দিকে বিশেষভাবে নজর দেবার জন্য জরুরি ভিত্তিতে পরিকল্পনা ও বরাদ্দ দিতে হবে।

গ্রামাঞ্চলের দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীর সঙ্গে শিক্ষা কর্মসূচীর সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করতে হবে। বয়স্কদের শিক্ষা কর্মসূচীকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিই, যেসব ছেলে ও মেয়ে মাত্র ১২, ১৪ বা ১৫ বছর বয়সেই নিরক্ষরের দলে যোগ দিয়েছে তাদের আমরা একটা অভিশপ্ত ভবিষ্যতের দিকে ছেড়ে দিতে পারি না। শিক্ষা ও কারিগরি দক্ষতার মাধ্যমে তাদের সমাজের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে। শিল্পায়ন ও গ্রামীণ ঋণ—-এ দুটোই দারিদ্র্য দূরীকরণের যে-কোনো কার্যক্রমের অপরিহার্য অঙ্গ। গ্রামের বহু প্রচলিত ও প্রধান শিল্প বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সরকার এই অবক্ষয় রোধ করার জন্য কোনো সক্রিয় কর্মসূচী গ্রহণ করেছে বলে মনে করি না। গ্রামশিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য পেশাগত প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও বাজার সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে। তবে গ্রামীণ উদ্যোক্তাদের বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য ঋণপ্রাপ্তির সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

কিছুদিন পরই জাতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। সংসদের ভেতরে ও বাইরে বক্তৃতা-বিবৃতির প্রবল বন্যা বয়ে যাবে। কিন্তু দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য ব্যয়

বরাদ্দ কী হচ্ছে তা নিয়ে বিশেষ কোনো বক্তব্য আমরা শুনতে পাই না। এবার আমরা সরকারকে এখন থেকেই সতর্ক করে দিচ্ছি—দেশের দুঃখী মানুষের সমস্যা আমরা বাজেটে প্রতিফলিত দেখতে চাই। আমরা জানতে চাই—এ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সব খাত মিলিয়ে সরকারি ব্যয়ের কত শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নিচের মানুষের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আমাদের জানাতে হবে, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র চাষীরা সরকারি কৃষিঋণের মোট কতটা পাচ্ছে, ভূমিহীনদের কর্মসংস্থানের জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, শিল্পখাতের বরাদ্দকৃত অর্থের কত অংশ গ্রাম ও শহরের ক্ষুদে উৎপাদকরা পাচ্ছে। স্বাস্থ্যখাতের ভেতরে গ্রামীণ স্বাস্থ্যখাতে কত অংশ অর্থ বরাদ্দ হল, এসব তথ্য আমরা জানতে চাইব। গালভরা স্লোগান দিয়ে মানুষকে ভাঁওতা দেওয়া আমরা বরদাস্ত করব না।

প্রথমেই বলেছি— দারিদ্র্য দূরীকরণের কার্যক্রম কোথায় শুরু করতে হবে স্থির করা কঠিন। কারণ সমস্যাটা এতই জটিল ও বহুমুখী যে অনেক ধরনের কর্মসূচীই একসঙ্গে গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু এত সব সমস্যা সত্ত্বেও আমাদের লক্ষ্যে স্থির থাকতে হবে। সমাজের দরিদ্রতম মানুষগুলিকে নিয়েই আমাদের কাজ আরম্ভ করতে হবে। ক'দিন পূর্বে লেখা একটা প্রবন্ধে আমি বলেছি সমাজের প্রতিবন্ধীদের কথা। ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়া কি তাদের কোনো গতি নেই ? আপনারা ভাবুন আমাদের সমাজের সেইসব অসংখ্য অসহায় নারীদের কথা— যারা পরিবার প্রধান হিসাবে সন্তানদের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা নারীর সংখ্যা কত তা কি কেউ জানে ? কীভাবে তারা নিজেদের ও সন্তানদের ভরণপোষণ করে ? সমাজ ও রাষ্ট্র তাদের কী সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে ? আমরা প্রায়ই আমাদের মানবিক মূল্যবোধের কথা বলি। সমাজের এসব অসহায় জনগোষ্ঠীকে ভিক্ষাবৃত্তির বা পতিতাবৃত্তির দিকে ধাবিত করাই কি আমাদের মানবিক মূল্যবোধের পরিচয় দেয় ?

আজকের এই সেমিনার নিষ্ফল বিতর্কে শেষ হোক— তা আমি চাই না। আমি চাই এই আলোচনার মাধ্যমে আমরা পথ খুঁজে পাব। আমরা জানি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অতি জরুরি। প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত না করতে পারলে আমরা সব দিক দিয়েই পিছিয়ে পড়ব। কিন্তু দারিদ্র্য দূরীকরণের কার্যক্রম এবং প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার কার্যক্রম— এদের মাঝে অসঙ্গতি নেই। বিশ্বের সফল দেশগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমরা তা উপলব্ধি করতে পারব। প্রবৃদ্ধির মূলে রয়েছে দক্ষ, পরিশ্রমী ও উদ্যোগী মানবসম্পদ। দারিদ্র্য দূর করে আমরা সেই মানবসম্পদকেই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য উপযুক্ত করে প্রস্তুত করছি। কাজেই যাঁরা বলেন— প্রবৃদ্ধি প্রথমে এবং সুষম বণ্টন ও দারিদ্র্য দূরীকরণ পরে— তারা ভুল বলেন। আমার মতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র দূরীকরণ এক বৃহত্তর কর্মসূচীর আওতায় এনে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায়বিচার ও সুষম বণ্টন "Growth with equity" একই সঙ্গে অর্জন করাই হবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু। জয় হোক বাংলার মেহনতি মানুষের।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত 'দারিদ্র্য দূরীকরণ' ও 'কৃষি উন্নয়ন' শীর্ষক সেমিনারে ২৮ মে ১৯৯৩ তারিখে উদ্বোধনী ভাষণ

সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই কেবল মানবাধিকার নিশ্চিত করতে পারে

জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত সর্বজনীন ঘোষণা মানব সভ্যতার ইতিহাসে একটি মাইলফলক। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানব জাতি অগ্রগতি সাধন করা সত্ত্বেও বিশ্বের বহু অংশে মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এনজিওগুলো বিশ্বের সর্বত্র সাধারণ মানুষের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছে। তিনি আশা করেন, এই ফোরামের গুরুত্বপূর্ণ মতামত মানবাধিকার সংক্রান্ত বিশ্ব সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটাবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আমি এই সম্মেলনের জন্য অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা বয়ে এনেছি।

আমি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নামে যে রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দিয়ে আসছি সেই দলটিই আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীনতার জন্য জনগণের দীর্ঘ সংগ্রাম পরিচালিত করেছে। স্বাধীনতা লাভের তিন বছরের কিছু বেশি সময় পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের কালরাত্রিতে বঙ্গবন্ধু, তাঁর তিন পুত্র, স্ত্রী এবং বিপুলসংখ্যক দলীয় নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তখন থেকেই কুখ্যাত অধ্যাদেশবলে সংশ্লিষ্ট খুনীদের বিচার নিষিদ্ধ রাখা হয়েছে। আমার ও আমার জীবিত ভগ্নীর আদালতে খুনীদের বিচার প্রার্থনার অধিকার অস্বীকার করা হয়েছে। এইভাবে আমার দল বৈরী ও অগণতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে। আমরা শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছি। দারিদ্র্য ও অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম সবেমাত্র শুরু হয়েছে। উন্নয়নের সুফল ভোগের অধিকার হচ্ছে মানবাধিকারের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেই লক্ষ্য এখনো সুদূরেই রয়ে গেছে। কাজেই বাংলাদেশে আমাদের মানবাধিকার হচ্ছে বহুমাত্রিক বিষয়।

নারীদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও নারী নির্যাতন বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে এখনও ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এনজিওসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে চাই। কারণ, নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি এবং সমাজকে সচেতন করার লক্ষ্যে এনজিওসমূহ অগ্রগামী ও নিবেদিতভাবে কাজ করেছে। বাংলাদেশে কিছু উদ্যমশীল এনজিও গ্রামীণ মহিলাদের শিক্ষা, ঋণ ও দক্ষতা দিচ্ছে এবং সমাজের উৎপাদনশীল ও প্রয়োজনীয় সদস্য হিসেবে নারীর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করছে। আমি আন্তরিকভাবে আশা করছি যে, এ বিশ্ব সম্মেলন এ ব্যাপারটি শুধুমাত্র অগ্রাধিকারমূলক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করবে না সমাজে মহিলাদের হীন মর্যাদা প্রদানকারী বহু বছরের পুরাতন প্রথাগুলো থেকে মহিলাদের মুক্ত করার ও লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

সমাজের সর্বস্তরে মানবাধিকার সংরক্ষণের লক্ষ্যে নেওয়া আমাদের প্রচেষ্টার সফলতার অপরিহার্য শর্ত হল রাষ্ট্র-পরিচালনায় জনগণের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা প্রদানকারী একটি গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থা। তিনি বলেন, গণমাধ্যমের ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী বিস্তার মানবাধিকার সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করছে। তবে সাম্প্রতিক বিশ্ব ঘটনাবলী এ ক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছে। জাতিগত ও ধর্মীয় বিরোধ বিশ্বের অনেক অংশ গ্রাস করে ফেলেছে। তিনি বলেন, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বৈষম্যের শিকার নারীসমাজের মানবাধিকারের কথা আমি উল্লেখ করেছি। সুদীর্ঘ বছরের আচার, ঐতিহ্য ও ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে প্রায়ই এ সমস্যা সম্পৃক্ত থাকার কারণে শুধু আইন প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান হবে না। এ জন্য প্রয়োজন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সমন্বিত প্রচারণা। মহিলারা যে-সকল আইনগত বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন সেগুলো দূর করলেই চলবে না, মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টির মৌলিক পরিবর্তন আনতে হবে।

ধর্মীয় ও জাতিগত বিরোধ মানুষের দুর্দশার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতিগত ও ধর্মীয় কারণে একটি জাতির মানবাধিকার হরণের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল বসনিয়া। বসনিয়ার গণহত্যার বিরুদ্ধে এ সম্মেলন সোচ্চার হলে আমাদের প্রত্যাশা পূরণ হবে। সার্বদেরকে তথাকথিত জাতিগত নির্মূল অভিযান সম্পন্ন করতে দেওয়া হলে তা হবে সভ্যতার ইতিহাসে একটি করুণ অধ্যায়। আমার দৃষ্টিতে মানবাধিকারসংক্রান্ত এ বিশ্ব সম্মেলনের প্রতি বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ হল বসনিয়া।

এটা প্রশংসনীয় যে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন অবৈধ গ্রেফতার, বিচারবিহীন আটক, অত্যাচার ও নৃশংসতা থেকে মানুষকে রক্ষা করতে চায়। আমাদেরকে অবশ্যই এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে নজর দিতে হবে, যে ব্যবস্থা এ ধরনের মানবাধিকার লংঘন রোধ করে। দুর্গত নারী-পুরুষ ও শিশুর জন্য আত্মনিবেদিত সংস্থা আন্তর্জাতিক রেডক্রস সমিতি অথবা অ্যামনেষ্টি ইন্টারন্যাশনালের আমি প্রশংসা করি। কিন্তু তারা মানবাধিকার লংঘনের দৃষ্টান্তের মোকাবিলা করে— মানবাধিকারলংঘনের উৎসের মোকাবেলা করে না। আমি আশা করি, এ আন্তর্জাতিক সম্মেলন আরো গভীরভাবে কাজ করবে এবং আমাদের মৌলিক অধিকার লংঘনের কারণগুলো খতিয়ে দেখবে।

ধনী ও দরিদ্রের ব্যাপক দূরত্ব ও পরিবেশগত সঙ্কট বিশ্ব সম্প্রদায়ের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দীর্ঘ সংগ্রামকালে আমি নিজে বিভিন্ন সময়ে বিনা বিচারে আটক থেকেছি এবং আমি জানি স্বৈরাচারী শাসকরা কীভাবে জনগণের চেতনা নষ্ট করার চেষ্টা করে। এ বিশ্ব সম্মেলনের আলোচ্যসূচীর প্রথম আলোচনা সে সকল সরকারের বিরুদ্ধে হওয়া উচিত, যারা নানা অজুহাতে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার পদদলিত করে। আমার দৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক সরকারব্যবস্থাই কেবল মানবাধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারে। তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থারও অপব্যবহার হতে পারে। নির্বাচিত হয়েও একটি সরকার ক্ষমতায় টিকে

থাকার লক্ষ্যে বিরোধী দলকে দমনের জন্য দুঃখজনকভাবে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। আমরা বাংলাদেশে বর্তমানে একটি শ্বাসরুদ্ধকর সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধীনে বাস করছি—যে আইননির্বিচারে বিরোধী দল ও বিরোধী দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। জনগণের মানবাধিকার রক্ষায় তাই কেবল একটি গণতান্ত্রিক নামকরণই যথেষ্ট নয়।

এ সম্মেলনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত—কাজ ও কর্মসংস্থানের অধিকার প্রতিষ্ঠা। কোনো নির্ভরযোগ্য উপার্জনহীন বেকার লোকের মানবাধিকার ভোগ করার সামাজিক অবস্থান থাকে না। বেঁচে থাকার তাগিদে সে প্রায়ই মানুষ হিসেবে প্রাপ্ত মৌলিক অধিকার সমর্পণ করে। কারণগুলো খতিয়ে দেখতে হবে। বাংলাদেশের জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য অনেক বছর সংগ্রাম করেছে। আমরা নিজেরা যে কারণে মূল্য দিয়েছি অন্য কেউ সে কারণে মূল্য দিলে আমরা তাকে সমর্থন করব। প্রকৃতিগতভাবে আমরা একটি স্বাধীনতাপ্রেমিক জাতি। বিদেশি শক্তি বারবার আমাদের দমন করতে চেয়েছে— কিন্তু জনগণ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা আমাদের সংবিধানে রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতীয় জনগণের সমস্যা নিয়ে কোনো কোনো মহলের উদ্বেগ সম্পর্কে আমি অবগত। আমি নিঃসন্দেহ যে, শুভেচ্ছা, উদারতা ও সহিষ্ণু মনোভাব নিয়ে এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব।

আমার দল জাতিগত ভিত্তি ও ধর্মীয় বিশ্বাস নির্বিশেষে সকল নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার চায় এবং সে ভিত্তিতে একটি সমাধান আমাদের নাগালের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের মানবাধিকারের প্রতি প্রধান হুমকি হল দারিদ্র্য। আমাদের দেশের বিশাল সংখ্যক মানুষ দ্যরিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে এবং তারা অন্যসব চিন্তা-ভাবনা বাদ দিয়ে বেঁচে থাকার জন্য দৈনন্দিন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এ সম্মেলনে আমার চিন্তা-ভাবনা উপস্থাপন করার সুযোগ দেওয়ার জন্য এনজিও ফোরামকে ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করি, বিশ্ব সম্মেলন এ সকল ধারণা ও চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন ঘটাবে।

---

১০ জুন, ১৯৯৩ ভিয়েনায় এনজিও সংস্থাসমূহের মানবাধিকার সম্মেলনে প্রধান ভাষণ

পশ্চাৎপদতা ও স্থবিরতা কাটিয়ে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে যেতে চাই

সংগ্রামী ভাই ও বোনেরা আমার,

আসসালামু আলায়কুম। হিন্দু ভাই-বোনদের আদাব ও নমস্কার। আমার বক্তব্য শুরু করার পূর্বে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি তাঁর পরিবারবর্গকে। স্মরণ করছি কৃষক নেতা আবদুর রব সেরনিয়াবতকে, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণিকে। স্মরণ করছি কারাগারে নিহত জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, মনসুর আলী ও কামারুজ্জামানকে। স্মরণ করছি ভাষা আন্দোলনের যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদেরকে। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদের আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। শ্রদ্ধা প্রকাশ করছি বিগত গণআন্দোলনে যাদের আত্মাহুতি স্বৈরাচার সরকারের পতন ঘটিয়েছে সেই সকল শহিদদের।

ভাই ও বোনেরা আমার,

আমি প্রথমেই আপনাদেকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। রক্তিম শুভেচ্ছা জানাই। ১৫ই আগস্ট বাঙালি জাতির জন্য এক কলঙ্কময় দিন। এই ১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে শুধু হত্যা করেনি, একজন রাষ্ট্রপতিকে শুধু হত্যা করেনি, বাঙালি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকেও হত্যা করা হয়েছিল। সেই হত্যার প্রতিবাদে গত ১৫ই আগস্ট আমরা হরতাল ডেকেছিলাম। বাংলার প্রতিটি জায়গায় সেই জেলা হতে থানা গ্রাম পর্যন্ত, প্রতি জায়গায় প্রতিটি মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই হরতাল পালন করেছেন। আমি আপনাদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। এবং সঙ্গে সঙ্গে বলতে চাই, তাঁর প্রতি আমরা শোক পালন করে শুধু কাঁদতে চাই না। আমাদের জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়েছে। আমরা তার প্রতিবাদ করতে চাই। বিচার আমরা করতে চাই। বাংলার মানুষ সেই কথাই জানিয়েছে ১৫ই আগস্টের হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে।

ভাইয়েরা আমার,

অনেক আশা নিয়ে আমরা সংগ্রাম করেছিলাম। আন্দোলন করেছিলাম, গণতন্ত্র আসবে, গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে মানুষের মুক্তি আমরা নিয়ে আসব। মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আনব। মানুষকে আমরা নতুন আশার বাণী শোনাব। আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা ডাক দিয়েছি, আপনারা সে ডাকে সাড়া দিয়েছেন, সংগ্রাম সফল করেছেন। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করেছেন। বিগত নির্বাচনে বাংলার মানুষ আমাদের ভোট দিয়েছিল। আওয়ামী লীগের নৌকা মার্কা ৩৮ ভাগ ভোট পেয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা-বিরোধী পক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিএনপি সূক্ষ্ম কারচুপি করে ক্ষমতাশীন হয়েছে। যে আশা যে ওয়াদা করে বিএনপি ক্ষমতায় গিয়েছিল কোনো ওয়াদাই তারা রক্ষা করে নাই। ছাত্রদের কাছে দেওয়া বিএনপির ওয়াদা তারা ভঙ্গ করেছে। শ্রমিকদের কাছে

দেওয়া ওয়াদা তারা ভঙ্গ করেছে। কৃষকদের কাছে দেওয়া ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। শিক্ষকদের কাছে দেওয়া ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। এ দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে বিএনপি যে ওয়াদা দিয়েছিল, প্রতিটি ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। এমনকি সংসদে চার দফা চুক্তি করলেও সেই চুক্তি তারা ভঙ্গ করেছে। সব ওয়াদা তারা আজকে ভঙ্গ করে দেশকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

আমাদের সরকার অনেক বক্তৃতা দেন। টেলিভিশনে আপনারা দেখেছেন। মানুষ এখন কী বলে? আগে বলত, সাহেব বিবি-গোলামের বাক্স, এখন বলে বিবি-গোলামের বাক্স। এই টেলিভিশন হচ্ছে মিথ্যা অপপ্রচারের বাক্স। সে বাক্সে বক্তৃতা শোনায়। কয়েকদিন আগে শুনলাম, প্রধানমন্ত্রী বললেন যে বিরোধীদল নাকি ওনাদের উন্নয়নের কর্মকাণ্ড দেখে একেবারে দিশাহারা হয়ে গেছে। তো তাকে আমি বলতে চাই, আপনি উন্নয়ন কতটুকু করেছেন তা তো দেশের মানুষই জানে। আপনার উন্নয়ন হচ্ছে শ্রমিক ছাঁটাই, কর্মচারী ছাঁটাই। উন্নয়ন করেছেন সন্ত্রাসের। বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস। আজকে শিক্ষকরাও লাঞ্ছিত। শিক্ষকরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মামলা দিলে তার কোনো সুরাহা হয় না। উল্টো ছাত্ররা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা দেয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই ঘটনাই ঘটেছে। ঐ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ চট্টগ্রাম শহরে সর্বস্তরে সন্ত্রাসের উন্নয়ন আপনারা করেছেন। আর দিশাহারা আপনার উন্নয়নে নয়, আজ তো সমগ্র দেশবাসী দিশাহারা! কেন? আজ আপনার সন্ত্রাসীদের মারের চোটে শিক্ষকরা দিশাহারা। পুলিশের পিটুনিতে আমাদের সাংবাদিক ভাইয়েরা দিশাহারা। বুদ্ধিজীবীরা পর্যন্ত আপনার পুলিশ ও ঠ্যাঙারে বাহিনীর মারের চোটে দিশাহারা। চাকরি হারিয়ে শ্রমিক-কর্মচারীরা দিশাহারা। প্রশাসন দলীয়করণ এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে সেখানে প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং চাকরিজীবীরাও দিশাহারা। পদস্থ সামরিক অফিসার ও সেনাবাহিনীকে যে হারে আপনারা রিটায়ার করেছেন তাতে সেনাবাহিনীও আজ দিশাহারা। চাঁদাবাজি আর ঘুষের জন্য ব্যবসায়ী-শিল্পপতি-বিনিয়োগকারী, তারাও দিশাহারা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস দেখে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকরাও দিশাহারা। প্রধানমন্ত্রী, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন আপনার আড়াই বছরের কর্মকাণ্ডে আজকে সারা দেশের মানুষ দিশহারা হয়ে পড়েছে। আপনার এই ধরনের উন্নয়ন আমরা আর চাই না। আপনার মাস্তানবাহিনী ও ঠ্যাঙারে বাহিনী সামলান। আপনার এই ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধ করেন। মানুষ শান্তি চায়। মানুষ স্বস্তি চায়। আজকে পত্রিকার পাতা খুললে প্রতিদিন হত্যা খুন-ডাকাতি-রাহাজানি-নারী নির্যাতন। নারীদের যেভাবে হত্যা নির্যাতন করা হচ্ছে আজকে নারীসমাজও সে অত্যাচারে দিশাহারা।

আমরা কী চাই? বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের সংগঠন। আপনারা জানেন আওয়ামী লীগ কখনও মিথ্যা ওয়াদা করে না। আওয়ামী লীগ যতটুকু করতে পারে ততটুকুই বলে। নির্বাচনের আগে আমরা ওয়াদা করেছিলাম যে আমরা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা করব। আমরা ক্ষমতায় যেতে পারিনি, অনেকে বলে থাকে আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন যে সরকারও ব্যর্থ বিরোধী দলও ব্যর্থ। তাদেরকেই জিজ্ঞাসা করি, সরকার তো ক্ষমতায় আছে, প্রশাসনিক যন্ত্র তো তাদের হাতে, ট্যাক্স ও বিদেশি

সাহায্য তাদের হাতে জমা হয়। রাষ্ট্র-পরিচালনা করেন সরকার। আর বিরোধীদল পারেন, সরকার যদি কোনো গঠনমূলক কাজ করেন, সেখানে সহযোগিতা করতে। সরকারের ভুল হলে তা তুলে ধরবে জনগণকে সচেতন করতে। আমরা আজকে কী দেখছি? সরকার দেশ পরিচালনায় সম্পূর্ণ অযোগ্যতা দেখিয়েছে, অদক্ষতা দেখিয়েছে, ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আপনার সরকার যদি রাষ্ট্র-পরিচালনায় ব্যর্থ হয় তার দায়-দায়িত্ব তো বিরোধীদল কখনই নিতে পারে না। সেই দায়িত্ব বিরোধীদলের কাঁধে কখনই পড়তে পারে না। আজকে যারা একথা বলেন, তারা একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে বলেন। আমরা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার যখন গঠন করি, যেখানে সরকারিদল জনগণের স্বার্থে এগিয়ে এসেছে—আমরা সহযোগিতা করেছিলাম।

আপনাদের মনে আছে, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা বলেছিলাম যে আমরা মিলিটারি পদ্ধতিতে দেশ চালাতে চাই না, আমরা চাই জনগণের শাসন। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে আমরা জনগণকে সম্পৃক্ত করতে চাই। আমরা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার আনতে চাই। আপনারাই বলুন, পৃথিবীর ইতিহাসে এমন নজির আছে কি না যে নির্বাচনে দেওয়া ওয়াদা বিরোধী দলে থেকেও, সেই ওয়াদা পূরণ করেছে? এই নজির একমাত্র আওয়ামী লীগই স্থাপন করেছে। বিশ্বে আর কেউ করতে পারে নাই। যেখানে বিরোধী দলে থেকে আমাদের নির্বাচনি ওয়াদা আমরা পূরণ করেছি। ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ, ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মাফ, কাদের দেওয়া ওয়াদা? আমাদের দেওয়া ওয়াদা। ৭ দফা কর্মসূচীতে আমরা ঘোষণা করেছিলাম। ক্ষমতায় যেতে পারিনি একথা সত্য। কিন্তু জনগণের কাছে দেওয়া ওয়াদা আমরা রক্ষা করেছি। তার পরেও বিরোধী দলকে ব্যর্থ বলার অর্থ কি? অর্থ আর কিছুই নয়, আজকে স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তি, মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি যেখানে ঐক্যবদ্ধ হবার সময়, যেখানে স্বাধীনতার বিরোধীচক্রের হাত ধরে বিএনপি ক্ষমতায় গিয়ে আজকে দেশের মানুষের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে সেই সময় নতুন নতুন কথা নিয়ে এই স্বাধীনতার সপক্ষের কিছু কিছু লোক এগিয়ে এসেছে। আপনারা তা লক্ষ করেছেন। এটা আওয়ামী লীগের দূর্ভাগ্য! যখনই আওয়ামী লীগ এগিয়ে চলতে থাকে তখনই এই অবস্থা দেখা যায়। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আজকে আপনারা দূর দূরান্ত এলাকা থেকে কত কষ্ট করে এসেছেন। আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী এবং সমর্থক—আপনাদের মাথার ঘাম ও পরিশ্রম দিয়ে জেল-জুলুম-অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করেও এই সংগঠনকে ধরে রেখেছেন। এক-একজন নেতা আপনারাই সৃষ্টি করেন, আপনাদের রক্তের উপর, আমাদের পরিশ্রমের উপর আপনাদের ত্যাগ-তিতিক্ষার উপর পা দিয়ে এক-একজন নেতা হয়। আপনারাও স্লোগান দিয়ে নেতা তৈরি করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য আওয়ামী লীগের—দুর্ভাগ্য এই কারণে যে নেতা আপনারা তৈরি করেন, কিন্তু সেই নেতারা যখন উচ্চভিলাষী হয়ে যায়, একজন নেতার উচ্চভিলাষের কারণে এই সংগঠন বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐ খুনী মুসতাক গাদ্দারি করেছিল, মোনাফেকি করেছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করেছিল। খুনী মুসতাকের গাদ্দারির জন্য এদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংস হয়েছে। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা নির্যাতিত হয়েছে।

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের রক্তের উপর দাঁড়িয়ে, যারা নতুন নতুন

মীরজাফর সৃষ্টি হয়, আওয়ামী লীগের কর্মীদের সঙ্গে বেঈমানি করে, আবার তারা দিগ্বিদিকে নতুন দিকে ছোটার চেষ্টা করে। আওয়ামী লীগের পিঠে ছুরিকাঘাত করে, আওয়ামী লীগের কর্মীদের রক্তের সঙ্গে বেঈমানি করে কীভাবে আপনারা তা দেখেছেন। আমার একটি কথা আপনাদের কাছে, আপনারা জানেন আমি মা, বাবা, ভাই, আত্মীয়-পরিজন সব হারিয়েছি। আমার চাওয়া-পাওয়ার কিছু নেই। এই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের জন্যই, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের মুখের দিকে যখন তাকাই তখন আমি দিশাহারা হয়ে যাই। আঠার বছর বঙ্গবন্ধু নেই। এই সংগঠনকে আপনারা ধরে রেখেছেন, তার পরেও আপনাদেরই কারণে আজও আমি এখানে আছি। আমার চাওয়া-পাওয়ায় কিছু নেই, কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে যারা নেতা হন, কর্মীদের শ্লোগানে যারা নেতা হন, তারা যদি আওয়ামী লীগের সঙ্গে বেঈমানি করে আওয়ামী লীগের পিঠে ছুরিকাঘাত করে, উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার জন্য আওয়ামী লীগের সঙ্গে মোনাফেকি করে, তার উপযুক্ত শাস্তি আপনারা দেবেন। আপনাদের কাছে আমার সেই ওয়াদা রইল।

আওয়ামী লীগ জনগণের সংগঠন। আমরা গণতন্ত্র এনেছি। এই গণতন্ত্রকে আমরা অর্থবহ করতে চাই। আপনারা দেখেছেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর আমরা অর্থনৈতিক কর্মসূচী দিয়েছি, যে-অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে একটা সঠিক দিকনির্দেশনা আমরা জাতিকে দিয়েছি। জাতি যেমন দিশাহারা, সেই দিশাহারা জাতিকে আশার বাণী এই আওয়ামী লীগ শুনিয়েছে। এই অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে আমরা জনগণের ভাত কাপড়ের ব্যবস্থা করতে চাই। জনগণের যে মৌলিক চাহিদা আহার কাপড় বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আমরা করতে চাই। এবং সেইসঙ্গে আমরা দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য এই কর্মসূচী দিয়েছি। দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে আমরা চাই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও আধুনিকীকরণ। সমস্ত প্রক্রিয়াকে আধুনিকীকরণ করে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশকে চালাতে চাই। ভিক্ষুকের জাতি হয়ে এই বাংলাদেশের মানুষ আর বাঁচতে চায় না।

পশ্চাৎপদতা ও স্থবিরতা কাটিয়ে এই অন্ধকার কাটিয়ে বাঙালি জাতিকে আলোর দিকে আমরা নিয়ে যেতে চাই। আমাদের চিন্তা চেতনায় কর্মসূচীতে আমরা নতুন দিকনির্দেশনা দিতে চাই। যেখানে আমরা চাই নতুন নতুন প্রযুক্তি ও পুঁজির ব্যবহার করতে। আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের লক্ষ্যই থাকবে উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জন, প্রবৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারার ন্যায়সঙ্গত সামাজিক বণ্টন। উন্নয়নের প্রক্রিয়ায় জনগণের পূর্ণ অংশগ্রহণ এবং ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতা অর্জন। এটাই হবে আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য। এই চারটি দিক লক্ষ রেখে আমরা কী চাই— আমরা শিল্প-কলকারখানা ব্যাপকহারে গড়ে তুলতে চাই। জনগণের কর্মসংস্থান বাড়াতে চাই। আমরা অর্থনৈতিক উৎপাদন বাড়াতে চাই এবং রাষ্ট্রীয় খাতে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং ব্যক্তিখাতে অবাধ ও স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগ, স্থানীয়ভাবে স্বপ্রণোদিত সমবায়ের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করাই আমাদের লক্ষ্য। দরিদ্র নিরক্ষর বেকারসমস্যার সমাধানের জন্য নতুন কর্মসংস্থান এবং পরনির্ভরশীলতা কমিয়ে নিয়ে ক্রমে প্রবৃদ্ধির হার বাড়াবার লক্ষ্য আমরা করেছি। সেইসঙ্গে আমাদেরও প্রবৃদ্ধির একটা লক্ষ্য থাকবে। আমরা তেলা মাথায় তেল দিতে চাই

না। আমরা জনগণের দিকে লক্ষ রেখে যে-প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্যদূরীকরণ দ্রুত নিশ্চিত করবে সেই প্রবৃদ্ধিকেই আমরা গ্রহণ করতে চাই এবং তার জন্য সমস্ত মেধা শ্রম সম্পদ আমরা বিনিয়োগ করতে চাই। কারণ আমদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন 'ভিক্ষুকের জাতির কোনো ইজ্জত নাই।' ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে বাংলার মানুষকে ভিক্ষুকের জাতিতে আজ পরিণত করেছে। যেখানে বঙ্গবন্ধুর আমলে দরিদ্রদের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ ছিল গত ১৮ বছরে যাঁরা ক্ষমতায় ছিলেন, তাঁরা নাকি উন্নয়ন করেছিলেন! তাদের উন্নয়নের ঠেলায় আজকে ৮০ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। মাথা গোঁজার ঠাঁই নাই, পেটে ভাত নাই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই, আজকে কঙ্কালসার দেহ নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে পথে-ঘাটে, এই ঢাকা শহরে বস্তি এলাকায় আপনারা দেখবেন 'হা অন্ন হা অন্ন' করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই আমাদের লক্ষ্য সকলের জন্য স্বাস্থ্য 'সকলের জন্য শিক্ষা, বাসস্থান' কর্মসূচীর আওতায় সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের অর্থনীতির এটাই হচ্ছে মূল লক্ষ্য 'দরিদদ্র্যের জন্য স্বাস্থ্য, দরিদ্রের জন্য শিক্ষা, দরিদ্রের জন্য বাসস্থান' আমরা নিশ্চিত করতে চাই। কারণ দরিদ্র জনসাধারণ, এই সমাজের যারা অবহেলিত গোষ্ঠী তাদের আমরা যদি টেনে তুলতে না পারি, তাদের জীবনকে যদি আমরা অর্থবহ করতে না পারি, ১৮ বছরের স্বৈরশাসকের তাঁবেদারি করে আজকে যারা অর্থসম্পদের মালিক হয়েছে, সেই ক্ষুদ্র গোষ্ঠী যারা দরিদ্র জনসাধারণের রক্ত চুষে আজকে নিজেরা ধনশালী হয়েছে, এই দরিদ্র জনসাধারণ যারা সংখ্যায় বেশি, যারা বৃহৎ জনগোষ্ঠী তাদেরকে যদি আপনারা টেনে তুলতে না পারেন তা হলে এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা কোনোদিন বাংলার মাটিতে হতে পারবে না। একদিন সেই দিন আসবে, এই শোষিত বঞ্চিত মানুষ এখানে এমন রুদ্র রোষে ফোটে পড়বে যে আপনাদের ও ক্ষুদ্র ধনীক গোষ্ঠীর স্বার্থ তারা তাসের ঘরের মতো উড়িয়ে দেবে।

আমাদের অর্থনীতির যে মূল জায়গা সেটা হল কৃষিখাত। এই কৃষিখাতকে আমরা সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করতে চাই। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য কৃষিকার্যকে সহায়তা করা একান্ত প্রয়োজন।

আমরা দেখেছি, এই সরকার ক্ষমতায় এসে চার চারবার সারের দাম বাড়িয়েছে। আমি কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে এসেছি। অনেকেই আজকে চাষবাসে অনীহা প্রকাশ করছে। কারণ সারের দাম এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে আজকে কৃষকরা কৃষিকাজ করতে চায় না। তাই আজ কৃষি উপকরণ সার, বীজ, ডিজেল ও কীটনাশক ঔষধের দাম কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতার আওতার মধ্যে রাখতে হবে। প্রয়োজনে কৃষককে ভর্তুকি দিতে হবে যাতে কৃষকরা চাষে উৎসাহ না হারায় এবং কৃষকরা চাষবাস করতে পারে। উৎপাদিত দ্রব্যের পণ্যের ন্যায্য মূল্য এবং বাজারজাত করণের সঠিক ব্যবস্থাপনা করতে হবে। আমরা দেখি কৃষক ধান উৎপাদন করেছে, ধানের দাম পায় না। বাজারে পাট আসছে, পাটের দাম পায় না। কাজেই কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে।

আপনারা জানেন, বিএনপি সরকারের একটা চরিত্র আছে। সেই চরিত্রটা কী? যখন আগে বিএনপি ক্ষমতায় ছিল, তখনও ১১০০০ ব্যাংক কর্মচারী ছাঁটাই করেছিল।

বিএনপি বর্তমানে ক্ষমতায় এসে আবার সেই শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই শুরু করেছে। আমাদের কথা ছিল বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করে শ্রমিক-কর্মচারীদের ছাঁটাই করবেন। আজকে শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁচাই শুধু নয়, হকার উচ্ছেদও করেছেন। এই হকারদের জন্য বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের শ্রমিকরা অবহেলিত। কাজেই সেই শ্রমিকদের একটা নির্দিষ্ট মজুরির ব্যবস্থা করতে হবে। উৎপাদনশীলতার সঙ্গে শ্রম মঞ্জুরির সম্পৃক্ততা আবশ্যক। আবার একই সঙ্গে ন্যূনতম মজুরির নিশ্চয়তার বিধান করতে হবে। কারণ, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই শ্রমিকশ্রেণী যাতে তার ছেলেমেয়ে ও পরিবারকে ভরণ-পোষণ করতে পারে তার একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দক্ষতা বাড়াতে হবে। শ্রমিকদের শিক্ষা স্বাস্থ্য এবং বাসস্থান ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমকল্যাণমূলক ব্যবস্থা করে শ্রমিকরা যাতে কাজে উৎসাহ পায় তা নিশ্চিত করতে হবে। শুধুমাত্র ছাঁটাই করে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। নারীসমাজের কাজের জন্য কুটির শিল্পের প্রসার ঘটিয়ে নারীদের কাজের ব্যবস্থা করতে হবে এবং অর্থনৈতিকভাবে নারীরা যাতে স্বাবলম্বী হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমরা একটা জিনিস লক্ষ করেছি, বিদেশি যে সাহায্য আসে তা অবাধে লুটপাট করা হয়। অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যায় করা হয়। বিদেশি সাহায্য উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় করতে হবে এবং সেইসঙ্গে দুর্নীতিমুক্ত সরকার ও দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তুলতে হবে। ঐ থানা পর্যায় পর্যন্ত জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা করতে হবে এবং সন্ত্রাসমুক্ত নিরাপত্তার নিশ্চিত করতে হবে।

ভায়েরা আমার বোনেরা আমার,

আমাদের লক্ষ্য স্পষ্ট। আমরা শুধু কথার ফুলঝুরি ওড়াই না। আমরা জনগণের জন্য সবকিছু লক্ষ্য রেখেই ব্যবস্থা করতে চাই। তাই নতুন অর্থনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য আজকে আমরা এগিয়ে এসেছি। কিন্তু বিএনপি সরকার যে দমননীতি চালাচ্ছে, সন্ত্রাসী আইন দিয়ে নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। এমনকি এমপিরাও রেহাই পাচ্ছে না। স্পষ্টভাবে বলতে চাই, এই দমননীতি বন্ধ করবেন। আর ঐ সন্ত্রাসী আইনও প্রত্যাহার করে নিয়ে ঐ আইনে যত বন্দি রয়েছে, তাদের মুক্তি দিতে হবে। আর এই বন্দিদের যদি মুক্তি দেয়া না হয়, উপযুক্ত জবাব কীভাবে দিতে হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তা জানে এবং সেই জবাব আমরা এই সরকারকে দেব।

দেশের বিভিন্ন এলাকায় আজ বন্যা। দুর্গত মানুষকে কোনো সাহায্য দেয়া হচ্ছে না। রিলিফ লুটপাট করে খাচ্ছে। আজকে এই দূর্নীতিবাজ সন্ত্রাসী শাসকগোষ্ঠী যতদিন ক্ষমতায় থাকবে বাংলার মানুষ গণতন্ত্রের স্বাদ পাবে না। যে-গণতন্ত্র উদ্ধার করেছিলাম, সে-গণতন্ত্র লালনপালনের ভার ঐ বিএনপির হাতে পড়েছিল। তাদের অযোগ্যতা ও অদক্ষতার কারণে, সেই গণতন্ত্র শিশু আজ বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে। আজকে গণতন্ত্রকে উদ্ধার করে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে বাংলার মানুষের অর্থনেতিক মুক্তি নিয়ে আসার জন্য আবার আমাদর আন্দোলন করতে হবে।

ভায়েরা আমার, বোনেরা আমার,

আজকে একটা কথা আমি শুধু বলতে চাই, ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট আপনারা জানেন, জাতির পিতাকে কী নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। সেইদিন শুধু জাতির পিতাকে হত্যা করা হয়নি, সেইদিন আমি আমার মাকেও হারিয়েছি। কামাল, জামাল, দশ বছরের ছোট্ট শিশু রাসেল পর্যন্ত ঐ ঘাতকদের হাত থেকে রেহাই পায় নাই। শুধু তাই নয়, কামাল-জামালের নবপরিণীতা বধূ সুলতানা ও রোজী, যাদের হাতের মেহদির রং তখনও মোছেনি, তাদেরকেও ঐ খুনীরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে। বঙ্গবন্ধুর একমাত্র ছোট ভাই শেখ নাসেরকে হত্যা করেছে। যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণিকে তাঁর অন্তঃস্বত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণিকে, হত্যা করেছে কৃষক নেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, তাঁর ১৩ বছর মেয়ে বেবী, নাতী সুকান্ত, ১০ বছরের ছেলে আরিফকে। কর্নেল জামিলকে হত্যা করেছে, অনেক পুলিশ অফিসারকে হত্যা করেছে। এই ১৫ই আগস্টের হত্যার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে আজ ছিনিমিনি চলছে। আপনারা জানেন, এই হত্যার বিচার হয় নাই। পঁচাত্তরের পর এক কালো আইন ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ—যে অধ্যাদেশ মার্শাল ল অর্ডন্যান্স এর মাধ্যমে জারি করে এবং জেনারেল জিয়াউর রহমান পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে আমাদের সংবিধানে সংযুক্ত করে পবিত্র সংবিধানকে কলুষিত করেছে। এই ইনডেমেনিটি অধ্যাদেশ জারি করে এই হত্যার বিচারের পথ রুদ্ধ করা হয়েছে। আপনারা এই দেশের নাগরিক। আপনারা জানেন, দেশে আইন আছে, খুনীদের বিচার হয়। হত্যকারীদের বিচার হয়। মাত্র কয়েকদিন আগে এক হত্যাকারীর ফাঁসি হয়েছে। দেশের প্রতিটি নাগরিক তার নাগরিক অধিকার ভোগ করবে। এদেশের নাগরিক আপনারাও আপনাদের মা-বাবা-ভাই যদি নিহত হয় আপনারা বিচার চাইতে পারেন, আপনারা কোর্টে যেতে পারেন, কিন্তু আমিও তো এদেশের নাগরিক। ঐ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ, যিনি আমাদের এমপি, যাঁর চার বছরের শিশু সুকান্তকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে, তিনি তাঁর সন্তানের বিচার চাইতে পারবেন না। শেখ ফজলুল হক মণির ছেলে পরশ-তাপস তাদের পিতা-মাতার হত্যার বিচার চাইতে পারবে না। আজকে বেগম জোহরা তাজউদ্দিন বসে আছেন তিনি তাঁর স্বামীর হত্যার বিচার চাইতে পারবেন না। মোহাম্মদ নাসিম ও ডঃ সেলিম তাঁদের পিতার হত্যার বিচার পাবেন না। আজকে এই বাংলাদেশে একই সাথে দুটি আইন কীভাবে চলে? আজকে এদেশের নাগরিক হয়েও আমরা কেন নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হব? আমরা কেন পিতার হত্যার বিচার পাব না? ভাইয়ের হত্যার বিচার পাব না? কী অন্যায় করেছিলেন আমার মা? কী অন্যায় করেছিল আমার দশ বছরের ছোট্ট ভাই রাসেল? আজকে তাকে যারা খুন করল, সেই হত্যার বিচার কেন পাব না? আজকে খুনীরা অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খুনীরা জীবনের হুমকি দেয়। আজকে খুনীদের বিদেশি দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেছে জিয়াউর রহমান। আর বর্তমানে বিএনপি সরকার প্রধান সেই খুনীদের প্রমোশন দিচ্ছেন।

একজন খুনী, খুন করার পর যদি তার বিচার না হয়, আর চাকুরিতে পুরস্কৃত হয়, তা হলে সে দেশে আইনের শাসন কীভাবে আসবে? সে দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার কীভাবে আসবে? সে দেশের মানুষের নাগরিক অধিকার কীভাবে থাকবে? সেদেশের মানুষ কীভাবে সন্ত্রাসের হাত থেকে মুক্তি পাবে? আপনাদের কাছেই আমি এ প্রশ্ন রেখে যাই। আর আপনাদের কাছেই আমার আবেদন যে, আমিও এদেশের নাগরিক। আমরাও চাই পিতার হত্যার বিচার। এদেশের নাগরিক হিসেবে, আমি চাই জাতির পিতার হত্যার বিচার। জাতির পিতাকে হত্যা করে এদেশের প্রতিটি নাগরিককে আজকে যারা অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিয়েছে, সেই খুনী, সেই ষড়যন্ত্রকারী, তারা যে-ই হোক না কেন, আসুন আজকের দিনে আমরা সেই প্রতিজ্ঞা নেই ঐ খুনীদের বিচার বাংলার মাটিতে আমরা করবই করব। জাতির পিতার হত্যার বিচার বাংলার মাটিতে করবই করব। খুনীদের ঠাঁই বাংলার মাটিতে হতে পারে না। খুনীদের ঠাঁই বাংলার মাটিতে হবে না। আপনাদের কাছেও জানতে চাই, জাতির পিতার হত্যার বিচার চান কি না? (জনতা হাত তুলে সমর্থন জানায়।)

এই সরকারকেও আমি বলতে চাই যে খুনীদেরকে প্রশ্বয় দিয়ে আপনারাও ক্ষমতায় টিকতে পারবেন না।

ভাইয়েরা আমার, বোনেরা আমার,

আমিও বাবার মতো বুকের রক্ত দিতে প্রস্তুত। আমার সেই ওয়াদা আজকে আমি দিয়ে যাচ্ছি। শুধু আপনাদের সহযোগিতা চাই, আপনাদের দোয়া আশীর্বাদ চাই। বাবা-মা হারিয়েছি, নিঃস্ব রিক্ত আমি। আপনাদের দোয়া, আপনাদের আশীর্বাদ আমার আজ চলার পথের পাথেয়।

আমাদের আগামী কর্মসূচী হল ঃ ১. মানবতাবিরোধী ইনডেমনিটি আইন বাতিল, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার বিচার; ২. দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের অপসারণ; ৩. যুদ্ধাপরাধী গোলাম আজমের বিচারসহ জাতীয় সংসদে স্বাক্ষরিত ৪-দফা চুক্তি বাস্তবায়ন; ৪. সন্ত্রাসদমন আইন তথা সন্ত্রাসী আইন বাতিলের দাবীতে আমাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

আগামী ৮ই সেপ্টেম্বর 'কৃষক বাঁচাও-দেশ বাঁচাও' দিবস পালন করা হবে। এই দিবসে দেশব্যাপী জেলা ও থানায় সমাবেশ, বিক্ষোভ ও স্মারকলিপি পেশ। আগামী ১৮ই সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল।

উপরোক্ত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আমরা জানি সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না, তাই আঙুলটা বাঁকা করতে হয়। সেই কারণে এই দাবি আদায়ের জন্য আগামী ১০ অক্টোবর দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল করা হবে। এই চী সফল করার জন্য আপনাদের আহ্বান জানাই। খোদা হাফেজ

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

---

২০ আগস্ট ১৯৯৩ মানিক মিয়া এ্যাভিনিউতে জনসভায় ভাষণ

আধুনিক উচ্চমানসম্পন্ন সেনাবাহিনী গড়ে তুলব

উপস্থিত প্রাক্তন সৈনিক ভাইয়েরা,

একটু আগে আমার এক বোনের কান্না আপনারা শুনেছেন যা (মোসাম্মৎ আম্বিয়া বেগম, স্বামী নায়েক সুবেদার দলিলউদ্দিন শিকদার, যাঁকে ১৯৭৭ সালে জিয়াউর রহমান ফাঁসি দিয়েছিল, যাঁর লাশ এখনও পাওয়া যায়নি) সহ্য করা যায় না, তিনি তার স্বামীকে হারিয়েছেন কিন্তু তাঁর লাশ পাননি। তাঁর ছেলেরা পিতৃহারা হয়েছে। তাঁর বেদনা আমি বুঝতে পারি। আমিও তাঁর মতো সব হারিয়েছি। আমার মতো যাঁরা হারিয়েছেন তাঁরাই এই বেদনা বুঝতে পারবেন। কী অপরাধে তিনি বিধবা হলেন? কেন তাঁর সন্তানরা পিতৃহারা হল? আমিও আমার ভাইদের হারিয়েছি, কামালকে হারিয়েছি, জামালকে হারিয়েছি, ছোট্ট নিষ্পাপ শিশু রাসেলকেও হারিয়েছি। তাদের হত্যা করা হয়েছে। হত্যা করা হয়েছে নববধূ সুলতানা ও রোজিকে। হত্যা করা হয়েছে আমার স্নেহময়ী মাকে, সর্বোপরি হত্যা করা হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং আরও অনেককে। আমি ও আমার ছোট বোন রেহানা সেদিন বিদেশে ছিলাম।

১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট জাতির জনককে হত্যার পর থেকে আমি দেখেছি ক্ষমতা-দখলের খেলায় খেসারত দিতে হয়েছে সৈনিক ভাইদের। একজনের গদি দখলের জন্য, ক্ষমতাদখলের জন্য সৈনিকদের ব্যবহার করা হয়েছে। প্রায় ১৮-১৯টি ক্যু হয়েছে। একাধারে সৈনিকদের হত্যা করা হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৭৭ সালে বিমানবাহিনীর ৬০০-র মতো অফিসার ও হাজার হাজার সৈন্যকে হত্যা করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর স্বজনহারানোর সে-কান্না সেনাছাউনির আকাশ-বাতাস ভারী করে তুলেছিল। সে-কান্না আমাকেও ব্যথিত করে তুলেছিল। ১৯৮১ সনের ৭ই জুনে ইডেন হোটেলে আমি ঘোষণা করেছিলাম, সেনাছাউনিতে এই আত্মঘাতী সংঘাত বন্ধ করুন। পিতৃহারা সন্তানদের, বিধবা মায়েদের-বোনেদের, সন্তানহারা মায়েদের কান্না আমি আর শুনতে চাই না।

আমরা রাজনীতি করি দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য। সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মানুষ নিয়ে গঠিত। কেন তাদের বারবার মরতে হবে? একটিমাত্র ব্যক্তি তার ক্ষমতা দখল, ক্ষমতায় টিকে থাকা ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য কেন সেনা বাহিনীর সদস্যরা প্রাণ দেবে? আজ একটি কথা পরিষ্কারভাবে বলতে চাই, সৈনিক ভাইদের নিয়ে এই খেলা বন্ধ করেছি বলেই আমার উপর একটি চক্রের এত আক্রোশ। আমি বারবার বলেছি, যেন কোনো সৈনিক আর হতাহত না হয়। ১৯৮১ সালের ৭ই জুনের পর হতে সেনাবাহিনীতে হানাহানি বন্ধ হয়। আর কোনো ক্যু পাল্টা ক্যু হয় নাই।

ক্ষমতা বদল হবে জনগণের ভোটে। ১৯৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানে আমি সেটাই বার বার চেষ্টা করেছি। জেনারেল এরশাদ যেদিন ক্ষমতা ছেড়েছিল সেদিন ক্যান্টনম্যান্টে উত্তেজনা ছিল। ক্যান্টনমেন্টের খবর নিয়েছি, আর্মি প্রধান ও অন্যান্যদের সঙ্গে যোগযোগ করেছি, ট্রাকে করে আমাদের কর্মীরা রাস্তায় নেমেছে, সারারাত কাজ করেছে পরিস্থিতি শান্ত রাখার জন্য। পরিস্থিতি শান্ত করার উদ্যোগ নিয়েছি। সেদিন স্বপন নামে আমাদের একজন কর্মী মারা গেছে ফার্মগেটের কাছে।

আমরা যে কথা বলি তা রাখি। ন্যায় ও সত্যের জন্যে লড়ি। আমাদের সম্পর্কে সেনাবাহিনীতে অপপ্রচার করা হয়, বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়। কিন্তু আপনারা তো জানেন, পাকিস্তানিরা বাঙালিদের সেনাবাহিনীতে নিত না। বলত বাঙালিরা ছোটখাটো ও ভীতু। বাঙালিদের তারা অবজ্ঞা করত। বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের ভর্তি করার দাবি তোলেন। ৬-দফায় তিনি বাঙালিদের নিয়ে আলাদা সেনাবাহিনী গঠনের কথা বলেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আপনারা যুদ্ধ করেছিলেন। যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনি, যারা বাঙালিদের অবজ্ঞা করত, এই ডিসেম্বর মাসে, তাদেরই কাছে ঐ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পরাজিত হতে ও আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা হয়েছে।

আপনারা জানেন, স্বাধীনতার পর একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। এখানে ছিল প্রাদেশিক সরকার। সেনাবাহিনীর কিছুই ছিল না। বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী গড়ে তোলেন। ঐসব বাহিনীর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। উপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে আধুনিক বিশ্বের সমমর্যাদায় সেনাবাহিনী যেন গড়ে ওঠে বঙ্গবন্ধু সবদিক দিয়ে তার ব্যবস্থা করেছিলেন। দেশের প্রথম সামরিক একাডেমী গড়ে তোলেন। তার পরও বলা হয়—আওয়ামী লীগ নাকি সেনাবাহিনীর জন্য কিছুই করেনি। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকতে একজন সৈনিক মারা যায়নি, ক্যু হয়নি—বিশৃঙ্খলাও হয়নি।

বঙ্গবন্ধু পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য বিদেশ থেকে ডাক্তার এনেছিলেন। অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে সুচিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তোলার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধু সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। তাদের জন্য রেশন যাতে পরিবারের হাতে পৌঁছাতে পারে তার ব্যবস্থা করেছিলেন। এদেশের প্রথম সামরিক একাডেমী বঙ্গবন্ধুর করা।

আপনারা জানেন, ভারতের মিত্রবাহিনী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। ভারতের কয়েক হাজার সৈন্য মৃত্যুবরণ করেছিল। এই ভারতের মিত্রবাহিনী মাত্র তিন মাসের মধ্যে বাংলার মাটি থেকে চলে যায়। তখন দুই জার্মানি এক ছিল না। আমি ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত দেখেছি পশ্চিম জার্মানিতে ৪০ বছর ধরে আমেরিকান সৈন্য মিত্রবাহিনী হিসাবে ছিল। তাদের জন্য আলাদা জায়গা ছিল। সেখানে আমেরিকান ডলারে কেনাকাটা, এমনকি সিনেমা দেখতে গেলেও সেখানে মার্কিন ডলার দিয়ে টিকেট কাটতে হত। লোকাল কারেন্সি চলত না। পূর্ব জার্মানিতে রাশিয়ান সৈন্য ছিল।

জাপানে আমেরিকান সৈন্য দীর্ঘদিন রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ ছিল তার ব্যতিক্রম। বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণেই মাত্র তিন মাসের মধ্যে ভারতীয় মিত্রবাহিনী এদেশ ত্যাগ করে।

আমি জানি, ১৯৭৫-এর পর হতে এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সম্পর্কে সেনাবাহিনীর মধ্যে অপপ্রচার ছড়ানো হয়। যদি বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ সেনাবাহিনী না চাইতেন তা হলে কেন বঙ্গবন্ধুর ছেলে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিল? কামাল মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিল। প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার হয়েছিল। জামাল সেনাবাহিনীর অফিসার ছিল। ইংলন্ডের বিখ্যাত সামরিক অ্যাকাডেমী স্যান্ডহার্স্ট হতে কমিশনপ্রাপ্ত হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলামের (প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট) ছেলে সেও সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। সেনাবাহিনীর মর্যাদা ও সম্মানবৃদ্ধির জন্য আওয়ামী লীগ সর্বদা কাজ করেছে।

আমরা দেখেছি, ক্ষমতাদখলের হাতিয়ার হিসাবে আমাদের সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করার ফলে জনগণের সঙ্গে তাদের দূরত্ব বেড়ে গিয়েছিল। ১৯৭৫-এর পরবর্তী উচ্চাভিলাষী জান্তারা এটা করেছিল। জনগণের শ্রদ্ধা অর্জনের ক্ষেত্রে যে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল আমরা তা পরিবর্তন করেছি। সেনাবাহিনীর উপর জনগণের আস্থা না থাকলে সেনাবাহিনীর পক্ষে কোনো যুদ্ধে জয়ী হওয়া সম্ভব নয়। '৭১-এ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয়ই তার প্রমাণ।

সেনাবাহিনীর মান-মর্যাদা যাতে বৃদ্ধি পায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে তার ব্যবস্থা করবে।

* আমি ঘোষণা দিচ্ছি সেনাবাহিনীর মান-মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যবস্থা আমি করব।
* আধুনিক উচ্চমানসম্পন্ন সেনাবাহিনী গড়ে তোলার ব্যবস্থা আমি করব।
* আমি একটি সুশৃঙ্খল সর্বাধুনিক সেনাবাহিনী গড়ে তুলব।

আওয়ামী লীগ চায় আজকের পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে এমন একটি সর্বাধুনিক সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীকে নিয়ে কেউ খেলুক আমরা তা চাই না। সেনাবাহিনী পুনঃ মর্যাদা পাক আওয়ামী লীগ তার ব্যবস্থা করবে। আওয়ামী লীগ দক্ষ সেনাবাহিনী চায়। সেনাবাহিনীতে আমরা প্রফেশনালিজম প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সর্বস্তরের জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি, শোষিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে সোনার বাংলা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধু দেশকে, দেশের মানুষকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। তার জন্যই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছে। তাঁকে হত্যা করার পরে আজ ১৮ বছরে দেশের কী অবস্থা হয়েছে ? ১৮ বছরে জাতিকে তারা কী দিয়েছে ? তারা দিয়েছে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অভাব-অনটন, চক্রান্ত, ক্যু, হত্যা। আজ কীভাবে দেশ চলছে, যারা চাকুরিজীবী, তাদের চাকুরির টাকায় মাসের পনের দিনও চলে না। নিম্নবিত্ত, পেশাজীবি, বুদ্ধিজীবী

তাদের অবস্থাও করুণ। অর্থনীতি স্থবির। দেশে ৮০% ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। শিক্ষার আলো নাই। চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। জীবনের নিরাপত্তা নাই। রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

আমরা গণতন্ত্র এনেছি। তার মাধ্যমে সুখী সমৃদ্ধিশালী আত্মনির্ভরশীল, আত্ম-মর্যাদাশীল জাতি হিসাবে বাংলাদেশকে আমরা গড়ে তুলতে চাই। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি। জনগণের ব্যথা-বেদনাকে বুকে নিয়েই আমি আমার শোক ভুলে থাকতে চাই। জনগণের পাশে থেকেই তাদের জন্য কাজ করেই আমি শান্তি পেতে চাই। অন্যায় ও মিথ্যার সঙ্গে কোনো আপোস নাই। আমরা ন্যায় ও সত্যের পথে আছি। আমরা সত্য কথা বলি বলেই সংসদে আমাদের কথা বলতে দেওয়া হয় না। অন্যায় ও মিথ্যার সাথে কোনো আপোস নাই। যদি আল্লাহ্ কোনোদিন আপনাদের সেবা করার তওফিক দেন তা হলে আপনাদের অভাব-অভিযোগ আমি দেখব। আপনাদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু।

৩রা নভেম্বর '৯৩ শতাধিক প্রাক্তন সৈনিক ও অফিসার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে যোগদান উপলক্ষে ভাষণ

আওয়ামী লীগ কেয়ার টেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন করবে

উপস্থিত সুধীবৃন্দ,

বিগত স্বৈরাচারবিরোধী দীর্ঘ সংগ্রাম, সংগ্রামের প্রেক্ষিতে তিন জোটের রূপরেখা, ক্ষমতা হস্তান্তর, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত নির্বাচন, নির্বাচনোত্তর সার্বভৌম জাতীয় সংসদ ও সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগের আনুপূর্বিক গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা গত ২৪শে নভেম্বর জাতীয় সংসদে স্পীকার যে রুলিং প্রদান করেন তা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। জাতীয় সংসদকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর এই প্রয়াস দীর্ঘদিনের এবং পূর্বপরিকল্পিত। প্রধানমন্ত্রী সর্বদাই রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের পক্ষপাতী ছিলেন এবং বাস্তবে তিনি সেভাবেই দেশ শাসন করছেন। জাতীয় সংসদকে কেবলমাত্র পুতুল হিসাবেই ব্যবহার করতে চান। যার প্রমাণে বলা যায়, অদ্যাবধি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের লক্ষ্যে নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ বিল, ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল বিল দীর্ঘ আড়াই বছর তালবাহানা করে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। এমনকি বিরোধী দলের পক্ষ হতে কৃষি উপকরণের মূল্য-হ্রাস, উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রদান, শ্রমিক ছাঁটাই বন্ধ, প্রতিটি গ্রামে প্রাথমিক স্কুল স্থাপন, মদ, জুয়া বন্ধের জন্য জনকল্যাণমূলক প্রস্তাবসমূহ জাতীয় সংসদে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। কালাকানুন বাতিল না করে আরো জঘন্য 'সন্ত্রাস দমন আইন' জারি করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিগত ১০ই নভেম্বর শহীদ নূর হোসেন দিবসে আওয়ামী লীগ আহূত শান্তিপূর্ণ অবস্থান ধর্মঘটে জাতীয় সংসদ সদস্যদের লাঠিপেটা করা হয়েছে। সরকারের সীমাহীন দুর্নীতির বিষয়ে গঠিত বিশেষ সংসদীয় কমিটিকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। গত ৭ই নভেম্বর সংসদ ও সংসদ সদস্যগণ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী যে-মন্তব্য করেছেন তার মাধ্যমে তিনি সংসদকে অবমাননা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী প্রায়শ সংসদে অনুপস্থিত থাকেন। কদাচিৎ উপস্থিত থাকলেও নিশ্চুপ থাকেন। সংসদে কোনো বিতর্কে তিনি অংশগ্রহণ করেন না। বিএনপি কর্তৃক সংসদকে হেয় প্রতিপন্ন করার দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টা আজ চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। যার ফলে সংসদের ক্ষমতা, কার্যকারিতা ও সম্মান ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং যা কোনো মতেই জাতির নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

স্পীকারের বিধিবহির্ভূত ও দলীয় স্বার্থরক্ষাকারী সিদ্ধান্ত সংসদের কার্যপ্রণালীবিধি সম্পূর্ণভাবে ভঙ্গ করেছে যা আমাদেরকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য করেছে। স্পীকার চান যে, তাঁর সঠিক কিংবা ভুল যে-কোনো সিদ্ধান্তই আমরা যেন মেনে নিই।

মূলত স্পীকারের এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করেছে যে, বিএনপি গণতন্ত্র হত্যা করতে চায়। আজকের এই সঙ্কটের জন্য সরকারই দায়ী। সংসদকে অকার্যকর করে, গণতন্ত্র ও ন্যায়-বিচারের নীতিমালা বিসর্জন দিয়ে আমাদের পক্ষে জনগণের স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব নয়। আওয়ামী লীগ কোনো অবস্থাতেই নব্য স্বৈরশাসক বিএনপি-র দোসর হতে পারে না। আমরা আশা করি যে, জনগণ বিএনপি-র এই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত মোকাবেলা করবে এবং তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট থাকবে।

বর্তমান সরকার আড়াই বছরের দুঃশাসনে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসনের প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন, সন্ত্রাস দলীয়করণ, দখলীকরণ প্রক্রিয়ার গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সচেতনতাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছে। গণতান্ত্রিক নীতিমালা বিসর্জন দিয়ে স্বৈরাচারী কায়দায় রাষ্ট্র-পরিচালনা করছে। ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠীর লাগামহীন দুর্নীতি ও দুঃশাসন, নিপীড়ন নির্যাতনের দ্বারা জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। বিগত জাতীয় সংসদের উপনির্বাচনে এবং পৌরসভার নির্বাচনে প্রমাণিত হয়েছে এই সরকারের অধীনে অবাধ, নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন হতে পারে না। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান হতে হবে। '৭৫-পরবর্তী অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে, ক্ষমতাসীন শাসকদলের অধীনে কোনো সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন জনমতের প্রতিফলন ঘটায় না। শাসক দল স্বীয় স্বার্থে প্রশাসনকে অন্যায় ও অবৈধভাবে ব্যবহার করে নির্বাচনী ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করে।

দেশে গণতান্ত্রিক চেতনা, মূল্যবোধ ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষ্ঠু বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান অপরিহার্য বলে আওয়ামী লীগ মনে করে। এই লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সংসদে ও সংসদের বাইরে জনগণকে নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলবে।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলেও কেয়ার টেকার সরকারের অধীনেই নির্বাচন করবে।

আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং দেশে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থে যথাযথ ভূমিকা পালন করার আহ্বান জানাচ্ছি।

২৮শে নভেম্বর ১৯৯৩ জাতীয় সংবাদপত্রসমূহের সম্পাদক এবং দেশি বিদেশি সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিবর্গের সঙ্গে জাতীয় সংসদে বর্তমান বিরাজমান পরিস্থিতি নিয়ে মত বিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান